দ্য হাউস হোয়্যার আই ডাইড ওয়ান্স

কেইগো হিগাশিনো



রূপান্তর
সালমান হক

দ্য হাউস হোয়্যার আই ডাইড ওয়ান্স

কেইগো হিগাশিনো



রূপান্তর
সালমান হক

দ্য হাউস হোয়ার আই ডাইড ওয়ান্স

কেইগো হিগাশিনো

রূপান্তর
সালমান হক

অনুবাদকের উৎসর্গ

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের

কিছু কথা

আপনার হাতে এই মুহূর্তে যে বইটি আছে, সেটা প্রখ্যাত জাপানি রহস্য ঔপন্যাসিক কেইগো হিগাশিনোর ‘মুকাশি বোকু গা শিনদা লে’ উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। নামটার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়, যে বাড়িতে আমার মৃত্যু হয়েছিল। পুরো উপন্যাসটি পড়ার পর নামটা একদম স্বার্থক মনে হয় আমার। আমি অবশ্য গল্পের প্লটের সাথে মিলিয়ে স্মৃতি সমাধি নাম রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রকাশক বললেন ইংরেজি দ্য হাউস হোয়্যার আই ডাইড ওয়ান্স নামটাই রাখতে।

এই বইটায় কোনো গোয়েন্দা নেই। নেই কোনো খুনি। তবু এটা আগাগোড়া একটি রহস্য উপন্যাস। আসলে মানুষের জীবনটাই তো একটা রহস্য, তাই না? কেইগো হিগাশিনো কখনোই শুধু লেখার জন্যে কিছু লিখেন না। তার রহস্যোপন্যাসগুলোতেও থাকে নানারকম বার্তা। এই বইটাও ব্যতিক্রম নয়। দ্য ডিভোশন অভ সাসপেক্ট এক্স প্রকাশিত হবার আগ অবধি দ্য হাউস হোয়্যার আই ডাইড ওয়ান্সই ছিল তার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। হিগাশিনো যে কত বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন, তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না।

বইটা নিয়ে কাজ করতে আমার এবং প্রকাশক মাফিউল কাদির আদনের যেরকম ভালো লেগেছে, আশা করি সম্মানিত পাঠকদেরও তেমনটাই লাগবে। আর ভালো না লাগলে সেই দায়ভার পুরোপুরি আমার। সবাই ভালো থাকবেন।

সালমান হক
লালমাটিয়া, ঢাকা

পূর্বকথা

মাসখানেক আগের কথা। যাকে বাবা বলে জানতাম একসময়, তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম হঠাৎ। যে বাড়িটায় শৈশব কেটেছে আমার, সেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে কিছুদিনের মধ্যে। এই তথ্যটা দেয়ার জন্যেই ফোন দিয়েছিল সে। এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মা'র সাথে পরামর্শ করেই নিয়েছে। বেশ লম্বা সময় ধরে বাসাটা পরিত্যক্ত। বর্তমানে সমুদ্রের ধারে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে দু'জন। জীবনের বাকি সময়টুকু শান্তিতে সেখানেই কাটাবে, এভাবেও বলা যায় কথাটা।

বাড়িটা কবে ভাঙা হবে, সেই তারিখেরও উল্লেখ আছে চিঠিটায়। প্রাথমিক কাজ কখন শুরু হবে, সেটারও আনুমানিক একটা সময় বলে দিয়েছে। বাবা নিশ্চয়ই চাইছে এর আগেই বাড়িটা থেকে ঘুরে আসি।

কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাব না সেখানে। তার কথা অনুযায়ী আর কিছু করার ইচ্ছে নেই আমার। ব্যাপারটা এমন নয় যে তাদের সাথে দেখা করার ইচ্ছে নেই। যত যা-ই বলি না কেন, তারা আমার বাবা-মা। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অপরাধের মধ্যেই পড়বে। কিন্তু আমার অনীহার কারণ ভিন্ন। আসলে পুরোনো ওই বাড়িটা থেকে নতুন কী কী জানা যাবে, সেটাই ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল আমার মনে।

যদি পা বাড়িটা যেদিন ভাঙা হবে, সেদিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে বসে গান শুনছিলাম। ইচ্ছে করেই বাসা থেকে বের হইনি। বলা যায় না, জোড়া আপনা থেকেই রওনা দেয় সেই ঠিকানায়!

কিন্তু যতই বই পড়া বা গান শোনার ভান করি, বারবার মনে হচ্ছিল বাড়িটার কথা। সেই বেডরুম, যেখানে বসে আমি আমার হোমওয়ার্ক করতাম। সেই লিভিংরুম, যেখানে তাতামি ম্যাটের নিচে পা ঢুকিয়ে বসে টিভি দেখতাম সবাই। স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগ কাঁধে রান্নাঘরটায় উঁকি দিতাম চুপেচুপে। রাতে খাওয়া দাওয়ার কী বন্দোবস্ত, সেটা বোঝার চেষ্টা করতাম। সেই পরিচিত হলওয়ে, ক্লোজেট আর অন্ধকার স্টোর রুম।

মনের পর্দায় ভেসে উঠলো বাড়িটা গুড়িয়ে যাওয়ার ছবি। দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, ফাটল ধরছে মেঝেতে। প্রতি সপ্তাহে যে বড় ঘড়িটা পাঁচ মিনিট করে পিছিয়ে যেত, সেটা হয়তো এখনো দেয়ালে ঝুলছে। স্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকার নামসমেত ক্যালেন্ডারটা কি এখনো পেরেক দিয়ে সাঁটানো? ড্রয়িং রুমের কাঠের প্যানেলটায় নিশ্চয়ই তিন সেন্টিমিটারের সেই পোড়া দাগটা এখনো আছে। স্কুল থেকে ফিরে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কাজটা করেছিলাম আমি। বাবার চিৎকারে কান পাতা দায় হয়েছিল সেদিন। এই দৃশ্যগুলোই বারবার ঘুরতে লাগল মনে।

এক সময় মিলিয়েও গেল। রয়ে গেল কেবল বাদামি হয়ে আসা পুরোনো ছবির মতন স্মৃতির রেশ।

এরকম আরেকটা বাড়ি আছে, যেটার কথা কখনো ভুলব না আমি। আমার ছোটবেলার বাড়িটা জাপানি নকশার হলেও এই ছোট্ট বাড়িটা পশ্চিমা নকশায় তৈরি। একটা উঁচু পাহাড়ের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ যেখানে কেউ কখনো যায় না।

ওই বাড়িটার কথা মনে হলে এখনো কেঁপে উঠি আমি। ভয়ংকর চিন্তাগুলো পাথর হয়ে চেপে বসে বুকে। বিছানায় একা শুয়ে যখন বিষয়টা নিয়ে ভাবি, চাদরের তলে মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু মাঝে মাঝে সেই ভয় রূপ নেয় নস্টালজিয়ায়। মনে হয় কে যেন ডাকছে সেখান থেকে।

কিন্তু জবাব দেই না ইচ্ছা করেই। নিজের ভালোর জন্যেই।

সেই সাদা বাড়িটায় আমার সাথে আরেকজন গিয়েছিল। আসলে কিছু একটা খোঁজার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সে বা আমি, কেউই জানতাম না যে কী খুঁজছি। কোনো কিছু হয়তো জানা যাবে, এই আশাই সেখানে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের।

এমনকি আজ অবধি আমি নিশ্চিত নই যে, সেদিন সেখানে যাওয়া উচিত হয়েছিল কিনা।

দুই বছর আগের কথা বলছি।

প্রথম পর্ব

১

বাসায় অচেনা এক নম্বর থেকে ফোন এলো একদিন। আর সেখান থেকেই সবকিছুর শুরু।

কণ্ঠস্বরটা শোনামাত্র চিনতে পারলাম। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও পারব। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল সাথে সাথে। তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলছেন?' আসলে ওকে হয়তো বোঝাতে চাইছিলাম কিছুটা হলেও আত্মসম্মানবোধ অবশিষ্ট আছে আমার ভেতরে। পরক্ষণেই মনে মনে গালি দিলাম নিজেকে। আহাম্মকের মতন কথাটা না বললেও হতো।

"ইয়ে, মিসেস নাকানো বলছি।"

ডাকনামটা বলেনি, বিয়ের পরের নামটা বলেছে কেবল। হয়তো ওর মনেও আমার মতন একই কথাই ঘুরছিল।

"মিসেস নাকানো?" না চেনার ভান অব্যাহত রাখলাম।

“ওহ, সরি। কুরাহাশি। সায়াকা কুরাহাশি বলছি।”

“তুমি!” না চেনার ভান অব্যাহত রাখলাম। “সেদিনের জন্য ধন্যবাদ।”

কিছু বললো না ও। হয়তো বলার মতন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অবাক হলাম না ব্যাপারটায়। এভাবে হঠাৎ ধন্যবাদ জানানোটা বোকামি বৈ কিছু নয়। রিসিভার হাতে হেসে উঠলাম নিচু স্বরে।

“যদিও আমাদের কথা হয়নি।”

“ঠিক বলেছ,” সায়াকার কণ্ঠস্বরে স্বস্তির আভা।

“বন্ধুদের সাথে কথা বলতেই তো ব্যস্ত ছিলে। আমার দিকে ভালো করে তাকালেও না।”

“তুমিই তো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলে।”

“না তো।”

“ওহ, আচ্ছা।”

“সত্যি বলছি।”

“হুম।”

পাশের টেবিলে রাখা মেকানিক্যাল পেন্সিলটা তুলে মাথায় চাপ দিয়ে নিব বের করলাম। নীরবতাটুকু অস্বস্তিকর ঠেকছে কানে।

“আজ হঠাৎ ফোন দিলে যে? কোনো কারণ আছে? নাকি এমনি?”

“এমনি হবে কেন?”

ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। আওয়াজটা একদম মৃদু, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে কোনো কারণে অস্থির হয়ে আছে।

“একটা বিষয়ে তোমার সাথে একটু দেখা করতে চাচ্ছিলাম,” অবশেষে বললো। “সময় হবে কি?”

অবাক না হয়ে পারলাম না। ও যে দেখা করার কথা বলতে পারে, তা মাথাতেও আসেনি। দেখা করতে চাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। পেন্সিলের নিবের দিকে নিবন্ধিত আমার দৃষ্টি।

“ফোনে আসলে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছি না,” লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে ও।

এতদিন পর কেন নিজে যেচে পড়ে দেখা করার আমন্ত্রন দিচ্ছে, তা নিয়ে না ভেবে পারলাম না। ওর বিবাহিত জীবন নিয়ে কিছু বলবে নাকি? নাহ, ও সেরকম মেয়ে নয়।

“বিষয়টার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে?”

“না,” পরিষ্কার কণ্ঠে বলে সায়াকা। “এটা আমার ব্যক্তিগত একটা সমস্যা। কিন্তু আমি চাই তুমি আমার গল্পটা শোনো। এরপর একটা উপকার চাইব তোমার কাছে। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, যার সাথে আলাপ করতে পারব এই ব্যাপারে।”

আমার জবাব কি হতে পারে, সেটা আঁচ করে আগেভাগেই কথাটা বলে দিল ও।

কৌতূহল হচ্ছে আমার, অস্বীকার করবো না। কিন্তু নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার স্বামী জানে এই ব্যাপারে?”

“ও নেই এখন।”

“নেই মানে?”

“অ্যামেরিকা গিয়েছে অফিসের কাজে।”

“আচ্ছা।”

আঙুল দিয়ে ঠেলে মেকানিক্যাল পেন্সিলটার নিব ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম।

“কিন্তু তুমি উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বোসো না। ও দেশে থাকলে যেভাবে সবকিছু ঘটতো, সেভাবেই হবে।”

তৎক্ষণাৎ কিছু বললাম না আমি। আসলে কিছু বুঝছি না। ওর গলার স্বরে এটা স্পষ্ট যে বিষয়টা গুরুতর কিছু। তাই আমাকে আরো সতর্ক হতে হবে।

“একটু ভাবতে হবে আমাকে,” বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম একবার। “এমন নিশ্চয়ই আরো অনেকেই আছে, যাদের সাথে কথা বলতে পারবে তুমি। আমার সাথে তোমাকে দেখা গেলে বিপদে পড়তে পারো, তো জানো?” এটা

“জানি। তা সত্ত্বেও তোমাকে ফোন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

“কিন্তু-”

“প্লিজ,” সায়াকার কণ্ঠে কাতরতাটুকু টের পাচ্ছি। মনের পর্দায় দেখলাম ওর চোখ লাল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। লম্বা শ্বাস টেনে ফোন রেখে দেয়ার আগে বললাম, “কালকে বিকেলে সময় দিতে পারব।”

“ধন্যবাদ।”

* * *

হাইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষ অবধি ছয় বছরের সম্পর্ক ছিল আমার আর সায়াকার। তবে সেই তুলনায় সম্পর্কটা যে খুব গভীর ছিল, বলা যাবে না। অনেক যুগলের ক্ষেত্রেই কিছু মুহূর্ত থাকে, যা স্মৃতির পটে রয়ে যায় অমলিন। কিন্তু আমরা যেন একদিন হুট করেই বুঝতে পারি যে দেখতে দেখতে ছয় বছর পেরিয়ে গেছে প্রেমের।

সম্পর্কের ইতি টেনেছিল ও-ই।

“আমাকে মাফ করে দিও। অন্য একজনকে ভালোবাসি আমি।”

কোনো প্রকার ভণিতা ছিল না আমাদের মধ্যে। কিছুদিন দূরে থেকে আবারও চেষ্টা করা, এসব নাটক সহ্য হতো না আমার। তাই এরকমটাই কথা দিয়েছিলাম একে-অপরকে; কখনো যদি মনে হয় সম্পর্কটা রক্ষা করা সম্ভব হবে না, সরাসরি বলবো। তাই ওর কথাটা শুনে আমিও জোরাজুরি করিনি।

“ঠিক আছে,” এটুকুই বলেছিলাম কেবল।

পুরোটা সময় মাথা নিচু করে রেখেছিল ও।

কিছুদিন আগে আমাদের হাইস্কুলের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় শিনজুকুতে। ওর সাথে দেখা হবে, এই কথাটা মাথায় আসেনি বললে মিথ্যে বলা হবে।

অনুষ্ঠানের দিন বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় মাঝেমাঝেই ওর দিকে নজর চলে যাচ্ছিল। ও যে আসবে, ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল আমার এই ধারণাটা। মনের মধ্যে সুপ্ত একটা আশাও ছিল যে হয়তো দেখা হবে ওর সাথে। আমাদের সম্পর্কের সময় একদম ছিপছিপে গড়নের ছিল ও। কিন্তু এখন শরীরের এখানে-সেখানে নজর আটকে যাওয়ার মতন বাঁক। হালকা প্রসাধনীর ছোঁয়ায় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে তখন সেই চুপচাপ মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার।

বরাবরই চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে সায়াকা, তাই ওকে ওভাবে দেখে স্বস্তিই পেয়েছিলাম। অর্থাৎ, খুব একটা বদলায়নি। ওকে অন্য কোনো রূপে চিন্তা করতে পারি না আমি। অনুষ্ঠানেও সবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল সায়াকা। কে এখন কেমন আছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করছিল নিশ্চয়ই।

একবার মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে সায়াকা। সেই মুহূর্তে আমিও যদি তাকাতাম, তাহলে কথা হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু ওকে যেন খেয়ালই করিনি, এমন চেহারা বানিয়ে রাখলাম পুরোটা সময়।

কিছুক্ষণ পর সবাই একে একে বলা শুরু করলো এখন কোথায় আছে, কী করছে। সায়াকার পালা এলে হুইস্কির গ্লাসটার দিকে চোখ নামিয়ে নিলাম। কথায় কথায় ও জানালো- চার বছর আগে বিয়ে করেছে, বর্তমানে গৃহিনী। ওর স্বামী একটা আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে চাকরি করে। বছরের লম্বা একটা সময় কাজের খাতিরে বাইরে থাকতে হয়। একদমই গড়পড়তা জীবন যাকে বলে। কখনো ভাবিনি ওকে এমন কিছু বলতে শুনবো।

করে। "বাচ্চা-কাচ্চা কয়জন?" আমাদের প্রাক্তন ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ জিজ্ঞেস

স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন। বরফ গলে পাতলা হয়ে গেছে আমার হুইস্কি। সেটাতেই চুমুক দিলাম একবার।

"এক মেয়ে।"

"কত বছর?"

"তিনে পা দিবে কিছুদিন পর।"

"তোমার মতনই আদুরে নিশ্চয়ই।"

সাথে সাথে কিছু বলে না সায়াকা। কিছুক্ষণের নীরবতার পর আগের তুলনায় ক্ষীণস্বরে বলে, "অনেক।"

এবারে চোখ তুলে তাকাই ওর দিকে। গলায় কষ্টের অস্তিত্বটুকু আর কেউ টের না পেলেও আমি পেয়েছি। তবে এরপর আর কিছু বললো না ও। অন্য একজন কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে।

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সায়াকা। কেন যেন মনে হলো চেহারাটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সেই সময় আমার দিকে তাকালো ও। যেন টের পেয়েছে আমার দৃষ্টি ওর দিকে। প্রথমবারের মতন চোখাচোখি হয় আমাদের।

সাথে সাথে মাথা নামিয়ে নিই। শেষ পর্যন্ত ওদিন আর কোনো কথা হয় না। বাসায় ফিরে গলার টাই ঢিলা করতে করতে নিজেকে জিজ্ঞেস করি, কেন গিয়েছিলাম অনুষ্ঠানটায়? পরমুহূর্তেই মনে হয় ওর সাথে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না।

এর সপ্তাহখানেক পর ফোনটা পাই।

* * *

শিনজুকুর সিটি হোটেলের ক্যাফেতে দেখা করবো বলে ঠিক করেছি আমরা। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে ওখানে পৌঁছে গেলে ওয়েট্রেস একটা টেবিলে নিয়ে যায়। সায়াকা তখনও আসেনি। ছোট ক্যাফেটায় নজর বুলিয়ে মনে মনে হাসি একবার। কী আশা করেছিলাম? ও আগে এসে বসে থাকবে? আমি যার জন্যে অপেক্ষা করছি সে ইউনিভার্সিটির ছাত্রী নয়, বরং একজন সেলস এক্সিকিউটিভের স্ত্রী।

মনে মনে নিজেকে বললাম, খুব বেশি কিছু আশা করে বসে থেকো না। মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবে কেবল। ও বলেছে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করার মত কেবল তুমিই আছ।

আমার মনের মধ্যে আরেকটা অংশ বলছে, "ওর কথাগুলো শুনে উদ্ভট সব চিন্তা মাথায় আসছে তোমার। সায়াকা বলেছে, তোমাকে এমন কিছু বলতে চায় যা নিজের স্বামীকেও বলতে পারবে না। তোমার মনের মধ্যে এখনও আশা যে অন্য একজনকে বিয়ে করার পরেও তোমাকেই ভালোবাসে, সায়াকা। নিজেকে সামলাও! এসব দিবাস্বপ্ন তোমার নিজের কষ্টের কারণ হবে।"

এসব আকাশকুসুম কল্পনার ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু...

পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে এলো সায়াকা। আমাকে দেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, দেখে মনে হচ্ছে যেন শ্বাস নিতে ভুলে গেছে। একটু পর ধীর পায়ে এগোতে শুরু করলো টেবিলের দিকে। একটা সবুজাভ টপস, সাদা ব্লাউজ আর লম্বা স্কার্ট পরনে। পঞ্চাশের দশকে এই ধরনের স্কার্ট আধুনিক বলে গণ্য হতো নিশ্চয়ই। চুল যেভাবে কাটা, তা ভীষণ মানিয়ে গেছে ওর সাথে। গৃহিনী পত্রিকার মডেল হতে পারত অনায়াসে।

"ভেবেছিলাম আমি আগে এসে পড়বো," টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো। গালে লালচে আভা।

"কাজ একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে আমার," বলি আমি। "দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো?"

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে আমার উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে এক কাপ দুধ চা অর্ডার দিল ও। এই অভ্যাসটা আগের মতই আছে।

“কাছেই থাক নাকি তুমি?” মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সায়াকা।

“না, খুব একটা কাছে না। দু’বার বদলাতে হয় ট্রেন।”

ও। “তাহলে এখানে দেখা করার কথা বললে যে?” চারপাশে নজর বুলায়

“তোমার যেন অসুবিধা না হয়, সেজন্যে বলেছি। তুমি তো বোধহয় তোদোরোকিতে থাকো।”

আমার কথা শুনে বিস্ময় ফুটল সায়াকার চেহারায়। আসলে পুনর্মিলনীর দিন ওর বলা ঠিকানাটা ভুলিনি। সায়াকা নিজেও বুঝতে পারল সেটা। কিছুটা স্বাভাবিক হলো আগের তুলনায়।

“ভেবেছিলাম আমার কোনো কথাই ঠিকঠাক শোনোনি সেদিন।” “তুমিও নিশ্চয়ই আমার কথা শোনোনি।”

“শুনব না কেন? সবকিছু ভালোই চলছে তোমার তাহলে।” ওয়েটার ওর দুধ চা দিয়ে গেল এই সময়। দুই হাতে কাপটা ধরে চোখ বন্ধ করে চুমুক দিল ও একবার।

“তোমাকে আমার ফোন নম্বর কে দিয়েছিল?”

“কুদো।”

“সেটাই ভেবেছিলাম।”

আমাদের রিইউনিয়নের সব বন্দোবস্তও কুদোই করেছিল। আগে থেকেই এসব কাজে পারদর্শী সে। তাছাড়া আমার আর সায়াকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, এটাও কুদো জানত। এতদিন পর আমার ফোন নম্বর চাইতে দেখে কী কী যে ভেবছে, কে জানে! সায়াকার মনেও নিশ্চয়ই এই চিন্তা একবার হলেও এসেছে। খুব সম্ভবত সেজন্যেই ওকে এরকম গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন।

পকেট থেকে নিজের একটা বিজনেস কার্ড বের করে ওর দিকে ঠেলে দিলাম।

“তুমি তাহলে নারিমাতে থাকো,” একবার চোখ বুলিয়ে বললো ও। “ইউনিভার্সিটির কাছে থাকলেই সুবিধা। আমি যেখানে থাকি, সেখানকার স্টেশন থেকে একটু পরপরই তোশিমায় যাওয়ার ট্রেন ছাড়ে।”

“সাইন্স ফ্যাকাল্টি, ফিজিক্স... আগের মতই।”

“পার্থক্য বলতে এখন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি।”

“আর কিছুদিনের মধ্যে তো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে যাবে, তাই না?” “সেটার দেরি আছে।”

কার্ডটার দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সায়াকা। এরপর একবার ঠোঁট ভিজিয়ে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো।

“আর কোনো কার্ড আছে নাকি তোমার?”

“আরেকটা কার্ড? না তো, কেন?”

"মানে, তুমি তো এখনও টুকটাক লেখালেখি করো বোধহয়? রিইউনিয়নে এরকমটা বলাবলি করছিল কেউ একজন।"

"ওহ," মাথা ঝাঁকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসা কফিতে চুমুক দিলাম একবার। "ওটা ওরকম কিছু না।"

"একটা বিজ্ঞান পত্রিকার জন্যে কলাম তো লেখ?"

"ছোটখাটো একটা সাময়িকী। প্রতি সংখ্যাতে যে লিখি, সেটাও না।" কথাটা যে কেবল বিনয়ের খাতিরে বলেছি, তা নয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সমাজ' এই শিরোনামে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। সম্পাদক উপযুক্ত কোনো বিষয় খুঁজে পেলে আমাকে জানায়। বর্তমানে আলোচিত কোনো বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা করি। প্রাথমিকভাবে আমার উর্ধ্বতন এক প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করেছিল সাময়িকীর সম্পাদক। তার বন্ধু লোকটা। কিন্তু এসব 'ছাইপাশ' লিখে মূল্যবান সময় নষ্ট করবে প্রফেসর? প্রশ্নই আসে না। তাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রতিবেদনটার কথা এখনো মনে আছে। 'বেজবলে যেভাবে খেলোয়াড় বাছাই করা হয়'। এরপর আমার আরো সাতটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

"পত্রিকাটার নাম শুনেছিলাম। লাইব্রেরিতে গিয়ে অবশ্য সবগুলো পাইনি। তিনটা পড়েছি এখন পর্যন্ত।"

"তাই নাকি?" বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলি। "পড়ে নিশ্চয়ই হাসি পেয়েছে তোমার, তাই না?" সায়াকা সাহিত্যের ছাত্রী, এজন্যেই কথাটা বললাম। মাথা ঝাঁকায় ও।

"নাহ, মজা পেয়েছি পড়ে। বিষয়গুলোও দারুণ ছিল।"

"আচ্ছা। এই প্রথম কোনো পাঠকের কাছ থেকে সরাসরি প্রশংসা শুনলাম।"

ওর চোখে চোখ রাখার আগে আরেকবার চুমুক দিলাম কফির কাপে।

"আমাকে কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিলে?"

এবারে লম্বা একটা শ্বাস নিল ও, যেন নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। এরপর ব্যাগ থেকে বাদামি রঙের একটা খাম বের করে আনল। খামটা ওলটাতেই ভেতর থেকে শব্দ করে একটা চাবি পড়লো টেবিলের উপরে। সাথে একটা কাগজ। চাবিটা পেতলের, নিচের দিকে সিংহের মাথার নকশা। কাগজে কিছু কথা লেখা।

মাথা তুলে ওর দিকে তাকালাম।

"এগুলো কী?"

"আমার বাবার রেখে যাওয়া জিনিস," ধীরে ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করলো ও।

"মারা গেছেন উনি?"

"এক বছর আগে। হার্ট অ্যাটাক।"

"ওহ।"

খুব একটা যে কষ্ট পেলাম কথাটা শুনে, তা নয়। ভদ্রলোকের সাথে কখনো দেখা হয়নি আমার।

চাবিটা হাতে নিলাম। বেশ ভারী। এবারে খেয়াল করলাম কাগজটায় ম্যাপের মতন নকশা আঁকা। নিচে ডানদিকে ছোট করে একটা ট্রেন স্টেশনের নাম লেখা।

মাতসুবারাকোয়েকি, মাতসুবারা লেক স্টেশন। আমার যদি ভুল না হয় তাহলে জায়গাটা নাগানোতে। কোমোরো থেকে খুব একটা দূরে নয়।

"কী হয়েছে বলো তো।"

"আমি চাই এই ম্যাপে যে জায়গাটা দেখানো হয়েছে, সেখানে তুমি আমার সাথে আসো।"

"আমি? তোমার সাথে? কিন্তু কেন?" বিস্মিত স্বরে চোখ বড় করে বললাম।

হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল ও। আমার আঙুলে ওর আঙুলের পরিচিত স্পর্শ টের পেলাম অনেক দিন পর। একই রকম আছে ওগুলো। সরু, ফ্যাকাসে।

"আসলে, বাবার জীবদ্দশায় করে যাওয়া কিছু কাজ এখনো ভাবায় আমাকে," শান্তস্বরে বললো সায়াকা। "মাছ ধরতে ভালোবাসত সে। ছুটির দিনে সুযোগ পেলে একা একাই বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু কখনো কখনো কিছু বিষয় অদ্ভুত লাগত আমার। এই যেমন মাছ ধরার আগের দিন কোনো প্রস্তুতি না নেয়া, মাছের খাবার না বানানো। এমনকি বর্শি, ছিপ ঠিক আছে কিনা, তা-ও দেখত না। ফিরে আসত খালি হাতে। সাথে থাকত না কোনো মাছ। শুধু এটাই নয়, বাসায় ফেরার পর ছিপ পরিষ্কারও করতো না। কিন্তু বাবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। তার একদমই নোংরা সহ্য হতো না।"

"তাহলে কি তোমার ধারণা, মাছ ধরার নাম করে অন্য কোথাও যেত সে?"

"সেটাই তো একমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা, তাই না?"

"এটা কি প্রায়ই ঘটতো?"

"এই ধরো দুই তিন মাসে একবার। অবশ্য আমি যখন স্কুলে বা অন্য কাজে বাইরে থাকতাম, তখন বাবা বাড়ি থেকে বের হলে আমার জানার কোনো উপায় ছিল না।"

"কখনো কিছু জিজ্ঞেস করোনি?"

"করেছিলাম। বাবা, তুমি কি আসলেও মাছ ধরতে যাও?' জবাবে কোনো প্রকার তর্ক করেনি আমার সাথে। ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল 'ছিপ নিয়ে সেই জন্যেই তো বের হই।' আমি নিশ্চিত ছিলাম, মিথ্যে বলছে সে। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে বাবা। তার বাসাতেই যায় নিশ্চয়ই। ততদিনে মা মারা যাওয়ার কয়েক বছর হয়ে গেছে। সুতরাং, সে যদি অন্য কারো সাথে আসলেও সম্পর্কে জড়ায়, তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু হবে না।"

"এরকম ভাবনা মাথায় আসাই স্বাভাবিক," টেবিলে কনুই রেখে বললাম।

"হ্যাঁ, মা'র কথা ভেবে মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এটাও আশা করছিলাম, বাবা হয়তো আমার সাথে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিবে।" ক্ষণিকের জন্যে হাসি ফুটলো তার মুখে। এরপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল। "কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর কেউ যোগাযোগ করেনি আমার সাথে। সুতরাং, আমার অনুমান ভুল

ছিল, এই বিষয়ে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। এরপর দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যায়। তখনও আমি উত্তর পাইনি যে কোথায় যেত বাবা। কিন্তু কিছুদিন আগে এই চাবি আর ম্যাপটার খোঁজ পাই। মাছ ধরতে যাওয়ার সময় বাবা যে ব্যাগটা নিয়ে যেত, সেটার ভেতরেই ছিল।"

ম্যাপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুললাম। চোখাচোখি হয়ে গেল ওর সাথে।

"তাহলে তোমার ধারণা উনি ম্যাপে নির্দেশিত এই জায়গাটায় যেতেন?" মাথা নেড়ে সায় দেয় সায়াকা।

"আর তুমি ওখানে গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু দেখে আসতে চাও?" আবারো মাথা নাড়ে ও।

কাপটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে মনে হলো ভেতরে কিছু নেই। মাঝপথেই থেমে গেলাম।

"সেক্ষেত্রে তুমি একাই তো যেতে পারো। আমাকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?"

"আমি কখনো ওদিকে যাইনি আগে। তাছাড়া একা একা এতদূর যেতে ভালোও লাগবে না।"

"তাহলে অন্য কাউকে বলো।"

"আর কেউ নেই তো অমন। তুমি বাদে আমার এমন কোনো বন্ধু নেই যাকে ওখানে যেতে বলবো আমার সাথে।"

চোখ নামিয়ে নিল সায়াকা। দুই হাত মাথার পেছনে নিয়ে চেয়ারে দুলতে লাগলো সামনে পেছনে। বাচ্চাদের মতন এই কাজটা মাঝেমাঝে আগেও করতো ও।

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না," বলি ওকে। "এত বেশি চিন্তার তো কিছু নেই। ওখানে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে তোমার বাবা কী গোপন করেছেন এতদিন। তাছাড়া এটা এমন কিছু নয় যে এখনই জানতে হবে। তোমার হাজবেন্ড ফিরলে তার সাথেও যেতে পারবে। ধরো কোনো ছুটির দিনে গেলে। তোমাদের মেয়েও গেল সাথে। তিনজন একসাথে ঘোরাও হবে, আবার..."

মাঝপথেই থেমে গেলাম। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে ও। চোখমুখ একদম শক্ত। বিভ্রান্ত ভর করলো আমার মনে। "কোনো সমস্যা?"

এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে কান্না চাপার চেষ্টা করছে বুঝি। হঠাৎ এরকম আচরণের কারণ কী?

চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। নিজেকে একটু সামলে নিক ও। এরপর হয়তো নিজেই বলবে।

তবে এটা নিশ্চিত যে-কোনো সমস্যা আছে। নতুবা এত লোক থাকতে আমার সাথে যোগাযোগ করতো না। হাজার হলেও আমি ওর প্রাক্তন প্রেমিক। স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমাদের মধ্যে থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। প্রাক্তন প্রেমিকা

হঠাৎ এভাবে যোগাযোগ করলে অজান্তেই মনের কোণে আশার আলো জ্বলে ওঠে। হয়তো সে আবারো আমাদের সম্পর্কটা ঠিক করতে চায়।

কিছুক্ষণ পর মাথা তোলে ও। চোখ ঠিক লাল নয়। কিছু একটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কোনো একটা দৃশ্য মনোযোগ কেড়েছে খুব সম্ভবত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম সেদিকে। কম বয়সি এক জুটি প্রবেশ করেছে ক্যাফেতে। ছোটখাটো মেয়েটার পরনে খাটো স্কার্ট আর ঢিলেঢালা একটা টিশার্ট। ছেলেটা সেই তুলনায় বেশ লম্বা। একটা জিন্স আর পোলো শার্ট পরনে। রোদেপোড়া চেহারা দু'জনেরই।

তাদের দিকে তাকিয়েই সায়াকা বললো। "তুমিও আগে এরকমই ছিলে।"

ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিক্স দলে ছিলাম আমি। একশো মিটার দৌড় আর হাই জাম্পে অংশ নিতাম।

এবারে আমার দিকে তাকালো সায়াকা।

"মনে আছে তখনকার কথা?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"আমারও," একবার আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আবারো আমার মুখের দিকে তাকালো ও। "ইউনিভার্সিটির দিনগুলো?"

"অনেক কিছুই ভুলে গেছি। আবার কিছু কিছু বিষয় খুব ভালো মনে আছে।"

"আর প্রাইমারি স্কুলের কথা?"

"সেটা তো অনেক দিন আগের ব্যাপার। ভুলে যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক না? তখনকার বন্ধুদের চেহারা মনে করতে পারি না আর।"

"কিন্তু কোনো স্মৃতি আছে? এই যেমন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা শিক্ষা সফর?"

"ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা খুব ভালোমতই মনে আছে। কখনোই কোনো কিছুতে প্রথম হতে পারিনি।"

"তাই নাকি?" সায়াকার কণ্ঠে বিস্ময়, মুখে হাসির আভা। "আর এর আগে?"

"আগে বলতে?"

"প্রাইমারি স্কুলে পড়ার আগের কথা বলছি। তখনকার কথা কিছু মনে আছে?"

"কী বোঝাতে চাইছ, বলো তো?" জবাবে বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে বলি আমি।

"যা জিজ্ঞেস করলাম, সেটার উত্তর দাও।"

"আবছা মনে আছে। যাদের সাথে খেলতাম, মা-বাবার বকুনি, কেমন খেলনা ছিল—এসব।"

"তাহলে তখনকার স্মৃতি আছে তোমার। যে বাসায় থাকতে, যাদের সংস্পর্শে ছিলে- তাদের মনে আছে?"

"থাকবে না কেন?" হেসে বলি। "হঠাৎ এসব জিজ্ঞেস করছো যে?" আবারো দ্বিধার ছাপ ফুটলো ওর চেহারায়। যেন কথাটা বলবে কিনা ভাবছে।

“আমার নেই।”

“তোমার নেই মানে?”

“কোনো স্মৃতি নেই,” দ্রুত একবার শ্বাস টেনে বলে ও। “যে বাসায় থাকতাম, যাদের সাথে থাকতাম, কোনো বিশেষ খেলনার স্মৃতি— এসব কিছুই মনে নেই আমার। সেসব স্মৃতির খোঁজেই আবার যেতে চাই।”

২

“ছোটবেলার স্মৃতি বলতে কেবল প্রাইমারি স্কুলের কিছু বিষয় মনে আছে আমার। বিশেষ করে নবীনবরণ অনুষ্ঠান। মা’র হাত ধরে গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম। দুই পাশে ছিল সারি সারি চেরি গাছ। তুষারপাতের মতন পাপড়ি ঝরে পড়ছিল...”

কিছুক্ষণের জন্যে যেন হারিয়ে গেল ও। “কিন্তু এর আগের কোনো কিছু মনে নেই একদমই। কিচ্ছু না।” প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় সায়াকা।

আমি এখনও পুরোপুরি ধরতে পারছি না, ও কী বোঝাতে চাইছে। কিছুক্ষণ পর মুখ খুললাম, “তাতে কী? এটা কোনো গুরুতর ব্যাপার না। অনেকেই নিজেদের অতীত ভুলে যায়। এতে আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।”

“কেউ কিন্তু একেবারে কিছু ভুলে যায় না। ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিকে হয়ে আসতে পারে। আমার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটলে, এত চিন্তা হতো না।” “কেন, তোমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওরকম না?”

“না। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়েও বিষয়টা ভাবাত আমাকে। নিজেকে প্রশ্ন করতাম কেন আমার আগের কোনো স্মৃতি নেই। বড় হয়ে একদম ছোটবেলার কথা ভুলে যেতেই পারি, সেটা নাহয় মেনে নিলাম। কিন্তু স্কুলে থাকতে তো তেমনটা হবার কথা নয়।”

“তা ঠিক-”

“বিষয়টা এতই অদ্ভুত যে আমার বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার প্রশ্ন ছিল কেন কিন্ডারগার্টেনের কোনো স্মৃতি মনে নেই। তখন বাবা বলে, ছোটবেলার স্মৃতি ভুলে যেতেই পারি। কিন্তু তার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমার বন্ধুদের কারো মধ্যে এরকম সমস্যা ছিল না। এসব চিন্তা মাথায় এলেই অস্বস্তিতে ভুগতাম। তা সত্ত্বেও বাস্তবতা মেনে নিয়ে সামনে এগোতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতাম, জানো? বড্ড একা মনে হতো নিজেকে। ভয় লাগতো,” বুকে হাত রেখে লম্বা একটা শ্বাস নিল ও।

“তোমার কি আসলেই কিছু মনে নেই?”

“একদমই না। স্মৃতির পাতাগুলো খালি, সাদা কাগজের মতন,” চেহারায় বেদনার ছাপ স্পষ্ট সায়াকার। “তোমার যেমন কিছু কিছু বিষয় মনে আছে, আমার তা-ও নেই।”

“তোমাদের বাড়িতে কোনো ছবির অ্যালবাম ছিল না? সেখানে নিশ্চয়ই ছোটবেলার ছবি আছে? অন্তত যেদিন প্রথমে স্কুলে গেলে, সেদিনকার অনুষ্ঠানের ছবি তো থাকার কথা। সেগুলো দেখলে কিছু মনে পড়ে না?”

“বাবা-মা আমার অনেক ছবি তুলতো। দুই অ্যালবাম ভর্তি ছবি আছে। কিন্তু আমি একদম ছোট, এরকম কোনো ছবি নেই। প্রথম অ্যালবামটার প্রথম পাতার ছবিটা প্রাইমারি স্কুলের নবীন বরণের দিন তোলা।” “অসম্ভব।”

“এটাই সত্যি। তুমি চাইলে আমি দেখাতে পারি। বাসাতেই আছে।” “আর আংকেল-আন্টি তোমাকে প্রাইমারি স্কুলের আগের সময়কার কোনো গল্প বলেনি?”

“হুম,” একদিকে মাথা কাত করে ও। “নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু গল্প বলেছে। একটা গল্প আমার মনে আছে। পাঁচ বছর বয়সে আমাকে নাকি একবার হারিয়ে ফেলেছিল। দু’জনেই ভয় পেয়ে যায় ভীষণ। সব জায়গায় খুঁজতে থাকে। কিন্তু আমি নাকি আলমারিতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।”

“এই গল্পগুলোর কোনো অর্থই নেই তোমার কাছে?”

“আমার মনে হতো যেন অন্য কারো গল্প শুনছি,” দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সায়াকা। “আর সত্যি বলতে বাবা-মা’কে দেখে মনে হতো না খুব একটা আগ্রহ আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপের। মুখ বেজার হয়ে থাকতো তাদের। যেন অপ্রীতিকর সব ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে।”

“অপ্রীতিকর ঘটনা—”

কথাটা কেন বললো ও, কে জানে! একদম ছোটবেলার কোনো স্মৃতি নেই ওর, এই বিষয়টা অদ্ভুত। কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত ওর বাবা-মা’র কাছে তখনকার কোনো স্মৃতিচিহ্ন না থাকাটা। বাবা-মায়েরা শুধুমাত্র এই কাজটা করার জন্যে হলেও ক্যামেরা কেনে।

“আগে তো কখনো এই ব্যাপারে কিছু বলোনি তুমি আমাকে।”

“তোমার সাথে আমার যখন পরিচয়, ততদিনে বিষয়টার সাথে আপস করে নিয়েছিলাম। বলা যায় হাল ছেড়ে দেই একটা পর্যায়ে। কিন্তু শৈশবের কোনো স্মৃতি নেই, এই ব্যাপারটা সবসময় খোঁচাত আমাকে। আমাদের সম্পর্কটা যখন প্রণয়ে গড়ায়, তখনও ভুলিনি। “

নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিড়ে। আঙুলগুলো একসাথে করে টেবিলের উপর রাখলাম, আবার সরিয়ে নিলাম। ওর কথাগুলো হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

“তোমার বোধহয় ধারণা, এমন কিছু একটা ঘটেছিল যেটায় তুমি শৈশবের সমস্ত স্মৃতি হারিয়েছ, তাই না?” ভাবনাগুলো গুছিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

“আর এখানে গিয়ে দেখতে চাও, কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা?” টেবিলে রাখা ম্যাপটার দিকে ইঙ্গিত করলাম।

“আসলে একটা বিষয় মনে আছে আমার।”

“কী?”

“এই চাবিটা,” বলে সিংহের মাথা নকশার চাবিটা হাতে নেয় ও। “আগে কোথাও দেখেছিলাম একবার। কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হবার পরে নয়, আগে। যদি ওখানে গিয়ে জানতে পারি এটা কিসের চাবি, তাহলে হয়তো কিছু মনে পড়তে পারে।”

আবারো বুকের ওপরে হাত ভাজ করে রাখলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে শব্দ করে শ্বাস ছাড়লাম একবার।

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না। বিষয়টা কি আসলেও এতটা জরুরি? এটা জানি যে দীর্ঘ সময় ধরে তোমাকে ভোগাচ্ছে চিন্তাটা। কিন্তু এতদিনে তো তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই না? তাছাড়া শৈশবের স্মৃতি আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হয় না। তোমার ভাগ্যে যা আছে, ভবিষ্যতে সেটাই হবে।"

চোখ বন্ধ করে নিল সায়াকা। রাগ চাপার চেষ্টা করছে খুব সম্ভবত। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো।

"কিন্তু স্মৃতিগুলো আমার দরকার।"

"কেন?"

"কিছুদিন আগে খেয়াল করেছি খুব জরুরি কিছু বিষয় মনে নেই আমার, যেগুলো থাকা উচিত ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এমন কিছু খুঁজে পাইনি, যা সেই স্মৃতিগুলো আবার মনে পড়ার ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।"

"জরুরি কিছু বিষয় মনে নেই?"

"না," দৃঢ় কণ্ঠে বলে ও। "এটা কেবলমাত্র আমার পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব। তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না বোধহয়।"

জবাবে সায়াকা এমন কিছু বলতে পারে, তা মাথায় আসেনি আমার। এতক্ষণের সমস্ত প্রতিরোধ গুড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

"আরেকটু খুলে বলো আমাকে। কেন তোমার এমনটা মনে হচ্ছে যে জরুরি কিছু বিষয় ভুলে গেছ?"

"এখানে সেই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না," মাথা ঝাঁকায় সায়াকা।

"তাহলে কোথায় বলবে?"

"যদি আমার সাথে ওখানে যাও, সবকিছু জানাবো," বলে ম্যাপে হাত রাখে সায়াকা। "যদি আমরা এখানে যাই, আর আমার শৈশবের স্মৃতি যদি ফিরে আসে, তাহলে তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারব নিশ্চয়ই। এজন্যে চাইছি তুমি আমার সাথে যাবে।"

মাথা চুলকালাম আমি। "কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছে সবকিছু।"

"মাফ চাইছি সেজন্য। জানি, আমার কথা কতটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব না," আবারো মাথা নামিয়ে নিল ও।

ওর মানসিক অবস্থা যে ভালো না, তা আচরণেই স্পষ্ট। যে-কোনো মূল্যে স্মৃতিগুলো ফিরে পেতে চাইছে। ওকে সাহায্য করার ইচ্ছেও আছে আমার। কিন্তু ঠিক কী কারণে সাহায্য করছি, তা না জানলে বিষয়টা ঘোলাটেই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত।

"আমার পক্ষে তোমার সাথে যাওয়া সম্ভব না," বলি। "এই কাজের জন্যে আমি সঠিক লোক নই আসলে। অন্য কেউ নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে

তোমাকে।”

“এতক্ষণ আমার কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর, এটা তোমার জবাব?”
“তুমি সবকিছু বলোনি। তাছাড়া তোমার এরকম ভেঙ্গে পড়ার পেছনে মূল কারণ কী, সেটাও জানি না। আমি সাথে না গেলেই ভালো হবে বোধহয়।”

কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না সায়াকা। বোধহয় অনুরোধ করতে করতে ক্লান্ত। কিংবা, বুঝতে পেরেছে যে অনুরোধেও কোনো কাজ হবে না। হাত বাড়িয়ে কাপটা তুলে নিল ও, কিন্তু অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে ওটা।

কেউই কিছু বললাম না লম্বা একটা সময়। আশপাশের কোলাহল আগের মতই আছে। কিছুক্ষণ আগে ক্যাফেতে আসা সেই জুটির দিকে তাকালাম। দু'জনের মুখেই দরাজ হাসি 1

“বেশ,” কিছুক্ষণ পর মুখ খোলে সায়াকা। “ভুল ভেবেছিলাম বোধহয়। তোমার নিজের একটা জীবন আছে। প্রাক্তন প্রেমিকার সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময় হবে না এটাই স্বাভাবিক।

“তুমি যদি বিপদে পড়ো, তাহলে অবশ্যই আমাকে পাশে পাবে। কিন্তু এভাবে না।”

“ধন্যবাদ। কিন্তু অন্য কোনোভাবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না,” সায়াকার মুখে মলিন হাসি।

চাবি আর ম্যাপটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো আবারো। ও উঠে দাঁড়ালে বিলের কাগজটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালাম। একই সময়ে সায়াকাও হাত বাড়ানোয় কাগজটা নিয়ে এক প্রকার টানাটানি শুরু হয়ে গেল।

“আমি বিল দিব,” বললাম।

মাথা ঝাঁকায় সায়াকা। “নাহ, আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।”

“তো কী হয়েছে?”

বিলটা ধরে তখনও নিজের দিকে টানছিলাম, এসময় ওর বাম হাতের কব্জির দিকে নজর গেল। ঘড়ির বেল্টের সমান্তরালে দুটো লাল দাগ। ছেড়ে দিলাম বিলটা। কী বলবো বুঝতে পারছি না।

সায়াকা সম্ভবত টের পেয়েছে আমার নজর কোন দিকে। বিল সমেত হাতটা দ্রুত পেছনে নিয়ে গেল।

“আমি দিচ্ছি বিল।”

বাম হাতটা দৃষ্টির আড়ালে রেখেই ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে ছুটে গেল ও।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। কব্জির ওই লাল দাগগুলোর কথা ভুলতেই পারছি না। চমকে গেছি বললেও কম হয়ে যায়।

সায়াকা ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। বকুনির ভয়ে বাচ্চাদের যেমন চেহারা হয়, ওকেও সেরকমই দেখাচ্ছে এখন।

“যোগাযোগ করার জন্যে ধন্যবাদ,” বলি আমি।

জবাবে বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো ও, ঠিক শুনতে পেলাম না। হোটেল থেকে বের হওয়ার দরজার দিকে পা বাড়ালাম। আমার পেছন পেছন এলো সায়াকা। আন্ডারপাসের দিকে পা বাড়াতে যাব, এসময় থেমে গেল ও।

"আমি ট্যাক্সিতে ফিরব।"

"ঠিক আছে।"

এরপরেও লম্বা একটা সময় বিদায় না জানিয়ে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জন। স্যুট-টাই পরিহিত তিনজন লোক পাশ কাটিয়ে গেল আমাদের।

এক পা এগোলাম ওর দিকে।

"তোমার হাজবেন্ডের কানে তো যাবে, তাই না?"

"কী?"

"তুমি যদি হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাও, সে তো জানবে?"

"ওহ," টান টান হয়ে থাকা দড়ির গিট খুলে যাওয়ার মতন শান্তি ফুটলো ওর চেহারায়। "সেদিকে খেয়াল রেখেই যা করার করতে হবে। তাছাড়া ওর আসতে এখনো প্রায় ছয় মাস।"

"ওহ আচ্ছা।"

মাথার ভেতরে নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আসলে এখনো দ্বিধায় ভুগছি।

এসময় সায়াকা মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে।

"আসবে তুমি আমার সাথে?"

"আগামী শনিবার সময় হবে তোমার?" ঠোঁট ভিজিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সায়াকা।

"হ্যাঁ, হবে।"

"তাহলে আমাকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফোন দিও একবার। কীভাবে সবকিছু করবো, সেই ব্যাপারে আলাপ করা যাবে।"

"ঠিক আছে," চোখ পিটপিট করছে ও। "ধন্যবাদ।"

ওর বাম হাতের কব্জির দিকে তাকালাম আবারো। কিন্তু আমার নজর কোনদিকে সেটা টের পাওয়ার সাথে সাথে ডান হাতের তালু দিয়ে ঢেকে ফেলল জায়গাটা। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"তুমিও ট্যাক্সিতেই চলো নাহয়? আমি নামিয়ে দিচ্ছি তোমাকে?" আগের তুলনায় কিছুটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ও।

"না, ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

ওকে ওখানে রেখে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তা পার হয়ে ওর দিকে ফিরে দেখি এখনো আমাকেই দেখছে। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম এবারে।

৩

নিঃসঙ্গ একটা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে। বোঝাই যাচ্ছে বেশ গরম পড়বে আজ। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। মাথাটা বেশ ভারী ভারী ঠেকছে। গত রাতে অতিরিক্ত ব্র্যান্ডি খাওয়ার ফল। ঘুম একদমই হয়নি। পরদিন কী হবে, সেই চিন্তাই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল পুরোটা সময়।

ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা। আমার হিসেবে রীতিমতো ভোর। শেষ কবে এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছিলাম ভুলে গেছি। কিছুক্ষণ হালকা ব্যায়াম করে সময় নিয়ে শেভ করলাম। দাঁত ব্রাশ করে হাতমুখ ধুয়ে বের হয়ে দেখি কেবল বিশ মিনিট গেছে। আটটা নাগাদ বের হয়ে যাব বিধায় আর নাস্তা করলাম না।

খবরের কাগজের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। টিভিতে খবর দেখলাম কিছুক্ষণ। আটটা বাজার অপেক্ষায় আছি শেষ কয়েক মিনিট মনে হলো যেন একেকটা ঘণ্টা।

কিশিতানি বুলভার্দ পেরিয়ে ডানে একটা পার্শ্বরাস্তায় ঢুকিয়ে দিলাম গাড়ি। এদিক দিয়ে পশ্চিমে কিছুদূর এগোলেই কোশু। শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় অনেকেই ঘুরতে বেরিয়েছে। পর্যটকবাহী অনেকগুলো গাড়ি চোখে পড়লো।

আরো কিছুক্ষণ সামনে এগোনোর পর বাম দিকে রয়্যাল হোস্টের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়লো। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলাম। জানালার পাশে একটা টেবিলে বসে আছে সায়াকা।

"সরি, তোমাকে বসিয়ে রেখেছি এতক্ষণ," ওর সামনে রাখা খালি চায়ের কাপটা দেখে বললাম।

"আরে, সরি কেন বলছো, আমিই বেশি আগে চলে এসেছি," মাথা ঝাঁকিয়ে বলে সায়াকা। "ভেবেছিলাম ভিড় থাকবে রাস্তায়।"

গতকাল সন্ধ্যায় ফোনে আলাপ করে ঠিক করেছিলাম ও একটা ট্যাক্সিতে করে এখানে চলে আসবে সকালে। যাওয়ার পথে আমি ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এক কাপ কফি আর স্যান্ডউইচের অর্ডার দিলাম। সায়াকা এক স্কুপ আইসক্রিম দিয়ে যেতে বললো।

"আজকে আবহাওয়া বেশ ভালো দেখছি," আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলাম।

"ভালোই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু আবহাওয়া রিপোর্ট মোতাবেক সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামতে পারে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, নাগানোর আবহাওয়া অধিদপ্তরে ফোন দিয়েছিলাম।"

"তুমি দেখি সবকিছুই আগে থেকে ভেবে রেখেছ।"

মনে মনে নিজেকে শুধালাম, আবহাওয়া যে-কোনো সময় বদলে যেতে পারে। আড়চোখে সায়াকাকে দেখছি। ওর লুই ভ্যুইতোঁ ব্যাগটা ফুলে আছে বেশ। আজকে গিয়ে আবার আজকেই ফিরে আসার কথা আমাদের। একদিনের জন্যে এতকিছু নেয়ার দরকার আছে কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাটা মানায় না, তাই মুখ বন্ধই রাখলাম। ওর ব্যাগের পাশেই বড় একটা কাগজের ব্যাগ। এটার ভেতরেই বোধহয় ছবির অ্যালবামগুলো। আগের দিন বলেছিল, সাথে করে নিয়ে আসবে।

একজন ওয়েট্রেস এসে আমাদের অর্ডার করা খাবারগুলো টেবিলে রেখে গেল। সায়াকা আইসক্রিম খেতে খেতে, কফি আর স্যান্ডউইচ শেষ করে ফেললাম। এখনও সেই আগের মতন চামচ থেকে একটু একটু করে আইসক্রিম চেটে খাচ্ছে ও, এই অভ্যাসটা বদলায়নি।

ওর বাম হাতের কব্জির দিকে তাকালাম আড়চোখে। আজকের ঘড়িটা ভিন্ন। আগের দিনের চেয়ে বেশ মোটা। ক্ষতচিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে না সেই কারণে। সেই উদ্দেশ্যেই পরেছে নিশ্চয়ই।

নাস্তা পর্ব শেষ হলে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। কোশুর মূল সড়ক ধরে আরো পশ্চিমে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর শোফু ইন্টারচেঞ্জে পৌঁছে গেলাম।

"একটা গানের সিডি নিয়ে এসেছি, বাজাব ওটা?" সায়াকার চোখে লাজুক দৃষ্টি। আমার গাড়ির সিডি প্লেয়ারটা বেশ ভাল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু কার গান?" মনে মনে আশা করছি ইউমিঙের গান ছাড়বে না। একবার পুরো একটা অ্যালবাম শুনিয়েছিল। কান দিয়ে রক্ত পড়া বাকি ছিল কেবল।

স্পিকারে কুইনের গান বেজে উঠল একটু পর। তবে কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম এটা ফ্রেডি মারকারির কণ্ঠ নয়, অন্য কেউ গাইছে। সায়াকা জানালো এই আর্টিস্টের নাম জর্জ মাইকেল।

"আর কী শোনো তুমি?"

"বন জোভি শোনা হয় মাঝে মাঝে," জবাব দেয় ও।

আগে এই ধরনের গান খুব বেশি শুনতো না সায়াকা। পছন্দ বদলেছে তাহলে। দীর্ঘ একটা সময় ধরে যোগাযোগ নেই আমাদের মধ্যে, এই সত্যটা আরো একবার টের পেলাম।

খুব বেশি ট্রাফিক জ্যাম নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সুতামা ইন্টারচেঞ্জে। কিন্তু টোল বুথ অবধি পৌঁছতে বেশ সময় লেগে গেল। কিয়োসাতোর উদ্দেশ্যে চলেছে অনেক গাড়ি। বেশিরভাগই নানান বয়সি জুটি। বাইরে থেকে দেখলে আমাদেরও নিশ্চয়ই সেরকমই মনে হচ্ছে। ছুটির দিনে ঘুরতে বেরিয়েছি। ছাত্রাবস্থায় আসলেও একবার আমরা কিয়োসাতো তে গিয়েছিলাম। ছবির বইগুলোতে যেরকম গেস্টহাউজ দেখা যায়, ওরকম একটা গেস্টহাউজে ছিলাম

সেবার। পার্শ্ববর্তী একটা ফরাসি রেস্তোরাঁর স্বাদহীন খাবারগুলোর কথাও মনে আছে।

পাশে বসা সায়াকা হেসে উঠল এসময়। অন্যান্য গাড়িগুলোর সাথে উত্তরে চলেছি আমরা। আগের এই ওয়ান ফোর্টি ওয়ান ন্যাশনাল লাইনের নাম বদলে এখন রাখা হয়েছে কিয়োসাতো লাইন। দু'পাশে জিংকগো গাছের সারি।

"কী হলো, হাসছ কেন?"

"এই রাস্তা দিয়ে এর আগেও একসাথে গিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে? একটা সুন্দর গেস্টহাউজে ছিলাম।"

"হ্যাঁ।"

আমিও যে একই কথাই ভাবছিলাম, তা আর বললাম না।

"জায়গাটা দেখার সাথে সাথে আরেকটু হলে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছিলে। তোমার নাকি এরকম লাভ হোটেলগুলো[1] একদম অপছন্দ।"

"আসলেও অপছন্দ," হেসে বলি।

"শেষ পর্যন্ত অবশ্য থাকতে রাজি হয়েছিলে। কিন্তু পরদিন কিয়োসাতোতে গিয়ে স্যুভনির দোকানগুলো দেখে তোমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল!"

"উফ! জঘন্য!"

"বারবার আমাকে খোঁচাচ্ছিলে যেন তখনই ফিরে যাই। ঠিকমতো কেনাকাটাও করতে পারিনি। "

"আসলে ওখান গিয়ে কেমন যেন লজ্জা লাগছিল।"

"অভিজ্ঞতাটা সুখকর ছিল না আসলেও।"

দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠলাম এবারে। ভাবলাম একবার বলি কেনাকাটার জন্যে কিয়োসাতো'তে থামা যেতে পারে, কিন্তু গিলে ফেললাম কথাগুলো। অ্যাকসেলেরেটরে চেপে বসলো পা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারি সারি রঙচঙে সব ক্যাফে আর রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো। জায়গাটা এখনও আগের মতনই আছে।

আরেকটু সামনে এগোনোর পর বাম দিকে একটা রাস্তা চলে যেতে দেখলাম। সেদিকে গেলেই কিয়োসাতো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গাড়ি সোজা চালিয়ে এসে পড়লাম।

"তোমার বাবা কি সবসময় গাড়িতে করেই যেত?"

"হ্যাঁ, বাবা ট্যাক্সি চালাত।"

ভুলে গেছিলাম এটা। হাইস্কুলে থাকতে ও বলেছিল আমাকে।

"আংকেল যদি শীতকালেও এখানে আসেন, তাহলে চাকায় চেইন ব্যবহার করতে হতো নিশ্চয়ই।"

"তুমি বলাতে খেয়াল হলো, বাবা সবসময় ট্রাঙ্কে চেইন রেখে দিত তখন ভাবতাম তুষারঝড়ে আটকা পড়ার পূর্বসতর্কতা হিসেবে এমনটা করতো সে।"

"প্রায়ই এখানে আসতে হতো বোধহয়, তাই কাছেই রাখত চেইনগুলো।"

"হ্যাঁ," সায় দিল ও।

গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে টানা গাড়ি চালালাম আরো বেশ কিছুক্ষণ। কোমি লাইন লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে আসার পর দু'পাশে বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল আগের তুলনায়। প্রাইমারি স্কুল পড়ুয়া বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে।

উমিনোকুচি পার করে এলাম। এর দশ মিনিট পরে মাতসুবারা লেক লেখা একটা সাইন চোখে পড়লো। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর স্টেশনের সাইনবোর্ড দেখলাম ডান দিকে। ম্যাপের নির্দেশনা অনুযায়ী সেদিকে ঢুকে পড়লাম। একদম ছোট্ট একটা স্টেশন। দেখে মনে হবে কারো বাড়ি বুঝি। ঢোকার পথে উপরে কাঠের প্যানেলে আদিকালের নকশায় মাতসুবারাকয়েকি লেখা। নামফলকের চারপাশের পেরেকগুলোয় জং ধরে গেছে। অন্ধকার ওয়েটিং রুমটা আমি ছাত্রাবস্থায় যে ভাড়া করা ঘরটায় থাকতাম, সেটার চেয়েও ছোট। একপাশের তাকে পুরোনো 'শোনেন জাম্প' আর 'শোজো ফ্রেন্ড' ম্যাগাজিন রাখা কম বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্যে। ট্রেনের শিডিউল একপাশের দেয়ালে টাঙ্গানো, হাতে লেখা হয়েছে সেগুলো। প্রতি নব্বই মিনিটে একটা করে ট্রেন আসে। কিছুক্ষণ আগেই একটা গেছে। প্লাটফর্মে কেউ নেই। নির্জন চেকপয়েন্টটা পার হয়ে সেখানে গেলাম আমরা। একটাই লাইন সামনে। সুনসান, নিস্তরঙ্গ পরিবেশ।

"আমাকে ম্যাপটা একটু দেখাবে?" সায়াকাকে বললাম। ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ও।

ম্যাপে দেখানো হয়েছে কীভাবে মাতসুবারা লেক স্টেশন থেকে গন্তব্যে যেতে হবে। গন্তব্য বোঝানোর জন্যে ম্যাপের বাম দিকে ওপরে একটা কালো ডট ব্যবহার করেছেন সায়াকার বাবা। দেখে মনে হচ্ছে একটা লম্বা আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে অনেকটা দূর। রাস্তার দুই পাশে 'তিনটা পাইন গাছ' বা 'বড় গাছের গুড়ি- এরকম বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া। আমাদের গন্তব্যের কাছে লেখা 'সিংহ'। এখন অবধি জানি না এই কথাটা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সায়াকার কাছে সিংহের মাথার নকশার একটা চাবি আছে। সুতরাং বলা যায়, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

"ওখানে গিয়েই দেখতে হবে সবকিছু," বলি।

"হ্যাঁ," প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলে সায়াকা।

স্টেশন থেকে মূল সড়কে ফিরে এলাম আমরা। কিয়োসাতোকে পেছনে ফেলে ম্যাপের নির্দেশনা অনুযায়ী ডান দিকের রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলাম গাড়ি। এখন চারপাশে খাড়া সব পাহাড়।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌছুলাম। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে ইনাগো হট স্প্রিং শহরে। আমরা মাতসুবারার দিকে এগোলাম।

খানিক পরেই ডান দিকে হ্রদটা চোখে পড়লো প্রথমবারের মতন। ছোট বড় অসংখ্য হোটেল লেকের পাশে। বেশিরভাগ পার্কিং লটই খালি। উইকেন্ড হওয়া

সত্ত্বেও ভিড়-বাট্টা তেমন একটা নেই।

তবে যতই সামনে এগোলাম বাড়ির সংখ্যা কমতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বন দেখতে পেলাম আমাদের সামনে। সেই বনের প্রবেশ পথের ঠিক পাশে তিনটা পাইন গাছ। ম্যাপে তাহলে ঠিকঠাক নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। গাড়ি নিয়ে বনে ঢুকে পড়লাম।

ম্যাপ মোতাবেক এবারে বড় একটা গাছের গুড়ি দেখতে পাওয়ার কথা, যার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়লো না। বেশ কয়েকবার তীক্ষ্ণ মোড় নিল পথটা। এভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই ভালো রাস্তায় উঠে পড়লো গাড়ি। এখান থেকে চারপাশে চলে গেছে অনেকগুলো পথ। সেরকমই একটা পথে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। পশ্চিমা নকশার বেশ কয়েকটা বাড়ি এবং কাঠের কেবিন চোখে পড়লো। বনের সাথে একদম মিশে আছে ওগুলো। এখানে নিশ্চয়ই বসতি স্থাপনের আজ চলছে।

"ম্যাপের কালো ডটটা দিয়ে বোধহয় এরকমই একটা বাড়ির কথা বলা হয়েছে," সায়াকা বলে।

"খুব সম্ভবত," বললাম। "কিন্তু আমাদের গাছের গুড়িটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"ওটা বোধহয় এদিকে নয়। এখানকার পথগুলোর নাম আছে কিন্তু, ওই সাইনবোর্ডটায় দেখো। বাবা কোনো নাম লেখেনি ম্যাপে।"

"তা ঠিক," বলে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেললাম।

এবারে উল্টো পথে চলছে গাড়ি। বেশ কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়লো, বেশিরভাগই খালি।

বাড়িগুলো ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে এসেছি, এমন সময় সায়াকা চিৎকার করে উঠলো, "ওই তো!"

গাড়ি থামিয়ে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। রাস্তার পাশে একটা চৌকো পাথর। কয়েক হাতের মতন লম্বা। পাথরটার তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই, তবে গাছের গুড়ি বলেও সহজে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। ওটার ঠিক পাশ দিয়েই একটা ছোট রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু এত সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো সহজ হবে বলে মনে হয় না।

"হ্যাঁ, ওদিকেই যেতে হবে খুব সম্ভবত," বলে খানাখন্দে ভরা রাস্তার মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। চাকাগুলো শব্দ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিছুটা পথ যাওয়ার পর ডানদিকে পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউজের মতন দেখতে একটা দালান চোখে পড়লো।

সামনে এগোতে থাকলাম। রাস্তার দুইপাশে আগাছায় ভর্তি। সেগুলোর মধ্যে দিয়েই যেতে হচ্ছে।

আরেকটু যাওয়ার পর রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেল দুই দিকে। ম্যাপেও এমনটাই দেখানো হয়েছে। গাড়ি থামিয়ে চারপাশে তাকালাম। এবারে শেষ নির্দেশনা চিহ্নটা

খুঁজে বের করার পালা।

ডানদিকে ছোট একটা সাইনবোর্ড। কিছু লেখা নেই সেখানে। সাদা রঙ দিয়ে কী যেন একটা আঁকা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় রঙ উঠে যাওয়ায় বুঝতে কিছু কষ্ট হলেও এটা স্পষ্ট যে একটা সিংহ আঁকা হয়েছিল সেখানে। আর কথা না বাড়িয়ে সেদিকে ঘুরিয়ে দিলাম গাড়ি। সায়াকাও কিছু বলছে না।

দশ মিটারের মতন যাওয়ার পরে একটা ধূসর বাড়ি চোখে পড়লো আমাদের বাম দিকে। চারপাশে এমনভাবে ঝোপঝাড় আর আগাছা গজিয়েছে যে দূর থেকে কেবল দ্বিতীয় তলাটা দেখা যাচ্ছে।

ওখানেই গাড়ি পার্ক করলাম। রাস্তা শেষ। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে তাকালাম বাড়িটার দিকে।

৪

বাড়িটা এখন ধূসর দেখালেও আগে যে সাদা রঙ করা হয়েছিল, তা বোঝা যাচ্ছে। ঢালু ছাদের দু'পাশে দু'টো ত্রিভুজাকৃতির স্কাই-লাইট। আর ভাইলাইট দু'টোর মাঝে একটা ছোট চৌকো চিমনি।

কোনো বেড়া চোখে পড়লো না। তবে ইটের পিলারের মাঝে গেটটা বহাল তবিয়তেই আছে। সেখান থেকে একটা সিমেন্টে বাঁধানো পথ চলে গেছে সামনের পোর্চের দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগোলাম আমরা। পর্দা থাকার কারণে জানালা দিয়ে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। নিচতলার সবগুলো জানালাই বন্ধ।

বাড়িটার বাম দিকটা তুলনামুলক চওড়া। আসলে সামনে পোর্চের কারণে অমন দেখাচ্ছে। পোর্চের নিচে বাড়ির দেয়ালগুলোর মতন ধূসর একটা দরজা। আর সেটার বাম দিকে কিছুটা অংশ সামনে বেরিয়ে আছে। দরজার উপরে এবং চারপাশে নজর বুলালাম। কোনো নামফলক চোখে পড়লো না।

"দেখে তো মনে হচ্ছে না কেউ থাকে," আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো সায়াকা। "এরকম বাড়িকে ভিলা বলে বোধহয়।"

"হ্যাঁ।"

কলিংবেল গোছের কিছু চোখে পড়লো না। অগত্যা আঙুল দিয়ে দরজায় খটখট করলাম তিনবার। এরকম নির্জন পরিবেশে ভোঁতা শব্দটা আমার নিজেরই কানে লাগলো। দরজার যেখানটায় ছুঁয়েছি, সেখানে ধুলোর মধ্যে দাগ বসে গেছে।

যেরকমটা অনুমান করেছিলাম, ভেতর থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর সায়াকা। কাঁধ ঝাঁকালাম এর উদ্দেশ্যে। "চাবি দিয়ে চেষ্টা করে দেখবে নাকি?"

"তাই করি।"

ব্যাগ থেকে চাবি বের করে আমার হাতে দিল ও।

দরজার হাতল বাম দিকে। আর লকটা তার ঠিক নিচে। চাবিটা লকে ঢুকাতে গিয়েও থেমে গেলাম।

"নাহ, এটা না।"

"কী সমস্যা?"

"লকটা অন্যরকম। এটা এই লকের চাবি না।"

তবু চেষ্টা করলাম। চাবিটা লকের তুলনায় বেশ বড়।

"এত কষ্ট করে এতদূর এলাম, কিন্তু এখন এই চাবি কাজ করবে না!" হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে সায়াকা। "এই ম্যাপের সাথে তাহলে চাবির কোনো সম্পর্ক নেই?"

"সেটা এখনই বলা যাবে না।"

ওখান থেকে সরে বাড়িটার পেছন দিকে চলে এলাম আমরা। এদিকটায় বন একদম কাছে। ঘন গাছগুলোর ডালপালা বাড়ির ছাদ অবধি পৌঁছে গেছে।

সামনের দিকের দরজার ঠিক উল্টোপাশে এদিকে একটা ধাতব প্যানেল চোখে পড়লো। দেখতে অনেকটা দরজার মতন। একপাশে কবজাও আছে। অর্থাৎ, খোলা যায় এটা।

"এটা কি স্টোরেজ রুম নাকি?" সায়াকা পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো।

"হয়তো। কিন্তু কীভাবে যে খুলবো।"

কোনো হাতল চোখে পড়োলো না প্রথমে। কিন্তু যেখানে হাতল থাকার কথা সেখানে হাতের মুঠোর আকৃতির একটা পিতলের ফলক। আর এই ফলকটা সিংহের মাথার নকশার।

"এটা আবার কী?"

ফলকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সায়াকা। ওটা ধরে একপাশে টান দিতেই নড়ে উঠলো। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর।

এবারে আমি সামনে এগোলাম। ফলকটা ধরে ধাক্কা দিলাম একপাশে। দীর্ঘদিন কেউ ছোয়নি বিধায় আটকে গেল প্রথমে। তবে একটু চাপ প্রয়োগ করতেই শব্দ করে সরে গেল। এবারে একটা লক দেখা যাচ্ছে সেখানে। আরো একবার চোখাচোখি হলো আমাদের।

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হলেও চেহারায় সেটা বুঝতে দিচ্ছি না। সায়াকার বাবার দেয়া সিংহের মাথা নকশার চাবিটা লকে প্রবেশ করালাম। এবারে সুন্দর মত ঢুকে গেল। ধীরে ধীরে মোচড় দিলাম একবার। কোনো শব্দ হলো না, তবে টের পেলাম ভেতরে কিছু একটা সরে গেছে।

চাবি ধরে টান দিলাম, কিন্তু খুলে এলো না। লকের ভেতরেই আটকে আছে। তবে দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে গেল। ভেতরে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে বেইজমেন্টে। নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চাবিটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে লক থেকে বের করে নিল সায়াকা। ওদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলো, "বাবার কাছে বেইজমেন্টে যাওয়ার চাবি কেন?"

"সেটাই জানার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল ও।

"ঠিক আছে।"

"ভেতরে চলো তাহলে?"

"অনুমতি না নিয়েই?"

"অনুমতি নেয়ার মত কাউকে দেখছ?" কৌতুকের সুরে বললাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে আমার কথা মেনে নিল ও।

"চলো।"

"দাঁড়াও।"

আমার হাত ধরে চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে রইলো কিছুক্ষণ। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

"সরি, আমার না ভয় লাগছে।"

"আমি একা গিয়ে দেখে আসব?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলে সায়াকা। "আমিও যাব তোমার সাথে। সমস্যাটা তো আমার। আমিই জবাব খুঁজতে এসেছি এখানে।"

গাড়ি থেকে টর্চ নিয়ে এলাম। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে পা রাখলাম সিঁড়িতে। ভেতরে বেশ ভালোই ঠাণ্ডা। ভ্যাপসা একটা গন্ধ এসে লাগলো নাকে। দীর্ঘদিন কোনো জায়গা বন্ধ থাকলে এরকম গন্ধ হয়। সেই সাথে ধুলো তো আছেই।

সিঁড়ির গোড়ায় অর্ধেকটা তাতামি ম্যাট পাতার মতন জায়গা[2]। একপাশে লোহার তৈরি দরজা। হাতলটা দেখতে ইংরজি 'এল' এর মতন। সামনের দিকে টর্চ ধরে হাতল ধরে চাপ দিলাম। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা।

ভেতরে ছোট একটা রুম। চারপাশে সিমেন্টের দেয়াল। সিলিং ভর্তি ঝুল। ছাতা পড়ে কালো হয়ে গেছে দেয়ালগুলো। কাঠের ভাঙা টুকরো আর ইট পড়ে আছে এখানে-সেখানে। হয়তো বাড়িটা তৈরির পর বেঁচে গেছিল এগুলো। দু'টো বিশ লিটারের কেরোসিনের ক্যানও চোখে পড়লো। হাত দিয়ে তুলে দেখলাম। একটা খালি, আরেকটায় এখনো কিছুটা রয়ে গেছে।

বাতি জ্বালানোর জন্যে সুইচ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম দেয়ালে কোনো সুইচবোর্ড নেই। সিলিং থেকে ঝুলছে না কোনো বাল্ব। সকেটেরও বালাই নেই।

"এই বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই সাথে করে টর্চ নিয়ে আসে," বললাম।

বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে ঘাড় একদিকে কাত করলো সায়াকা।

বেইজমেন্টের ভেতরের দিকে অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমে বসানো একটা স্লাইডিং ডোর। সেটার পেছনে আরেকটা ছোট রুম। রুমের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। বাড়ির ভেতর থেকে বেইজমেন্টে আসার জন্যে এই সিঁড়িটা ব্যবহৃত হতো নিশ্চয়ই। লম্বা সময় কেউ ব্যবহার করেনি, এটা নিশ্চিত। প্রতিটা ধাপে অন্তত ইঞ্চিখানেক ধুলোর প্রলেপ।

"কেউ আছেন?"

আমার কথা প্রতিধ্বনিত হলো সিঁড়ির ওপরে খোলা জায়গাটায়। কিন্তু কোনো জবাব এলো না।

"এটাই ভেবেছিলাম। কেউ নেই এখানে। খালি। চলো উপরে গিয়ে দেখি কী অবস্থা।"

সিঁড়িতে মাঝ বরাবর কার্পেট পাতা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জুতো খুলেই পা দিতাম হয়তো। কিন্তু এখন গায়ে মাখলাম না ব্যাপারটা।

"জুতো পরেই উঠবো?" দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সায়াকা।

"তুমি চাইলে খুলতে পারো। পরে মোজা কালো হয়ে গেলে আমার দোষ নেই।"

আরো কিছুক্ষণ দোটানায় ভোগার পর আমার মতন স্নিকার্স না খুলেই সিঁড়িতে পা দিল ও।

উপরে একটা ছোট করিডর। কিছুদূর এগিয়ে দুই ভাগ হয়ে গেছে ওটা। শেষের ঠিক আগে দুই পাশে দু'টো কাঠের দরজা। আর দেয়ালে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের একটা জানালা। পর্দা টাঙ্গানো বিধায় বেশ অন্ধকার। সিঁড়িটা দোতলায় উঠে গেছে।

পর্দা সরিয়ে জানালা খুলে দিলাম। রোদ ঢোকার জো নেই, তবে কিছুটা আলোকিত হলো ভেতরটা। দেয়ালে সবুজের উপর ফুলেল নকশার সুন্দর ওয়ালপেপারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জানালার ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালে ঝুলছে গোল বাধাই করা ফ্রেম। ভেতরে ফলমূলের ছবি।

বাম পাশের দরজার হাতল ধরে টান দিলাম আস্তে করে। মুখের ঠিক সামনে ঝুল থাকায় দেখতে পাচ্ছি না কিছু। একটু পিছিয়ে হাত দিয়ে ঝুলগুলো সরালাম। সরু একটা রুম, মাঝে সাদা প্যান। পশ্চিমা নকশার টয়লেটটা চিনতে অসুবিধে হলো না।

মুখে অস্বস্তির হাসি ফুটিয়ে সায়াকার দিকে তাকালাম। "প্রথম দরজা খুলেই টয়লেট।"

"প্রতি বাসাতেই টয়লেট আছে," আগের তুলনায় শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

পাশেই একটা সিঙ্ক দেখতে পেয়ে কলটা ঘুরালাম। কিন্তু নল দিয়ে পানি বেরুলো না।

"টয়লেটগুলো কাজ করছে বলে মনে হয় না।"

কপালে ভাঁজ পড়লো সায়াকার।

টয়লেটের দরজা বন্ধ করে এবারে অন্য দরজাটার দিকে হাত বাড়ালাম। হাতলে মোচড় দিয়ে এক দিকে ঘোরাতেই মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। শিরশিরে বাতাসের অস্তিত্ব টের পেলাম গালে। মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ দিন পর বাতাস ঢোকার সুযোগ পেল।

হলরুমে প্রবেশ করলাম আমরা। ডানদিকে বাড়ির প্রবেশপথ। উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, যার উপরের অংশে নকশাদার কাঁচ চোখে পড়লো। বাম পাশের দেয়ালের সামনে চারকোনা একটা টেবিলে দুই হাতলওয়ালা একটা পাত্র রাখা। উল্টোদিকে আরো একটা দরজা চোখে পড়লো। সেটার সামনেও একই রকম একটা টেবিল আর পাত্র সাজিয়ে রেখেছে বাড়ির মালিক।

"ভেতরে আসার দরজাটা খুলে দাও। তাহলে যাওয়া-আসা সহজ হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা।"

কার্পেটটা ডিঙ্গিয়ে গেল সায়াকা, ধুলোয় ওটার এমন অবস্থা যে আসল নকশার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যেখানে জুতো রাখতে হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল ও। প্রবেশপথের পাশের ও কেবিনেটটা খুলে ভেতরে উঁকি দিলাম এসময়। কেবল দুই জোড়া স্নিকার্স, এক জোড়া ছেলেদের কালো চামড়ার জুতা আর এক জোড়া মেয়েদের চামড়ার জুতো চোখে পড়লো। এত বড় একটা বাড়িতে মাত্র চার জোড়া জুতো দেখে একটু অদ্ভুতই লাগলো। আদৌ যদি এই বাড়িতে কেউ থাকে আর কি!

"একটু এদিকে আসবে-?" ডাক দিল সায়াকা।

"কোনো সমস্যা? চাবি কাজ করছে না?"

"না, লক তো খুলছে," বলে চাবিতে মোচড় দিল ও, ক্লিক শব্দটা শুনতে পেলাম আমিও। "কিন্তু দরজা খুলছে না।"

"হ্যাঁ? তাই নাকি?" বলে দরজার চারপাশে টর্চের আলো দিয়ে দেখতেই মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো আমার। "আরে, এটা কী!" দরজার চার কোনায় পুরু কাঠের টুকরা আর স্ক্রু দিয়ে আটকানো। খুলবে কী করে?"

"দরজা এভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?"

"বুঝতে পারছি না," বলে কোমরে হাত দিয়ে কাঠের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একদম শক্ত করে আটকানো হয়েছে, খোলা সহজ হবে না। "কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। এই বাড়িতে ঢোকার একমাত্র মাধ্যম ওই বেইজমেন্টের দরজা, যেটা দিয়ে আমরা ঢুকেছি। সিংহের মাথার নকশার চাবিটা সেজন্যেই দেয়া হয়েছিল।

"এত ঝামেলার দরকার কী ছিল?"

"হয়তো অযাচিত কেউ যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এভাবে তো সাধারণ কোনো পরিবার থাকতে পারে না কোথাও।"

বুকে হাত ভাঁজ করে কিছুক্ষণ ভাবলাম, কিন্তু কোনো যুক্তি মাথায় এলো না। এরকম বিহ্বল অবস্থাতেই জুতো রাখার কেবিনেটটার উপরে ঝোলানো ছবিটার

দিকে চোখ চলে গেল আপনাআপনি। সেখানে একটা ঘাটে কয়েকটা ইয়ট বাঁধা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এসময় হঠাৎই কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল মনে, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারছি না।

“অন্য রুমগুলো দেখবে না?” সায়াকার কথায় চিন্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। “হ্যাঁ, চলো দেখি।”

জুতো না খুলেই আবারো আগের হলরুমে ফিরে এলাম আমরা। কাঁচের দরজাটায় মৃদু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

এটাই খুব সম্ভবত লিভিং রুম। সিলিং বেশ উঁচু কারণ ঘরটা দোতলার সাথে যুক্ত। মাঝখানে একটা কফি টেবিল আর সোফা। একপাশে বড় একটা পিয়ানো দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে আর ডানদিকে কোনায় ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের চিমনিই খুব সম্ভবত একদম ছাদ অবধি পৌঁছে গেছে।

দরজার পাশের দেয়ালে তিনটা সুইচ। কিন্তু ওগুলো চাপাচাপি করেও কোনো লাভ হলো না। এমন যদি হয় দীর্ঘদিন ব্যবহার হবে না দেখে সার্কিট ব্রেকার খুলে রাখা হয়েছে, তাহলে সেটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু পানির লাইনের মতন এখানে যদি বিদ্যুৎ-এর সংযোগও না থাকে, সেক্ষেত্রে ঝামেলা হয়ে যাবে।

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে সামনে এগোলাম। গোটা জায়গাটা জুড়ে পশমি কার্পেটে পাতা। ঠাণ্ডার সময় ভালোই কাজে দেয় নিশ্চয়ই। বারবার মনে হচ্ছে কেউ বুঝি ঘাপটি মেরে আছে ছায়াতে।

“একটু বেশিই অন্ধকার, ভয় করছে আমার,” আমার হাত ধরে বলে সায়াকা।

“তাহলে জানালা খুলে দেই।”

বড় স্লাইডিং প্যানেলের জানালা দু’টো আগেই খেয়াল করেছি আমি জানালার ধরন দেখে ধারণা করলাম এই দিকটা দক্ষিণ। খুলে দিয়ে পর্দাগুলো সরালাম। ভেবেছিলাম আলোয় ভরে উঠবে গোটা ঘর। কিন্তু খুব একটা উজ্জ্বল হলো না ভেতরটা। আকাশে কখন যে এত মেঘ জমেছে, টের পাইনি। এসময় মনে পড়লো আসার আগে সায়াকা বলেছিল, রাতে বৃষ্টি হতে পারে।

তবে এখন আর টর্চ জ্বালিয়ে রাখার দরকার পড়ছে না। আবারো রুমটা দেখলাম একবার। টেবিল থেকে শুরু করে পিয়ানো, সবকিছুতে ধুলো। পিয়ানোর উপরে একটা ফ্রেঞ্চ ডল রাখা। পরনে লাল জামা-কাপড় ওটার। চুলগুলো লম্বা। বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পুতুলটার চুল আর ছোট্ট কাঁধজোড়াও ধুলোয় ঢাকা। সাদাটে দেখাচ্ছে ওগুলো।

আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে কেবল দু’জোড়া পায়ের ছাপ চোখে পড়লো গোটা ঘর জুড়ে। অর্থাৎ, লম্বা একটা সময় ধরে এখানে আমরা বাদে আর কেউ আসেনি।

দরজার উপরে একটা ঘড়ি, যেখানে সময় দেখাচ্ছে এগারোটা দশ। ব্যাটারির আয়ু নিশ্চয়ই অনেক আগেই ফুরিয়েছে ওটার। আমার ঘড়ি অনুযায়ী এখন সময় একটা পাঁচ।

পিয়ানোটার দিকে এগিয়ে গেল সায়াকা। উপরে স্ট্যান্ডে রাখা স্বরলিপির কাগজটা দেখলো কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে। ওখানেও প্রচুর ধুলো।

"বেয়ারের প্র্যাকটিস শিট।"

আমার এটুকু জানা আছে যে নতুন যারা পিয়ানো শেখে, তারা বেয়ারের স্বরলিপি অনুসরণ করে।

"অর্থাৎ, এখানে যে পরিবার থাকতো, তাদের কেউ পিয়ানো শিখছে। নাকি 'শিখত' বলবো?"

গম্ভীর মুখে পাতাগুলো উল্টে চলেছে সায়াকা। যে পাতাটা খোলা, সেটা বাদে বাকি পাতাগুলো একদম নতুনের মতন সাদা। তবে কোনার দিকগুলো হলদে হয়ে গেছে।

"কী অদ্ভুত একটা বাড়ি!" বলি আমি। "লম্বা একটা সময় ধরে কেউ আসেনি এখানে, কিন্তু কারো ছুটি কাটানোর ঠিকানা বলেও মনে হচ্ছে না এখন।"

সায়াকা কিছু বললো না, এখনো স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে আছে ও। "কোনো সমস্যা?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

জবাব দিল না সায়াকা। চুপ থেকেই কপালে হাত রাখল, যেন মাথাব্যথা করছে।

আর কথা বাড়ালাম না। ওকে এভাবে দেখে চিন্তা হচ্ছে। এখানে আসাটা কি আসলেও উচিত হয়েছে আমাদের?

একটু পরে স্বরলিপিটা নামিয়ে রাখল ও। দেখে মনে হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

"সায়াকা-"

"সরি," অন্য দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলে ও। "ভেবেছিলাম কিছু একটা মনে পড়বে বুঝি। ভুল ভেবেছি আসলে। তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম বোধহয়।"

"ব্যাপার না। এখনো অনেক সময় আছে আমাদের হাতে।"

"তা আছে। কিন্তু তোমার কি মনে হয়, এই পোড়োবাড়িতে আদৌ কোনো সূত্র আছে? থাকলেও কি খুঁজে পাব আমরা? তোমাকে এত দূর টেনে এনেছি, জানি এসব বলা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু..."

"আমি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি। জানতাম সহজ হবে না কাজটা," বলে ওর মাথার দিকে ইঙ্গিত করলাম। "আমরা যে তালা খোলার চেষ্টা করছি, সেটা তো প্রায় বিশ বছর ধরে বন্ধ।"

কপালে হাত রেখে মৃদু হাসলো সায়াকা। "আশা করি মরচে ধরে যায়নি।"

আনমনা দৃষ্টিতে তাকালাম পিয়ানোর দিকে। কিন্তু পুতুলটার সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্র চমকে উঠলাম ভেতর থেকে।

৫

দরজা খুলে পাশের ঘরটায় প্রবেশ করলাম আমরা। সামনে এক মিটার দৈর্ঘ্যের ছোট একটা করিডোর পার হয়েই ডাইনিং রুম। করিডোরের অপর প্রান্তে গোল একটা টেবিল। চারজন বসে অনায়াসে খেতে পারবে ওটায়। টেবিলের মাঝে একটা ছোট্ট টব। সবুজ গাছটা যে কৃত্রিম তা বলে দিতে হবে না।

দেয়াল ঘেঁষে ইংরেজি এল আকৃতির একটা কিচেন কাউন্টার। সিঙ্কে দু'টো কাপ আর দু'টো পিরিচ চোখে পড়লো। দৃশ্যটা দেখে মনে হচ্ছে, সময় হুট করেই স্থির হয়ে গেছে বুঝি।

সিঙ্কের পাশে একটা পুরোনো আমলের দুই দরজার রেফ্রিজারেটর, এরপর একটা কাবার্ড। ভেতরের তাকে বেশ কয়েকটা ছোট বড় প্লেট, গ্লাস, কাপ আর বাটি সাজিয়ে রাখা। ড্রয়ারগুলোও খুলে ভেতরে উকি দিলাম আমি। ছুরি এবং কাটাচামচ পাশাপাশি সাজানো। মৃদু আলোয় চকচক করে উঠলো ওগুলো।

টেবিল থেকে একটু দূরে একটা ম্যাগাজিন র‍্যাকে বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন রাখা। ওপর থেকে একটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টালাম। ভেতরে নানারকম মডেলের রেল ইঞ্জিনের ছবি। বেশিরভাগই বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। তারিখ দেখে নিশ্চিত হলাম, বিশ বছরের পুরোনো পত্রিকাটা।

"এত পুরোনো পত্রিকা এখানে কী করছে!" বললাম। বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে একদিকে মাথা কাত করলো সায়াকা।

একদম শেষ পাতায় উল্টে ছোট করে পেন্সিল দিয়ে লেখা ৫০০ ইয়েন। এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

"নিশ্চয়ই পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা। রেল ইঞ্জিন নিয়ে আগ্রহী কেউ থাকে নিশ্চয়ই এখানে," বলে পত্রিকাটা রেখে দিলাম র‍্যাকে। "তবুও কেমন যেন অদ্ভুত।"

"কী?"

"ডাইনিং রুমে এরকম পত্রিকা থাকবে কেন?"

জবাবে বলার মতন কিছু খুঁজে পেলাম না প্রথমে। "ইচ্ছে হয়েছে, রেখেছে," একটু পর বললাম।

সায়াকা কথা বাড়ালো না।

রান্নাঘরের উল্টোদিকে একটা স্লাইডিং দরজা। ভেতরে ছয় তাতামি ম্যাটের জাপানিজ নকশার একটা ঘর। একপাশের দেয়ালে একটা কুলুঙ্গি। দেয়ালে ঝোলানো স্কুলটায় ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং। তবে সেটা মূল্যবান কিছু কিনা, তা বলতে পারব না। ঘরের মাঝে একটা ছোট কফি টেবিল।

তাতামি ম্যাটের ওপরে জুতো পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই বিধায় ওগুলো স্লাইডিং দরজার সামনে খুলে রাখলাম। ম্যাটগুলো বেশ ঠাণ্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে। তবে ছাতা পড়েনি।

প্রথমেই জানালাগুলো খুলে দিলাম আমরা। এখন আর একতলায় টর্চ জ্বালানোর দরকার নেই।

নিচু টেবিলটায় টেবিলক্লথের উপরে একটা সিগারেটের কেস আর ধাতব অ্যাশট্রে রাখা। কেসটা খুলে দেখলাম ভেতরে এখনো দশটা সিগারেট রয়ে গেছে। ব্র্যান্ডের নাম মাইন।

"মাইন সিগারেট এখনো পাওয়া যায় নাকি?"

একটা বের করে নাকের কাছে নিয়ে শুকলাম। তামাকের কোনো গন্ধই আর অবশিষ্ট নেই।

"এদিকে এসো একটু," সায়াকা রান্নাঘর থেকে বললো এসময়।

"কী হয়েছে?"

রুমটা থেকে বেরিয়ে আবারো জুতো পরে নিলাম।

"এটা দেখো," বলে লিভিংরুমে যাওয়ার দরজাটার উপরে একটা সাধারণ দর্শন আটকোনা ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো ও। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না আমার।

"ঘড়িটায় কোনো সমস্যা?"

"একটু অদ্ভুত না ব্যাপারটা?" বললো সায়াকা। "লিভিং রুমের ঘড়িটার মতন এটাতেও সময় দেখাচ্ছে এগারোটা দশ।"

দরজা খুলে লিভিং রুমে উঁকি দিয়ে ওখানকার ঘড়িটা দেখলাম আরেকবার। সায়াকা ঠিকই বলেছে।

"এমনটা আগে দেখেছ কখনো? দু'টো ঘড়ি একদম ঠিক একই সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব।"

"একদম অসম্ভব না। তবে মিনিটের কাটাগুলোর অবস্থানও যেহেতু মিলে গেছে, তাই এর সম্ভাবনা সাতশ বিশবারে একবার।" বারোকে ষাট দিয়ে গুণ করে বললাম কথাটা। "তবে কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে কাজটা করেছে ধরে নেয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত।"

"এই সময়ের কি কোনো বিশেষত্ব আছে?"

"সেটাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে যদি আসলেই কেউ থেকে থাকে, তাহলে দু'টো ঘড়িরই স্বাভাবিক সময় দেখানোর কথা।"

দু'টো ঘড়িই ব্যাটারি চালিত। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় আগের বাসিন্দাদের কেউ নিশ্চয়ই ব্যাটারি খুলে নিয়ে গেছে। এরপর পেছনের নব ঘুরিয়ে ঘড়ির সময় এগারোটা দশ করেছে খুব সম্ভবত...

কিন্তু বিষয়টা নিয়ে ভাবলে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। কেন, সেটা বলতে পারব না। কিছু একটা বুঝতে পারছি না, এজন্যেই বোধহয় এই অস্থিরতা। "বাদ দাও। দোতলায় যাই চলো," সায়াকাকে বললাম। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

লিভিং রুম থেকে করিডোরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির কাছে ফিরে এলাম। এবারে সিঁড়ির পাশে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বক্সটা চোখে পড়লো। বিদ্যুৎ ফিরে পাব, এই আশায় সার্কিট ব্রেকারের হাতলটা উঠিয়ে দিলাম উপরে, কিন্তু কিছুই ঘটলো না। বিদ্যুতের চিহ্নমাত্র নেই।

"ধুর," লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলি। "ইচ্ছে করেই এভাবে ফেলে রেখে গেছে বাড়িটা।"

"ফিরে আসার আর কোনো ইচ্ছে নেই হয়তো।"

"আমারও সেটাই ধারণা। কোনো পানির সরবরাহও নেই।"

টর্চ জ্বালিয়ে উপরতলায় উঠে গেলাম। বামদিকে একটা দরজা আর ডানে সরু একটা করিডোর। সমুদ্রের তলদেশের মতন নিস্তব্ধ চারপাশ।

বাম দিকের দরজাটা খুললাম প্রথমে। ভেবেছিলাম ভেতরে হয়তো ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে। কিন্তু কোত্থেকে যেন আলো আসছে। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম উৎস। ঠিক উল্টোদিকেই একটা জানালা। লিভিং রুমটা দেখা যায় এখান থেকে। জানালার ঠিক নিচেই গোল দেয়াল ঘড়িটা।

প্রায় পাঁচটা তাতামি ম্যাট সমান চওড়া ভেতরটা। জানালার সামনে বিছানা আর বইয়ের তাকের মাঝে একটা পড়ার টেবিল। বিছানায় নীল সবুজ চেকের চাদর পাতা। শ্বাস টানতেই দীর্ঘদিনের বদ্ধ বাতাস ঢুকে গেল ফুসফুসে। কেমন ছাতা পড়া গন্ধ।

"দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো বাচ্চার রুম," বিছানার দৈর্ঘ্য দেখে আন্দাজ করলাম।

"হ্যাঁ, ছেলে বাচ্চা," সায়াকা বলে।

"ছেলে? এটা কেন মনে হলো?"

"দেখ," টেবিলের পাশে ঝোলানো একটা ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করলো ও। "কালো ব্যাগ ছেলেরাই ব্যবহার করে সাধারণত।"

"তা ঠিক," মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। "আর যেহেতু স্কুলব্যাগ আছে, সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি বাসাটা শুধু ছুটি কাটানোর কাজে ব্যবহৃত হতো না। লোকে থাকত।"

"এরপর হঠাৎ অন্য কোথাও চলে গেছে?"

"আপাতত তো সেরকমই মনে হচ্ছে।"

রুমটায় যে একটা ছেলে বাচ্চা থাকতো, তার অনেক আলামত পেলাম আমরা। বিছানার নিচে বেজবল গ্লোভস, টেবিলে নরম প্লাস্টিকের ডায়নোসর। গ্লোভসটায় ধুলোর আস্তর, খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বইয়ের তাকটায় রেল ইঞ্জিন নিয়ে অনেকগুলো পত্রিকা রাখা। নিচতলায় আমরা যে পত্রিকাটা দেখেছি, সেটা এখান থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। এসব পত্রিকা বাদেও অনেকগুলো এনসাইক্লোপিডিয়াও চোখে পড়লো। গুণে দেখলাম আমি, মোট চব্বিশ খণ্ড। এছাড়াও বিশটার মতন বাচ্চাদের গল্পের

বই। সবগুলোই ক্লাসিক, হার্ডকভার। বাকিগুলো প্রাইমারি স্কুলের ষষ্ঠ বর্ষের পাঠ্যবই, ছবির বই আর ফটো অ্যালবাম। একটাও মাঙ্গা চোখে পড়লো না।

"ছেলেটা নিশ্চয়ই সিক্সথ গ্রেডে পড়তো। তাকের বইগুলো দেখে মনে হচ্ছে ছাত্রও ভালো ছিল।"

"হ্যাঁ, ভালো ছাত্রই হবে," টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলে সায়াকা।

একটা খোলা বই আর খাতা দেখা যাচ্ছে সেখানে। খাতার উপরে চোখা পেন্সিল আর রাবার। পাশেই প্লাস্টিকের পেন্সিল বক্স।

"পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল।"

"আর সেই ব্যস্ততার মধ্যেই হঠাৎ করে চলে যেতে হয়েছে। আর কখনো ফিরে আসেনি?"

"জানি না। সেটাই তো মনে হচ্ছে।'

নিচের এঁটো কফির কাপগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সময় যেন হঠাৎ থমকে গেছে বাসাটার ভেতরে।

"কেমন অদ্ভুত না ব্যাপারটা?" সায়াকাকে দেখে মনে হচ্ছে একটু ভয় পাচ্ছে বেচারা। "বাড়ি ছেড়ে যায় অনেকেই, কিন্তু এভাবে হুট করে কাজের মাঝখানে..."

"হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যে জন্যে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। সাথে করে কিছু নিতেও পারেনি। "

"তাড়াহুড়ো করে বের হলেও কি স্কুলের ব্যাগ আর বইপত্র সাথে নেয়া যায় না? আবার ধরো মাঝে মাঝে নানা কারণে বাচ্চাদের কিছুদিন স্কুল কামাই দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু বাবা-মায়েরা সবকিছু ঠিকই সাথে নেয়, যেন পড়াশোনায় কোনো ক্ষতি না হয়। অনেক সময় ব্যাংক বা লোন ক্রেডিট কোম্পানিগুলোকে পাওনা টাকা দেয়ার সময় হলে পালিয়ে যায় অনেকে। আমার এক বন্ধু চাকরি করে একটা ক্রেডিট কোম্পানিতে। ওর কাছ থেকে শুনেছি।"

"হ্যাঁ, এটাও কিন্তু হতে পারে।"

চেয়ারটা সরিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললাম। ভেতরে পড়াশোনার নানান জিনিসপত্র। কম্পাস, চাদা, ত্রিভুজ। অন্য দু'টো ড্রয়ারে নতুন খাতা আর রঙ করার সরঞ্জাম।

টেবিলে খুলে রাখা পাঠ্যবইটা দেখতে লাগল সায়াকা। গণিত বই প্রচ্ছদের নানারকম জ্যামিতিক নকশা।

"আরে!" প্রচ্ছদের পেছন ভাগটা দেখে আচমকা বলে উঠলো সায়াকা। প্রকাশের তারিখ লেখা আছে ওখানটায়। আমাকে দেখাল ও।

কেন অবাক হয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। বইটা তেইশ বছরের পুরোনো।

চুপচাপ একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। জানালার ফ্রেমটা প্রতিফলিত হচ্ছে ওর চোখে।

"অসম্ভব," বলি আমি। "এই বাড়িটা যদি আসলেও তেইশ বছরের পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে আরো খারাপ হবার কথা অবস্থা। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে খুব হলে দুই কি তিন বছর ধরে খালি পড়ে আছে।"

"কিন্তু এই ঘরে যে থাকতো সে তেইশ বছর আগে চলে গেছে এখান থেকে।"

"শুধু একটা বইয়ের প্রকাশকাল দেখে সেটা নিশ্চিত হয়ে বলা সম্ভব নয়।"

বইটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দেখে খাতার দিকে হাত বাড়ালাম। পেন্সিলটা সরিয়ে রাখলাম এক পাশে। ওটা যেখানে ছিল সেখানে কোনো ধুলো নেই।

খোলা পাতাটায় পেন্সিলে লেখা '*ওখানে যদি শুধু হরিণ থাকে, তাহলে পায়ের সংখ্যা হবে ২৬*৪=১০৪। কিন্তু জুতোর সংখ্যা যেহেতু ৮৪ টা, তাহলে বাড়তি জুতো ১০৪-৮৪=২০ টা। তাহলে বানরের সংখ্যা ২০:২=১০ টা।"* সেই নামকরা বক আর কচ্ছপের সমস্যা। কিন্তু এখানে মুরগি আর খরগোশের জায়গায় বানর আর হরিণ ব্যবহার করা হয়েছে।

আগের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে বুঝলাম সবগুলো সমস্যারই ঠিক ঠিক সমাধান করা হয়েছে। হাতের লেখা খুব সুন্দর না হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কোনো বানান ভুলও নেই। এই রুমে যে বাচ্চাটা থাকতো, আসলেও লক্ষ্মী ছিল সে।

সব শেষে খাতার কভারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

গণিত, ষষ্ঠ গ্রেড, শাখা ১. ইউসুকে মিকুরিয়া।

সায়াকার দিকে তাকিয়ে দেখি সে-ও নামটাই দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

"এই নামটা মনে আছে তোমার?" জিজ্ঞেস করি।

"মিকুরিয়া ইউসুকে," বানান করে পড়ে ও। এরপর চোখ মুদে কিছুক্ষণের জন্যে, যেন মনে করার চেষ্টা করছে।

"শুনেছ নাকি নাম-"

"একটু চুপ করবে? সরি, এভাবে বলছি," বলে সায়াকা। মুখ বন্ধ করে ফেললাম আমি

দুই কি তিন মিনিট পর লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায় ও।

"নাহ, এখনও মনে পড়ছে না।"

"পরিচিত মনে হচ্ছে কি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ভুলও হতে পারে। অন্য নামের সাথে গুলিয়ে ফেলছি বোধহয়," ভ্রু কুঁচকে দুই হাতে কপাল চেপে ধরলো সায়াকা।

"তোমার বাবাকে কখনো নামটা বলতে শুনেছ?"

"হ্যাঁ, হয়তো। কিন্তু... পরিষ্কার মনে পড়ছে না," অস্থির ভঙ্গিতে চুলে একবার হাত বুলায় ও।

“বাদ দাও,” ওর কাঁধে হাত রাখলাম। “অন্তত এখন আমরা এটা জানি, মিকুরিয়া পরিবার বসবাস করতো এখানে। অন্য ঘরগুলো দেখি চলো।”

“আচ্ছা।”

খাতা আর বইটা ওখানেই রেখে বেরিয়ে এলাম আমরা।

করিডোর ধরে সামনে এগোলে শেষ মাথায় একটা দরজা। সেখানেও একই রকম ভ্যাপসা গন্ধ। জানালা বন্ধ থাকলেও পুরোপুরি অন্ধকার নয় ভেতরে। কারণ একতলার জানালাগুলোর মতন এই তলায় জানালার বাইরেও কোনো শাটার নেই। শুধু পাতলা পর্দা চোখে পড়লো। টর্চের আলোয় চোখ বুলাতে লাগলাম রুমটার ভেতরে। প্রথমেই নজরে এলো দেয়ালে ঝোলানো একটা স্যুট। আবছা আলোয় মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমার পাশে সায়াকারও একই অবস্থা।

একটা রকিং চেয়ার আছে ঘরটায়। দেয়ালের সামনে দু'টো বিছানা পাশাপাশি রাখা। জানালার কাছেই একটা ধুলোমাখা টেলিস্কোপ। দেয়ালের দাগগুলো দেখে অস্বস্তি হচ্ছে। সময়ের সাথে যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে ভেতরের সবকিছু, এমনটাই মনে হলো আমার। যে বাসায় বাচ্চা একটা ছেলে থাকে, তার বাবা-মা থাকে, সেখানটা এরকম নিষ্প্রাণ হবার কথা না।

“দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটার বাবা-মা'র ঘর,” সায়াকা বললো পেছন থেকে।

“তাহলে তিনজনের একটা পরিবার।” ভেতরে ঢুকে পর্দা সরিয়ে জানালা খুলে দিলাম। ধুলো উড়িয়ে আর্দ্র বাতাস ঢুকে পড়লো ভেতরে।

রকিং চেয়ারটার কাছে এসে ওটার উপর থেকে কিছু একটা উঠালো সায়াকা। দেখে মনে হচ্ছে পুরোনো ন্যাকড়া, কিন্তু আদতে তা নয়। একটা সুতো বেরিয়ে আছে ওটা থেকে। মেঝেতে পড়ে থাকা উলের বলের মধ্যে গিয়ে মিলেছে সুতোটা। ধূসর-নীল দেখাচ্ছে এখন, কিন্তু আসল রঙ বোধহয় নীলই ছিল।

“কেউ কি স্কার্ফ বুনছিল নাকি?”

“না, আমার মনে হচ্ছে এটা একটা সোয়েটার,” সায়াকা আমাকে দেখিয়ে বলে। “এই জায়গাটা গোল, দেখো। নেক লাইনের মতন।”

“অনেক ছোট।”

“বাচ্চাদের জন্যে, বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলার ছেলের জন্যে বানাচ্ছিল।”

“ইউসুকে?”

“তাই হবে হয়তো,” সাবধানে জিনিসটা আবারো চেয়ারের উপর নামিয়ে রাখলো সায়াকা। “এটা বোনার মাঝেই কি চলে যেতে হয়েছিল ইউসুকের মা'কে?”

“হয়তো।”

সায়াকার হাতের ছোঁয়ায় দুলতে লাগল চেয়ারটা। এই বাড়িটায় ঢোকার পর থেকে এই প্রথম কিছু দুলতে দেখলাম।

আবারও নজর বুলালাম চারপাশে। একটা বুকশেলফ আছে ভেতরে, কিন্তু খুব বেশি বই নেই ওটায়। ছেলের তুলনায় বাবা-মা'র পড়ার অভ্যাস তেমন ছিল না বোধহয়, ভাবি আমি। সামনে এগিয়ে বইয়ের নামগুলো দেখে অবাকই হলাম কিছুটা। জাপানের সংবিধানের বইয়ের পাশাপাশি আইনের বইও আছে বেশ কয়েকটা। বাড়ির কর্তা তাহলে আইনজীবি? সেক্ষেত্রে বইয়ের সংখ্যা বেশি কম হয়ে গেল।

"কেমন যেন সবকিছু," বলি আমি। "কিছু চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে এখানে মানুষ থাকতো এক সময়। কিন্তু জরুরি কী যেন একটা নেই; বলে বোঝাতে পারছি না বোধহয়। কোনো একটা ঘাপলা আছে।"

"আমারও এরকমই মনে হচ্ছে," বলে সামনে দেয়াল ঘেঁষে রাখা ছোট টেবিলটার দিকে গেল সায়াকা। দু'টো বুকেন্ডের মাঝে ঠেস দিয়ে পেশাগত কিছু বই রাখা। সেগুলোতে হাত না দিয়ে প্রথম ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে আনলো সায়াকা।

"কী ওটা?"

"চশমা।" একটা রুপালি ফ্রেমের চশমা আমাকে দেখালো ও। কাঁচগুলো দেখে ভ্রু কুঁচকে গেছে ওর।

"দেখে মনে হচ্ছে রিডিং গ্লাস।"

"হ্যাঁ?"

সামনে এগিয়ে চশমাটা হাতে নিলাম। আসলেও একদিকে বাঁকানো কাঁচগুলো। কনভেক্স লেন্স বলে একে। সাধারণত বয়স্ক মানুষেরা ব্যবহার করে এই ধরনের চশমা। অবশ্য এমনটাও খুবই সম্ভব যে ইউসুকের বাবা বা মা'র কারো হয়তো চোখে সমস্যা ছিল। কিংবা ইউসুকে হয়তো কোনো বয়স্ক দম্পতির একমাত্র সন্তান, একটু দেরি করে বাচ্চা নিয়েছে যারা।

"কোনো তথ্য জানা যাবে, এমন কিছু নেই?" ড্রয়ারটা দেখিয়ে বললাম।

"এটা আছে..." ভেতর থেকে গোল একটা জিনিস বের করে আনলো সায়াকা। একপাশ থেকে চেইন ঝুলছে।

দেখামাত্র চিনতে পারলাম আমি।

"আরে, এটা তো একটা পকেট ওয়াচ। এখন আর দেখাই যায় না এই জিনিস।"

"একটা ঢাকনা আছে উপরে। কীভাবে খোলে... ওহ এভাবে।" পাশের ধাতব বোতমটায় চাপ দিতেই ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল ঢাকনাটা। হালকা ধুলো উড়তে লাগলো চারপাশে। একদিকে মুখ সরিয়ে নিল সায়াকা। কিন্তু ঘড়ির ডায়ালটার দিকে তাকাতেই জমে গেল। চোখের পলকও পড়ছে না।

"কী হলো?" জিজ্ঞেস করি।

জবাবে ধীরে ধীরে ঘড়ির ডায়ালটা আমার দিকে ঘোরায় ও। সাদা ডায়ালে সংখ্যাগুলো রোমান হরফে লেখা। ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেন্ডের কাটা তিনটা

থেমে আছে।

বন্ধ অবস্থায় ঘড়িটায় সময় দেখাচ্ছে এগারোটা দশ।

৬

ক্যাফেটার বাইরে বড় একটা পাইন গাছ। নাহলে মাতসুবারা হ্রদের সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা যেত ভেতর থেকে। গাছের ফাঁক দিয়ে একটু পর পর রাজহাঁসের আদলে তৈরি প্যাডেল নৌকা ভেসে যেতে দেখছি। সপ্তাহান্ত তুলনায় পর্যটকের সংখ্যা কমই বলা যায়। তবে সেটা অফ সিজনের কারণে নাকি আজকের খারাপ আবহাওয়ার কারণে, তা বলতে পারব না। অথবা এমনটাও হতে পারে, এটাই এখানকার স্বাভাবিক চিত্র। কাউন্টারের পেছনে যে ভদ্রমহিলা বসে আছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে না খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ভেতরে দশজন বসা যায়। এই মুহূর্তে আমরা বাদে অল্পবয়সি এক জুটি আর ছোট একটা পরিবার আছে কেবল।

দুপুরের খাবারের সময় হয়ে যাওয়ায় রেস্তোরাঁর খোঁজে বাড়িটা থেকে বের হই আমরা। একটা সময় নিজেদের এই হ্রদের পাড়ে আবিষ্কার করি।

“যা বলছিলাম...” তোনকাতসু কারি রাইস শেষ করে কফির কাপে এক চুমুক দিয়ে বললাম। “বাড়িটার ব্যাপারে এখন অবধি কী কী জেনেছি আমরা?”

“ইউসুকে মিকুরিয়া আর তার পরিবার থাকতো ওখানে। এরপর একদিন হুট করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় পুরো পরিবার। আপাতত এটুকুই জেনেছি আমরা,” ওর সামনের শ্রিম্প রিজোটোর তিনভাগের এক ভাগও খাওয়া হয়নি। দুধ চা’টা তাও আধকাপ খেয়েছে।

“না, আরো কিছু তথ্য আছে আমাদের কাছে। এক, তোমার বাবার কাছে বাড়িটার বেইজমেন্টে ঢোকার চাবি ছিল। দুই, এই পরিবারের কাছে এগারোটা দশ মিনিটের কোনো গুরুত্ব আছে।”

“আর ইউসুকের মা ভালো উল বুনতেন। ওর বাবার কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হতো আর পেশায় খুব সম্ভবত আইনজীবি ছিলেন।”

“ঠিক বলেছ,” মাথা নেড়ে বলি আমি। “আবার এমনটাও হতে পারে যে ওর বাবা সেলাই করতেন আর মা আইনজীবি ছিলেন।”

লম্বা শ্বাস ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকায় সায়াকা। “কেমন যেন জট পাকানো সব। এই বাসায় বাবা নিশ্চয়ই আসত প্রায় প্রায়ই। কিন্তু কী করতো এসে?”

“আর বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে না যে কেবল ছুটি কাটানোর জন্যে আসত কেউ।”

ক্যাফের মাঝবয়সি মালিক নিজেই এলো আমাদের এঁটো প্লেট নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সেই সুযোগে গ্লাসে পানিও ঢেলে দিল সে। তার পরনে একটা জিন্স আর পোলো শার্ট। কিন্তু চোখের ত্রিভুজাকৃতির চশমাটা দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস সে। “আপনি কি এদিকেই কোথাও থাকেন?

“হঠাৎই জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি? হ্যাঁ,” কাউন্টার টেবিলটা মুছতে মুছতে বললো সে।

তাকে বাড়িটার ব্যাপারে বলে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু জানে কিনা। কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হলো এরকম একটা বাড়ি যে আছে, সেটাই জানে না।

"ওটা কি হাউজিং এস্টেটটার ওখানে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না, তার চেয়ে একটু সামনে। বাম দিকের যে চিকন রাস্তাটা চলে গেছে, সেটার শেষ মাথায়।"

মাথা নিচু করে আবার কাউন্টারের পেছনে চলে গেল সে। রান্নাঘরের দরজা খুলে আমার প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করলো ভেতরের কারো উদ্দেশ্যে।

একটু পরেই ছোট করে ছাটা চুলের একজন লোক বেরিয়ে এলো। কাপড়ের ওপর একটা অ্যাপ্রন চাপিয়েছে সে। নিশ্চয়ই এই ক্যাফের বাবুর্চি।

"সাদা বাড়িটার কথা বলছেন? একদিকে চিমনি যে?" আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলি। "কিছু জানেন বাড়িটার ব্যাপারে?"

"তেমন কিছু না। শুধু এটুকু জানি যে ওদিকে ওরকম একটা বাড়ি আছে।"

"ওটার মালিক কে, তা জানেন?"

"না, এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই," মাথা ঝাঁকায় সে। "বন্ধুদের সাথে আলাপের সময় মাঝে মাঝে বাড়িটা নিয়ে কথা ওঠে। ওরকম একটা বাড়িতে কেমন পরিবার থাকতে পারে, এসব আলোচনা আর কি। লম্বা সময় ধরেই বাড়িটা দেখছি আমরা, কিন্তু কাউকে থাকতে দেখিনি। নানারকম গুজবও শুনেছি। কেউ কেউ বলে ওখানে একটা পরিবার থাকতো, এরপর কোনো এক অসুখে সবাই একসাথে মারা যায়। অন্যেরা বলে কোনো বড়লোক ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্যে বাড়িটা বানিয়ে ফেলে রেখেছে। কিন্তু এসব গুজব একটাও সত্য নয়।"

"কতদিন আগে বানানো হয়েছে বাড়িটা?"

"কত দিন আগে..." বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রাখে সে। "অন্তত গত দশ বছরে যে বানানো হয়নি, এই বিষয়ে নিশ্চিত আমি। আরো আগে হবে। তবে বিশ বছরের বেশি পুরোনো বলে মনে হয় না।"

"তাহলে আপনি বলছেন ওখানে কখনো কাউকে থাকতে দেখেননি?"

"না। এটাই তো অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে। অবশ্য, এই এলাকায় এরকম অনেক বাড়ি আছে। যেমন, ওখান থেকে একটু সামনে এগোলেই একটা পরিত্যক্ত নার্সিং হোম দেখতে পাবেন। যে কোম্পানি চালাত ওটা, তারা দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় ওভাবেই পড়ে আছে। শুধু বাড়িই নয়, সুইমিং পুল আর টেনিস কোর্টও লম্বা সময় ধরে পড়ে থাকতে দেখবেন।"

ক্যাফে মালিকের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল লোকটা, এরপর আমাদের দিকে ফিরে জানতে চাইল, "বাড়িটার ব্যাপারে আগ্রহী কেন আপনারা?"

"বাড়িটার ব্যাপারে না। আসলে আমরা এই এলাকায় একটা ভূতাত্ত্বিক জরিপ করতে চাই। বাড়িটার মালিকের সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো।"

"ভূতাত্ত্বিক জরিপ?"

"আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই।"

মানিব্যাগ থেকে কার্ড বের করে দেখালাম তাকে। ওখানে লেখা 'ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স, ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স'। তবে সে কিছু সন্দেহ করলো বলে মনে হয় না।

"সেক্ষেত্রে আপনি নির্দ্বিধায় কাজ করতে পারেন। কেউ কিছু বলবে না।"

"আচ্ছা। তাহলে সেটাই করবো।"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা," এই কথাটা মাথা নেড়ে কয়েকবার বললো লোকটা।

জিজ্ঞেস করার মতন আর কোনো প্রশ্ন নেই। কফিও শেষ। মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে বিল দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তের লোকটার কিছু একটা মনে পড়ে গেল খুব সম্ভবত। বললো "ওহ হ্যাঁ, একবার ওখানে নাকি এক লোককে দেখেছিল আমার পরিচিত একজন।"

"তাই? কবে?"

"চার কি পাঁচ বছর আগে। তখন একটা সুশি রেস্তোরাঁয় চাকরি করতাম আমি। ডেলিভারি ম্যান ভুল দিকে মোড় নিয়ে ওখানে চলে গেছিল। তখনই বাসার সামনে একজনকে দেখতে পায়।"

"কেমন লোক, বলতে পারবেন?"

"খুব সম্ভবত বয়স্ক কেউ।"

"বয়স্ক কেউ? আচ্ছা। কিন্তু বাড়ির সামনে দেখা গেছে বলেই যে সে বাড়ির মালিক, তা তো নয় নিশ্চয়ই?"

"বলা যায় না। কিন্তু সেই ডেলিভারি ম্যান বলেছিল লোকটাকে ঝাড়ু দিতে দেখেছে।"

"উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিল?"

"হ্যাঁ, একটা ঝাড়ু হাতে।"

এই সময়ে সায়াকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আপনার পরিচিত এই ভদ্রলোকের সাথে কি দেখা করা যাবে?"

ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে বোধহয় ভড়কে গেল লোকটা। "ও আর কি এসব ছোটখাটো চাকরি করতো তখন। এখন আর এখানে থাকে না।"

"আচ্ছা..." বলে আমার দিকে তাকায় সায়াকা। ওর মাথায় কী ঘুরছে, তা বুঝতে সমস্যা হলো না।

ক্যাফে মালিক আর লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিল পরিশোধ করে দিলাম।

"নিশ্চয়ই আমার বাবাকেই দেখেছে," ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ফিরে আসা মাত্র বললো সায়াকা।

"আমারও সেটাই মনে হয়। আরেকটা রহস্যের সমাধান হলো।"

"কী রহস্য?"

“বাড়িটার ওরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার রহস্য। হ্যাঁ, আমরা অনেক ধুলো দেখেছি ভেতরে, কিন্তু আসলেও যদি তেইশ বছর ধরে খালি পড়ে থাকতো, তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবার কথা।”

“তুমি তাহলে বলতে চাইছ বাড়িটা পরিষ্কার করার জন্যেই নিয়মিত এখানে আসত বাবা?”

“হয়তো অন্য কোনো কাজও ছিল তার। সেই সুযোগে সব পরিষ্কার করতেন।”

কয়েকবার চোখ পিটপিট করলো সায়াকা।

“বাবার সাথে ওই পরিবারের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা মাথায় খেলছে না।”

“কোনো-না-কোনো যোগাযোগ তো আছেই,” বলি আমি। “সেজন্যেই পরিষ্কার করলেও কোনো কিছু বদলাননি তিনি। এমনকি খাতা-বইও বন্ধ করেননি কিন্তু! বাড়ির বাসিন্দারা যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সবকিছু সেভাবেই আছে।”

“বাবার সাথে বাড়িটা আর ওই পরিবারের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, সেই ব্যাপারে সূত্র খোঁজা উচিত আমাদের।”

“আগে চলো তুমি যে অ্যালবামগুলো নিয়ে এসেছ, সেগুলো দেখি,” বলে গাড়ি চালু করলাম। “হয়তো সেখানে পুরোনো কোনো ছবিতে দেখা যাবে বাড়িটা।”

* * *

ধূসর বাড়িটার সামনে ফিরে এলাম আমরা। আবারও বেইজমেন্ট দিয়ে প্রবেশ করলাম ভেতরে। কেরোসিনের ক্যানগুলোর কাছে একটা মোমবাতি আর ম্যাচ চোখে পড়লো আমার। এগুলো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম।

সূর্য ডুবতে এখনও কিছু সময় বাকি, ভারি মেঘের কারণে অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। খোলা জানালা দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছে না ভেতরে। মোমবাতি ব্যবহারের আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হবে।

আমার গাড়ির ট্রাঙ্কে প্লাস্টিকের একটা শিট ছিল। সেটা নিয়ে এসে সোফার উপরে বিছিয়ে বসলাম। খুব আরামদায়ক কোনো ব্যবস্থা না, ধুলোমাখা সোফায় বসার চেয়ে ভালো অন্তত। টিস্যু পেপার দিয়ে কফি টেবিল থেকে ধুলো পরিষ্কার করে সেটার উপরে ছবির অ্যালবাম রাখলাম।

মোট দু’টো অ্যালবাম। প্রথমটার মলাটে একটা হাতে আঁকা পশুর ছবি আর দ্বিতীয়টায় একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সায়াকা বলেছিল, প্রথম পাতার ছবিটা ওর স্কুলের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের দিন তোলা। সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের শর্ট স্কার্ট পরে আছে, কাঁধে লাল ভুল ব্যাগ। এমনভাবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে যেন প্রচণ্ড রোদ।

পাশে যে মহিলা সায়াকার হাত ধরে আছে, সে খুব সম্ভবত ওর মা। ছিপছিপে গড়ন, পরনে বিজনেস স্যুট। সায়াকার কাছে শুনেছিলাম প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালীন সময়েই মা’কে হারিয়েছে। হয়তো ছবিটা তোলার সময়েও অসুস্থ ছিল সে। মেয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানেও তার মুখে কোনো হাসি নেই। তবে বিউটি

পার্লারে গিয়ে করানো চুলের স্টাইলটা বলছে যে অনুষ্ঠানটায় আগ্রহ নিয়েই গিয়েছিল।

"ছোটবেলায় খুব একটা হাসতাম না আমি," সায়াকা বলে।

"হাসতে না? কেন?"

"জানি না। দেখ, আমার একটা ছবিতেও হাসির কোনো চিহ্ন নেই।"

পাতাগুলো উল্টে চললাম। কোথাও ছোট্ট নায়াকা জাতীয় উদ্যানে দাঁড়িয়ে আছে, তো কোনটায় অ্যামিউজমেন্ট পার্কে রোলার কোস্টারের সামনে। বড় বড় আদুরে চোখগুলোর কারণে নিশ্চয়ই অন্য বাচ্চাদের থেকে সহজেই আলাদা করা যেত ওকে।

তবে ও ঠিকই বলেছে, কোনো ছবিতেই হাসছে না। বরং প্রতিটা ছবিতে এর চোখে শঙ্কা। যেন সম্পূর্ণ অচেনা এক জগতে একা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

"তুমি তোমার ছোটবেলার ব্যাপারে আমাকে কখনোই খুব বেশি কিছু বলোনি," মাথা তুলে বললাম ওকে। "সেজন্যেই ছয় বছরের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তোমার শৈশব সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।"

"এই বিষয়ে আমাদের কোনো আলাপই হয়নি। তুমিও তো তোমার শৈশবের ব্যাপারে কিছু বলোনি।"

"যেন আমাদের মধ্যে অলিখিত একটা চুক্তি হয়েছিল যে অতীতের ব্যাপারে কিছু বলবো না।"

"ভবিষ্যতের ব্যাপারেও না," এবারে কিছুটা শীতল শোনালো সায়াকার কন্ঠস্বর।

প্রায় জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম, সেই কারণেই অন্য কাউকে বেছে নিয়েছে কিনা; যার ভবিষ্যত সুপরিকল্পিত। কিন্তু কথাগুলো গিলে ফেললাম।

ছবির অ্যালবামটার দিকে মনোযোগ দিলাম আবারও। কিন্তু আমরা যে বাড়িটা খুঁজছি, সেটার কোনো খবরই নেই। আমার পাশে বসে সায়াকা অন্য অ্যালবামটা দেখছে।

কিন্তু বাড়িটার একটা ছবিও পাওয়া গেল না। এমনকি আশপাশের এলাকার কোনো ছবিও নেই।

"তোমার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হবার আগের সময়ে ফিরে গেলেই কেবল এই পরিবারের সাথে তোমার বাবার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু জানা যাবে হয়তো।"

"আর আমার।"

"হ্যাঁ।"

আরো একবার শুরু থেকে অ্যালবামগুলো দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। তৃতীয় পাতায় দেখা মিলল সায়াকার বাবার। একটা কলার খোলা হাফ-হাতা শার্ট তার পরনে, মাথায় ড্রাইভিং হ্যাটটা একদিকে বাঁকানো। বাবা-মেয়ে একটা গেটের সামনে দাঁড়ানো, সম্ভবত সায়াকার মা তুলেছিল ছবিটা গেটটা খুব পরিচিত ঠেকল আমার কাছে। ওগিকুবোতে, ওদের বাসার গেট এটা। ডেট শেষে প্রায়ই

ওকে বাসায় পৌঁছে দিতাম, তখন দেখেছি। তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেবল বাড়িটা একটু নতুন ঠেকছে, এই যা। না, নিজেকেই বললাম। একটা পার্থক্য আছে।

"পাইন গাছটা নেই।"

"হ্যাঁ?"

"বড় পাইন গাছটা, মনে নেই? দরজার পাশেই তো ছিল ওটা। আমার ভালো মতন মনে আছে।"

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওপরে নিচে মাথা নাড়ল সায়াকা। ওরও মনে পড়েছে নিশ্চয়ই।

"গাছটা আমি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হবার পর লাগানো হয়েছিল তাহলে। পরের দিকের ছবিগুলোতে আছে নিশ্চয়ই। "

কয়েক পাতা ওল্টানোর পর আসলেও চোখ পড়লো গাছটা। সেই বছরেরই শীতকালে তোলা একটা ছবিতে চোখে পড়লো। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে গ্রীষ্মে বা হেমন্তে বোনা হয়েছিল ওটা।

"পাইন গাছই কেন লাগালেন ওনারা, এটা ভাবছি।"

"জানি না," সায়াকা বিভ্রান্ত স্বরে বলে।

"তোমার পরিবার তো ওগিকুবোতে অনেক আগে থেকেই থাকত, তাই না?"

প্রশ্নটা শুনে এক দিকে ঘাড় কাত করলো সায়াকা, কিন্তু কিছু বললো না।

"ঠিক বলিনি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"মনে হয় না," সায়াকার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে ও নিজেও নিশ্চিত নয় এই ব্যাপারে।

"তোমরা অন্য কোথাও থেকে এসেছিলে এখানে?"

"সেরকমই শুনেছিলাম। আগে আমরা ইয়োকোহামাতে থাকতাম।"

"কবে এসেছ ওগিকুবোতে?

"তা ঠিক বলতে পারব না। আমি একদম ছোট থাকতে বোধহয়।"

"কিন্তু," ছবিটায় টোকা দিয়ে বললাম, "এমনটাও হতে পারে যে এখানে সেই বছর ক্লাস শুরু হবার আগে এসেছ। নতুন বাসায় এসে অনেকেই কিন্তু গাছ লাগায়।"

বিস্ময় ফুটলো সায়াকার দৃষ্টিতে। "এভাবে তো ভেবে দেখিনি।"

"তোমরা যদি সেই সময়ে বাসা বদলিয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই

সেটা নাগরিক সনদে উল্লেখ করা আছে।"

"হ্যাঁ, আসলেও লেখা ছিল। কিন্তু আমি কখনো মনোযোগ দিয়ে তারিখটা দেখিনি। জরুরি মনে হয়নি কখনো।"

মাথা নাড়লাম আমি, এমনটাই স্বাভাবিক।

"হয়তো তোমরা আগে যেখানে থাকতে, সেখানে কিছু ঘটেছিল।"

"যে কারণে আমি সবকিছু ভুলে গেছি? "

"হ্যাঁ।"

ভ্রু কুঁচকে চিন্তায় ডুবে গেল সায়াকা। চেহারায় অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

"ইয়োকোহামায় কোথায় থাকতে, এটা জানো?"

"মিদোরি ডিসট্রিক্টে, কিন্তু সেটা না-ও হতে পারে।"

"আংকেল-আন্টি কি ওখানকার ব্যাপারে কোনো আলাপ করেছিল। তোমার সাথে?"

"না," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ও। "কী একটা অবস্থা। কিছুই জানি না আমি। এখনও যে বেঁচে আছি, এটাই তো অনেক।"

"আরে এটা এমন কোনো ব্যাপার না। আমি নিজেও আমার পরিবারের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি না। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাকে আমার দাদা-দাদির নাম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।"

"আমিও না। তাদের কখনো দেখিনি আমি।"

"আমার দাদি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া অবধি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তার নাম জানার কখনো আগ্রহ হয়নি আসলে। দাদি বললেই সে জবাব দিত।"

খুব একটা হাসির কিছু বলিনি, তবু হাসল সায়াকা।

"তোমার অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই?"

"মনে হয় না। বিয়েতে আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটা ছবি তোলার কথা বলেছিল ফটোগ্রাফার। কিন্তু কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে ছবি তুলি।"

"হুম।"

আবারও অ্যালবামটার দিকে তাকালাম। সায়াকাকে বিয়ের পোশাকে কল্পনা করলাম। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বুকের ভেতরে। আমার হঠাৎ এভাবে চুপ হয়ে যাওয়া খেয়াল করল ও। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। জোর করে মুখে হাসি টেনে মাথা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বিয়েটা কি চার্চে হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটাই ভেবেছিলাম। বিয়ের পোশাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর লাগছিল তোমাকে।"

"খুব একটা না," মৃদু হাসে সায়াকা।

"তোমার পরিবারের কেউ যে যায়নি, এটা দেখে অবাক হয়নি তোমার শ্বশুড়-শাশুড়ি?"

"নাহ। আমার যে কেউ নেই, সেজন্যে বরং খুশি হয়েছিল। থাকলে রীতি-রেওয়াজ মেনে অনেক কিছু করতে হতো তাদের জন্যে।"

"ওহ আচ্ছা," বললাম। এমনটাই হবার কথা। দ্বিতীয় অ্যালবামটা তুলে নিলাম এবার। এই অ্যালবামের প্রথম ছবিটা নববর্ষের দিন তোলা। সায়াকা একটা শিনতো মন্দিরের বড় গেটের সামনে কিমোনো পরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশের

ভদ্রমহিলাকে এই প্রথম দেখলাম। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। পরনে ধূসর কিমোনো।

"এটা কে?" ছবিটা দেখিয়ে বললাম।

"ওহ, ইনি," হাসি ফুটলো সায়াকার মুখে। "আগে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। শুনেছি এক সময় বাবার খুব উপকার করেছিলেন।"

"আর এখন?"

"মারা গেছেন। যতদূর মনে পড়ে..." মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবে সায়াকা, এরপর বলে, "আমি তখন ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষে। তার শেষকৃত্যেও গিয়েছিলাম।"

অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে চললাম। আরো বেশ কয়েকটা ছবিতে দেখা মিলল ভদ্রমহিলার।

"উনার নাম কী?"

এবারে মাথা ঝাঁকাল সায়াকা। "সত্যি বলতে, তার নাম কখনোই জানা হয়নি আমার। অনেকটা তুমি আর তোমার দাদির মতন। উনাকেও আমি 'দাদি'-ই বলতাম।"

"দাদি।"

সবগুলো ছবিতে ভদ্রমহিলার পরনে দামি সব কিমোনো। ধূসর চুলগুলো সুন্দর করে বাঁধা। যতদূর মনে হচ্ছে, দূরে কোথাও থেকে সায়াকাদের বাড়িতে আসতেন তিনি।

"তোমার এই দাদি থাকতেন কোথায়?"

"জানি না..."

"শেষকৃত্যে গিয়েছিলে বললে না? কোথায় হয়েছিল সেটা?"

"বাবা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছিল। আমি জানি না কোথায়," গোমড়া মুখে বলে সায়াকা। "সরি।"

"আরে, সরি বলছো কেন," হেসে বলি। অ্যালবামের পাতা উল্টে চললাম। শেষ ছবিটায় সায়াকা একটা ইউনিফর্ম পরে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিডল স্কুলে পড়তো নিশ্চয়ই তখন। "ইউনিফর্মটায় তো সুন্দর লাগছে তোমাকে," হালকা স্বরে বলে অ্যালবামটা বন্ধ করে দিলাম।

"এটা কি হতে পারে যে..." সায়াকা বলে, "আমার এই দাদিই হয়তো এই বাড়িটায় থাকত? বাবা যেহেতু সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে এতদূর গাড়ি চালিয়ে আসত, তাহলে বলা যায় ঘনিষ্ঠ কেউই ছিল সে। অন্য কারো কথা মাথায় আসছে না আমার।"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "তোমার কথায় যুক্তি আছে।"

"হয়তো এখানে এমন কিছু পাওয়া যাবে, যেটা দেখে আমরা নিশ্চিত হতে পারব এই ব্যাপারে।"

"চলো, দোতলায় গিয়ে খুঁজি।"

* * *

দোতলার বড় ঘরটা থেকে আমাদের তল্লাশি শুরু করলাম। সায়াকার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, তাহলে ছবির বয়স্ক ভদ্রমহিলা ইউসুকের মা। তিনিই হয়তো রকিং চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছিলেন। তেইশ বছর আগে ইউসুকে যদি প্রাইমারি স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায় মা এবং ছেলের বয়সের পার্থক্য অনেক। সায়াকা এখানে যে রিডিং গ্লাসটা খুঁজে পেয়েছি. সেটাও সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

রিডিং গ্লাস এবং পকেট ওয়াচটা যে ছোট টেবিলটায় পাওয়া গেছে, সেটা আবারও দেখল সায়াকা। টেবিলের উপরে কলম, আতশ কাঁচ এবং অন্যান্য কিছু জিনিস পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা।

দেয়ালে ঝোলানো স্যুটটার দিকে এগোলাম আমি। ধুলোয় সাদা দেখাচ্ছে এখন, এখানে সেখানে খেয়ে ফেলেছে মথ, কিন্তু আগে নিশ্চয়ই চমৎকার গাঢ় খয়েরি রঙের ছিল। স্যুটের ভেতরের পকেটের ঠিক নিচে এম্ব্রয়ডারি করে চাইনিজ ক্যালিগ্রাফি স্টাইলে 'মিকুরিয়া' লেখা।

ছোট আলমারিটা খুললাম আমি। ভেতরে একই রকম পুরোনো আরো দু'টো স্যুট আর মাঝবয়সি মহিলাদের সাধারণ একটা ড্রেস। এই স্যুটগুলোর ভেতরের পকেটে কোনো নাম উল্লেখ করা নেই।

আলমারির নিচের দিকে একটা ড্রয়ার; খুললাম সেটা। একটা বাইবেল চোখে পড়লো। দ্রুত পাতা উল্টে গেলাম বাইবেলটার। ভেতরে সরু দু'টো কাগজ গুঁজে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। কাগজ দু'টো থেকে কালি উঠে গেছে। কোনমতে একটা কাগজে চিড়িয়াখানা', 'প্রাপ্তবয়স্ক' আর অন্যটায় 'শিশু' লেখাগুলো বুঝতে পারলাম। বাবা ছেলে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।

আলমারির পাশে একটা ছোট স্টোরেজ রুম। পুরো রুমের তুলনায় একদমই জায়গা কম ভেতরে। আধ তাতামি ম্যাটের সমান হবে। ভেতরে অনেকগুলো বাক্স আর কাগজের ব্যাগ। একটা একটা করে নেড়েচেড়ে দেখলাম। সবগুলোই খালি।

বাক্স আর কাগজের ব্যাগগুলো সরানোর পর একদম নিচে একটা জিনিস চোখে পড়লো। একটা সবুজ রঙের ছোট ধাতব বাক্স। তুলে আনার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আমার ধারণার চাইতেও ভারী ওটা। সায়াকা'কে ডেকে দেখালাম।

"খোলার চেষ্টা করেছ?" জানতে চাইল ও।

হাতল ধরে টান দিলাম। এক ইঞ্চিও নড়লো না ঢাকনাটা।

"লক করা।" সাধারণ কম্বিনেশন লক। কিন্তু এতও সাধারণ না যে আন্দাজে সংখ্যা ঘুরিয়ে খোলা যাবে। "চাড় মেরে খুলতে হবে। গাড়িতে যে যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো দিয়ে হবে কিনা জানি না।"

"কোনো কোড লাগবে?"

"হ্যাঁ। আংকেল কি তোমাকে এরকম কিছু বলে গেছেন?"

"না।"

"সেটাই ভেবেছিলাম," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। কী করে বাক্সটা খোলা যায়, সেটাই ভাবছি।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঝোলানো স্যুটটায় হাত বুলাচ্ছে সায়াকা। "অনেক পুরোনো," বিড়বিড় করে বলে ও। এরপর হঠাৎই মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে ওঠে। "আহ!"

ওর দিকে তাকালাম। "কোনো সমস্যা?"

"এখানে কিছু একটা আছে," বলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে আনলো ও। একটা কালো রঙের মানিব্যাগ। ভেতরে বেশ কিছু নোটও আছে। দুইটা দশ হাজার ইয়েনের নোট, রাজকুমার সোতুকুর ছবি ওগুলোতে। বাকিগুলো ইতো হিরোবুমির ছবি সমেত এক হাজার ইয়েনের তিনটা নোট।

"অনেক পুরোনো নোট," বলি।

"এখনকার নোটগুলো কবে থেকে চালু করা হয়েছে যেন?"

"তাও বারো-তেরো বছর।"

"তাহলে এই মানিব্যাগটা এরপর আর ব্যবহৃত হয়নি।"

"মনে হয় না।"

"আর কী আছে?" বলে আরেকটা পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে আনলো সায়াকা। একটু পর বুঝতে পারলাম, কাগজ নয় আসলে সাদা-কালো একটা ছবি ওটা। কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সায়াকা।

পাঁচ বছর বয়সি বাচ্চা একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে ওখানে। হাতে বালি লেগে আছে, খেলছিল খুব সম্ভবত। জুলুজুলু চোখে সরাসরি লেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ চালাক চতুর।

"এটাই ইউসুকে?" সায়াকা বলে।

"তাই তো মনে হচ্ছে। তুমি চেনো বাচ্চাটাকে?"

"নাহ। কিন্তু..." ছবিটা আবারও হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল ও। "মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।"

"এমনটাও হতে পারে যে হয়তো ছোটবেলায় দেখা হয়নি, কিন্তু বড় হওয়ার পর কোথাও দেখা হয়েছে তোমাদের। এই ছেলেটার মতন দেখা যায় এরকম কারো সাথে পরিচয় আছে তোমার এখন?"

আরো কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল সায়াকা। এরপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "মনে পড়ছে না।"

"ওহ। দেখো তো কোনো কয়েন আছে কিনা মানিব্যাগটায়?"

"কয়েন? না, নেই তো মনে হয়। কেন?"

"কয়েনে সাধারণত কবে তৈরি করা হয়েছে, সেটা লেখা থাকে। সেখান থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারতাম ইউসুকের পরিবার এখানে ঠিক কোনো

সময়টায় ছিল," বলে আলমারির অন্য কাপড়গুলোর পকেট হাতড়ে দেখলাম। কোনো মানিব্যাগ বা পার্স নেই এখানে।

প্যান্টগুলো বের করে আমার নিজের কোমরের সাথে তুলনা করে দেখলাম। ভদ্রলোক বেশ রোগা ছিলেন আমার চেয়ে।

"ইউসুকের ঘরে কয়েন থাকতে পারে," সায়াকা বলে।

"হ্যাঁ। চলো তাহলে এখন ওই ঘরটায় দেখি।"

উল্টোদিকে ইউসুকের ঘরটায় চলে এলাম আমরা।

"খুব বেশি এদিক ওদিক করো না কিছু। হয়তো বিশেষ কোনো কারণে এভাবে রাখা হয়েছে সব জিনিস, যেন মনে হয় সময় থমকে গেছে," ভেতরে পা দিয়ে সায়াকাকে বললাম।

"আচ্ছা," ছোট করে জবাব দেয় ও।

ছেলেটার পড়ার টেবিল আর বুকশেলফের উপরে দেখলাম টাকা জমানোর ব্যাংক আছে কিনা, কিন্তু পেলাম না কিছুই।

"ওরকম কিছু থেকে থাকলে সাথে করে নিয়ে গেছে।"

"তাহলে স্যুটের পকেটে থাকা মানিব্যাগটা রয়ে গেল কী করে?"

"ওটা নিতে ভুলে গেছে হয়তো।"

"আসলেই?" বুকশেলফের বইগুলোয় হাত বুলাচ্ছে সায়াকা। "যাওয়ার সময় শুধু টাকা নিয়ে গেল? বই আর পত্রিকাগুলো রেখে গেল এভাবে?"

"হয়তো পছন্দের বইগুলো নিয়ে গেছে, সেটা জানার তো কোনো উপায় নেই আমাদের।"

সায়াকা'কে দেখে মনে হচ্ছে না আমার যুক্তিটা পছন্দ হয়েছে। বাচ্চাদের একটা গল্পের বই তুলে নিল ও। 'ভিখারী রাজপুত্র'।

"বইটার প্রকাশকাল তেইশ বছর আগের," আমাকে সালটা দেখিয়ে বলে ও। "ওর পড়ার বইগুলোর মতনই।"

"অন্য বইগুলো?" আরো দুই তিনটা বই বের করে দেখলাম। সবগুলোই প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত। পত্রিকাগুলোর প্রকাশকাল আরো আগের। কোনোটাই তেইশ বছরের কম নয়।

"এখন তো পরিষ্কার, নাকি? পরিবারটা তেইশ বছর আগে রাতারাতি কোথাও চলে যায়।"

"কিন্তু রান্নাঘরে আমরা যে পত্রিকাগুলো পেয়েছি, সেগুলো কিন্তু বিশ বছর আগের, তার উপরে সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে কেনা। তাহলে সেগুলো কি পরে কেউ এখানে রেখে গেছে?"

"কিন্তু..." বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরলো সায়াকা।

বুকশেলফ থেকে যে বইগুলো বের করেছে সায়াকা, সেগুলো জায়গামত রাখতে রাখতে মাথায় ভাবনাগুলো গোছানোর চেষ্টা করলাম আমি। সায়াকার কথা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ, মিকুরিয়া পরিবার যদি তেইশ বছর আগে অন্য

কোথাও চলে যায়, তাহলে রান্নাঘরের পত্রিকাগুলো অন্য কেউ নিয়ে এসেছে। আর সেটা সায়াকার বাবা হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু এটা কেন করবে সে?

শেষ বইটা রাখার সময় একটা সাদা রঙের নামহীন ডায়রি চোখে পড়লো আমার। পেছনের দিকে রাখার কারণে আগে চোখে পড়েনি।

বের করে আনলাম। দেখে সাধারণ কোনো ডায়রি মনে হচ্ছে না। স্পাইন বা প্রচ্ছদ, কোথাও-ই কিছু লেখা নেই। বিভ্রান্ত মনে বইটা খুলতেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে।

প্রথম পাতায় লেখা-

‘৫ই মে। বেশ রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া।
আজকে থেকে ডায়রি লেখা শুরু করলাম।’

দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো বাচ্চার হাতের লেখা। অঙ্ক খাতার লেখাগুলোর সাথে বেশ মিল।

দ্বিতীয় পর্ব

১

‘বাবা আমাকে এই ডায়রিটা কিনে দিয়েছে। বলেছে, ডায়রিতে নিয়মিত লিখলে নতুন নতুন শব্দ মনে রাখতে পারব, এছাড়াও অনেক কাজে লাগবে। চেষ্টা করবো নিয়মিত লেখার। আজকে শিশু দিবস, তাই বাগানে কার্প মাছের মতন দেখতে পতাকা উড়িয়েছে আমরা। সন্ধ্যায় মা মজার মজার সব খাবার রান্না করেছিল। আমি অনেক খেয়েছি।’

ইউসুকে মিকুরিয়ার ডায়রির প্রথম পাতার লেখা এটা। শব্দের ব্যবহার এবং বাক্যের ধরন দেখে বাচ্চাটার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে যত দূর মনে হচ্ছে এলিমেন্টারি স্কুলের শেষ বর্ষ শুরু হবার কিছুদিন আগের লেখা। আবারও পড়তে শুরু করলাম।

‘৬ মে, আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল আজকে স্কুলে গানের পরীক্ষা ছিল। আমি সবুজ খামার গানটা গেয়েছি। শারীরিক শিক্ষা ক্লাসে ফুজিমোতো জাম্পিং বক্সে লাফানোর সময় আরেকটু হলেই ব্যথা পেত। বেঁচে গেছে শেষ পর্যন্ত। বাবা আমাকে একটা বই কিনে দিয়েছে।’

‘৭ মে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আজ আমাদের ক্লাস টিচার ছুটি নিয়েছিল। তাই সারাদিন কিছু করতে হয়নি। অনেক মজা করেছি সবাই। বাসায় এসে বাবাকে কথাটা বলা মাত্র বকুনি দিয়েছে। এরকম সময়েই নাকি নিজে থেকে সব করতে হয়। ডিনারের সময় পেটে ব্যথা করছিল, তাই ঔষধ খেয়েছি।’

‘৮মে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আজকে টিচার ক্লাসে এসেছিল। বলেছে ঠাণ্ডা লেগেছিল নাকি।’

এতদূর অবধি প্রতিদিন লিখেছে ইউসুকে। এরপর নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে গেছিল, নতুবা লিখে রাখার মতন কিছু ঘটেনি। কারণ পরের লেখাটা ১২ তারিখের।

‘১২ মে, প্রথমে মেঘ, পরে রোদ। আজ খুব গরম। সবাই বারবার সৈকতে যাওয়ার কথা বলছিল। আমারও সাঁতার কাটতে খুব

ভালো লাগে। বাসায় এসে ঠাণ্ডা পানির নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। মা-ও হাতাকাটা জামা পড়ে ছিল দুপুরে।'

এরপর তিন দিন কোনো কিছু নেই। মে'র ১৬ তারিখে আবার লিখেছে ইউসুকে।

'১৬ মে, রোদ
ইয়ামাদা আজ স্কুলে লেগো মডেল নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমি লেগো দিয়ে ভালো মত খেলতে পারি
না।'

পরবর্তী তারিখটা সরাসরি ১ জুলাই। এই আধমাসে বলতে গেলে তেমন কিছুই হয়নি। ইউসুকের লেখা পড়ে সেটাই মনে হচ্ছে।

'১ জুন, বৃষ্টি হতে পারে
আজ থেকে ভালো মত ডায়রি লিখব আমি। বাবা বলেছে আমাকে যে প্রতিদিন লিখতে হবে তা নয়। এতে একটা কাজের মতন মনে হবে ব্যাপারটা, আগ্রহ থাকবে না। এর চেয়ে শুধু শনি আর রবিবার সন্ধ্যায় ভাল করে লিখতে। বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে আমার। সেটাই করবো। অন্তত, শুধুমাত্র আবহাওয়ার ব্যাপারে হলেও লিখব।'

নিজের এই কথা রেখেছে ইউসুকে। প্রতি শনিবারে সেই সপ্তাহে কী কী ঘটেছে ছোট করে উল্লেখ করেছে। কখনো শুধু আবহাওয়ার খবর জানিয়েছে।

"এই বাড়ির ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেছে কিনা কে জানে," সায়াকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ডায়রিটার দিকে তাকিয়ে বললো।

"সেটাই খুঁজছি," বলি আমি। দ্রুত পাতা উল্টে যেতে থাকি। এই ব্যাপারটা এখন নিশ্চিত, তিনজনের একটা পরিবার ছিল তারা। ইউসুকে এবং তার বাবা-মা। আর কারো ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই। আগস্টে নতুন একটা এন্ট্রি পাওয়া গেল।

'২ আগস্ট, রোদ, হালকা বৃষ্টি আজকে ওয়াটার গান নিয়ে খেলছিলাম, এমন সময় ওটাই আন্টি তরমুজ নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। খুব ভালো তরমুজ চিনেন তিনি। তিনজন মিলে মজা করে তরমুজ খেলাম। ওটাই আন্টি বললেন, বাসায় বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। তাই চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। মর্নিং গ্লোরি ফুলগুলো খুব বেশি বাড়েনি এখনও, তাই ড্রয়িং বুকে আঁকতে পারছি না।'

এই ‘ওটাই আন্টি’ কি পাড়ার কোনো আন্টি।

“ওটাই নামে কাউকে চেন?” সায়াকা’কে জিজ্ঞেস করলাম।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ও।

পাতা উল্টে চললাম। নিয়মিত বিরতিতে ওটাই আন্টির সম্পর্কে লিখেছে ইউসুকে। একই এলাকার অধিবাসী হিসেবে একটু বেশিই আসা যাওয়া ছিল তার। তাছাড়া বাড়ির কাজেও সাহায্য করতেন। এসময় একটা লেখা চোখে পড়লো-

> ‘৫ অক্টোবর, রোদ
> ওটাই আন্টি সাথে করে ছোট একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। একদম পুতুলের মতন ছোট। কিন্ডারগার্টেনে পড়ে। ও যখন একটু বড় হবে, তখন ওটাই আন্টি আবার আগের মতন আসা যাওয়া করবে আমাদের বাড়িতে। তার রান্না খুবই মজা, আমি চাই তিনি যেন দ্রুত ফিরে আসেন।’

এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় ইউসুকের এই ওটাই আন্টি এক সময় পরিচারিকার কাজ করতো বাড়িতে। বাচ্চা ছোট বিধায় কাজ করতে পারছে না। তবু মাঝে মাঝে আসত যেহেতু, তাদের সম্পর্ক ভালোই ছিল নিশ্চয়ই। ইউসুকে যেহেতু প্রতি সপ্তাহে এক কি দু’বার ডায়রি লিখেছে, সময় বেশ দ্রুত গড়িয়ে চললো। দেখতে দেখতে বছরের শেষ দিকে পৌঁছে গেলাম। ক্রিসমাসের সপ্তাহ।

> ‘২৪ ডিসেম্বর, রোদ, অল্প অল্প মেঘ আজকে আবহাওয়া খুবই ঠাণ্ডা। দ্বিতীয় সাময়িকের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে ক্লাসে। অনুষ্ঠানের সময় আমি কাঁপছিলাম। আগের সাময়িকের চেয়ে ফলাফল ভালো হওয়ায় মা প্রশংসা করেছে আমার। এই বছর আবার বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছে সে, একটা বড় গাড়ি। গত বছর ট্রেন সেট পাঠিয়েছিল। বাবা বলে এসব খেলনা না দিয়ে বই দেওয়া উচিত। সেজন্যে ফোনে রাগারাগিও করেছে। রাতের বেলা তুষারপাত হয়েছে অল্প।’

ডায়রি থেকে মুখ তুলে সায়াকার দিকে তাকালাম।

“উপহার পেয়েছে তো এটা নিয়ে এত রাগারাগির কী আছে? কে পাঠিয়েছে জিনিসটা?”

“কোনো আত্মীয় হবে নিশ্চয়ই।”

“কিন্তু তুমি কি কখনো তোমার কোনো আত্মীয়কে ফোন করে রাগারাগি করবে? সবসময় খেলনা পাঠাতে মানা করবে?”

“হুম...,” আরো একবার ডায়রির লেখাটা পড়ে মুখ তুলে তাকায় সায়াকা। “কে পাঠাতে পারে তাহলে?”

“জানি না বলেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি,” একটা চেয়ার টেনে ধুলো ঝেরে বসলাম। বাচ্চাদের চেয়ার বলেই হয়তো বেশ খাটো চেয়ারটা।

“কোনো আত্মীয়ই হবে নিশ্চয়ই। নাহলে রাগারাগি করতে পারত না মি. মিকুরিয়া। ইউসুকের চাচা বা দাদা-দাদি হতে পারে।”

“হ্যাঁ, ওর দাদা-দাদিই হবে,” ক্ষীণ স্বরে বলে মাথা নাড়ে সায়াকা। “আমার জামাইও মাঝে মাঝে ওর বাবা-মা’কে কথা শোনায় আমাদের মেয়েকে বেশি আদর করার জন্যে।”

“ওহ, বুঝতে পেরেছি...” ওর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। “তোমার পরিবারও অন্য পরিবারের মতনই।” অবচেতন মনেই কথাটা বলে ফেললাম। খানিকটা টিটকারি মত শোনালো।

কষ্ট পেল বোধহয় সায়াকা, মুখ কালো হয়ে গেল। আমি যে ঠাট্টা করেছি এটা বলার আগেই বললো-

“আমার পরিবার সাধারণ না।” কিছুটা রূঢ় শোনালো সায়াকার কণ্ঠ।

অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। “সরি। উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসো না আবার।”

অস্বস্তিকর মুহূর্তটা কাটানোর জন্যে চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। ডায়রিতে মনোযোগ দিলাম আবারও।

“সবগুলো লেখা পড়তে বেশ সময় লাগবে।”

“তাহলে শেষের দিক থেকে পড়ো নাহয়,” আবারও স্বাভাবিক শোনালো ওর কন্ঠস্বর।

“ভালো বুদ্ধি দিয়েছ।”

ডায়রিটা উল্টিয়ে পেছনের দিক থেকে খুললাম। কিন্তু শেষের পাতাগুলো ফাঁকা। এমনটা কি হতে পারে যে ডায়রিটা শেষ হবার আগেই এই বাড়ি থেকে চলে গেছে ইউসুকে?

প্রায় দশ পৃষ্ঠা ওল্টানোর পর আবারও হাতের লেখা দেখা গেল। শেষ এন্ট্রিটা ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের। জাতীয় দিবসের আগের দিন।

চেয়েছিলাম দ্রুত একবার পড়ে ফেলব। কিন্তু শেষ হবার আগেই চমকে গেলাম। শুরু থেকে পড়তে শুরু করলাম আবারও। আমার অভিব্যক্তি খেয়াল করলো সায়াকা।

“কী হলো? কী লেখা?” সায়াকা জিজ্ঞেস করে।

“বুঝতে পারছি না, কিন্তু কোনো একটা সমস্যা আছে।”

“সমস্যা?”

“নিজেই পড়ে দেখ,” ওর হাতে ডায়রিটা তুলে দিলাম।

> ‘১০ ফেব্রুয়ারি, রোদ পেটে ব্যথা সত্ত্বেও আজকে স্কুলে গিয়েছিলাম, কারণ বাসায় থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে টিচারদের সাথে কথা বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বড়দের ভরসা করা যায় না। টিচার নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করবে, আমার কথা আমলেই নিবে না। পরে সে আমার উপরে প্রতিশোধ নিবে। স্কুল থেকে ফিরে দেখি সোফায় শুয়ে আছে লোকটা। আমাকে দেখার আগেই রুমে চলে আসি। ভেতরে ঢুকে দেখি চামি গতবারের মতন বিছানায় শুয়ে কাঁদছে। ওকে নিশ্চয়ই কষ্ট দিয়েছে লোকটা। আর ভালো লাগছে না। শয়তানটা মরে গেলেই পারে।’

লেখাটা পড়া শেষে মুখ তুলে তাকালো সায়াকা। “নতুন একটা চরিত্রকে দেখতে পাচ্ছি।”

“হ্যাঁ। ‘লোকটা’...”

“কোত্থেকে এসেছে সে জানি না, কিন্তু এখানেই নিশ্চয়ই থাকে। সোফায় শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়নি ইউসুকে।”

“কোনো আত্মীয়?”

“হতে পারে। কিন্তু ডায়রির লেখা পড়ে মনে হচ্ছে ইউসুকে তাকে পছন্দ করে না।”

“ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করতো মনে হয়। ইউসুকে বিষয়টা নিয়ে এতটাই নাজেহাল ছিল যে টিচারদের সাথেও কথা বলতে চেয়েছে।”

“নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে এই কয় দিনে, যা আমরা জানি না। আর এই ‘চামি’ মনে হচ্ছে বিড়াল।”

“চামি, বিড়াল...” ঘাড় একদিকে কাত করে ভাবতে লাগল সায়াকা। “কোনো সমস্যা?”

“হুম... নামটা আগে শুনেছি মনে হচ্ছে।”

“বিড়ালটাকে চেন?”

“মনে হয়, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। এরকমই হয়ে আাসছে আমার সাথে। মনে পড়তে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ভুলে যাই।”

“চিন্তার কিছু নেই। আমরা আগে থেকেই জানতাম যে সব স্মৃতি এত সহজে ফিরে আসবে না। ডায়রিটা সাবধানে পড়লে কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।”

“ঠিক বলেছ।”

ডায়রির আগের পাতায় গেল সায়াকা। ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ

> ‘৩ ফেব্রুয়ারি, আকাশে মেঘ আজকে সেতসুবানের (বসন্ত শুরুর আগের দিন) ছুটি। আগে অশুভ আত্মাদের তাড়ানোর

জন্যে এই দিনে মটর দানা ছুড়তাম আমরা, যাতে বাড়িতে আনন্দ অটুট থাকে। কিন্তু এবারে সেটা সম্ভব হয়নি। ওই লোকটা আবারও গলা পর্যন্ত মদ গিলেছে। ভাগ এখান থেকে!'

"বুঝতে পারছি না," বলি আমি। "কার ব্যাপারে কথা বলছে ও? বাবামা'র বিষয়ে কিছু লিখছে না কিন্তু।

"শুরু থেকে ক্রমানুযায়ী পড়াই ভালো," শব্দ করে শ্বাস ছেড়ে বললো সায়াকা। "কিন্তু সেটায় অনেক সময় লাগবে। ডায়রিটা হার্ডকভার বইয়ের মতন মোটা।"

"তাহলে সাথে করে নিয়ে যাও। টোকিওতে গিয়ে পড়ো।"

ইচ্ছে করেই কথাটা বললাম যেন সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারি আর বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নেই।

আমার মনে কী চলছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না সায়াকার। মাথা নেড়ে সায় জানাল ও। "ভালো বলেছ। কোনো সূত্র চোখ এড়িয়ে গেল কিনা ভাবছি।"

"চলো, অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখি নাহয়? নেয়ার মত কিছু পেলে নিয়ে নিব।"

ঘরটা থেকে বের হবো, এমন সময় বিদ্যুৎ চমকালো বাইরে। পরক্ষণেই বিকট স্বরে ডেকে উঠলো মেঘ।

"আহহা," মাথা ঝাঁকাই আমি। "ঠিকই বলেছিলে, আবহাওয়া আরো খারাপ হবে।"

"বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।"

ও কথাটা বলেও শেষ করতে পারেনি, এর আগেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে

পেলাম আমরা। টিপটিপ বৃষ্টি কিছুক্ষণের মাঝেই রূপ নিল ভারী বর্ষণে। "তাড়াতাড়ি চলো, অন্ধকার হয়ে গেলে এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো কঠিন হবে।"

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে লিভিং রুমটায় নজর বুলালাম আবারো। এবারে কিছু ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকলো

যেমন, বাড়িটায় কোনো টিভি নেই। তেইশ বছর আগে রঙিন টেলিভিশন ভালই জনপ্রিয় ছিল। কিছু কিছু পরিবার অবশ্য তখনও কিনতে পারেনি অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু এই বাড়িটা যেরকম বড়, খুব সহজেই টিভি এঁটে যেতে ভেতরে। শুধু যে টিভি নেই, তা নয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির সংখ্যাই ভীষণ কম। ওয়াশিং মেশিন বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখিনি কোথাও। এমনকি ফোনও নেই।

"বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়েছিল হয়তো, নাকি? বিক্রিও করে দিতে পারে," আমার প্রশ্নের জবাবে বলে সায়াকা।

"সেক্ষেত্রে বাড়িতে আরো দামি জিনিস আছে, যেমন পিয়ানোটা।" "পিয়ানো বিক্রি করা একটু কঠিন, কিন্তু সংসারের জিনিস সবাই কেনে।"

“তাই? সত্যি বলতে আমার ধারণা যে এই বাড়িটায় শুরু থেকেই ওসব জিনিস ছিল না। যেমন টিভির কথাই ধরো। যদি এই বাড়িতে টিভি থাকতো-ও, কোথায় রাখা হতো সেটা?”

“এই ঘরেই নিশ্চয়ই,” লিভিং রুমের সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বলে সায়াকা।

“এই ঘরের কোথায়?”

চারপাশে তাকায় সায়াকা। খানিকবাদে ফায়ারপ্লেসে নিবদ্ধ হয় ওর দৃষ্টি। কিন্তু কিছু বলে না।

“টিভিটা রাখার কোনো জায়গাই নেই, তাই না?” বলি আমি। “যদি টিভি থাকতো, তাহলে সেটার জন্যে নির্ধারিত জায়গাও থাকতো নিশ্চয়ই।”

“ঠিক বলেছ...” বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে চিন্তামগ্ন স্বরে বলে সায়াকা।

“বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নেই, এটা হয়তো ওরকম কোনো বিষয় না। বাড়ির প্রধানের বোধহয় ওসব জিনিস ভালো লাগতো না। তবে আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি অন্য একটা কারণে। কোনো ক্যালেন্ডার নেই কোথাও। অদ্ভুত না? সব বাড়িতেই অন্তত একটা হলেও ক্যালেন্ডার থাকে।”

“হ্যাঁ, আসলেও অদ্ভুত।”

“আর সবগুলো ঘড়ি একই সময় দেখাচ্ছে। যেন সময় থমকে গেছে। এটাও ইচ্ছাকৃত। কিন্তু কেউ কেন সেটা করবে?”

কিছুক্ষণ ভেবে মাথা ঝাঁকায় সায়াকা। “আমি জানি না। কিছুই মাথায় আসছে না আমার।”

ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, এরপর ডায়রিটার দিকে তাকালাম। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নজর এড়িয়ে গেছে আমাদের।

বাইরে শব্দ বেড়েছে। জানালার কাঁচের উপরে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।

“বৃষ্টি বাড়ছে,” বলি আমি। “আমাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া উচিত।”

একটু দূরে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো এসময়। কেঁপে উঠলাম আমি আর সায়াকা।

“সমস্যা নেই, দূরে পড়েছে,” হেসে বলি।

মাথা নিচু করে আছে সায়াকা, চোখ পিটপিট করছে বারবার। এরপর গালে হাত দিয়ে ঘোরলাগা দৃষ্টিতে চারপাশ একবার দেখল।

“কোনো সমস্যা?” জিজ্ঞেস করি।

“পিয়ানোর নিচে,” ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করে বলে ও।

“পিয়ানোর নিচে?” ওর ইশারা মোতাবেক তাকাই সেদিকে। কী ওখানে?”

“লুকিয়ে আছে... ওখানে...”

“লুকিয়ে আছে? কে?

সাথে সাথে জবাব না দিয়ে পিয়ানোর দিকে ছুটে গেল ও। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পিয়ানোর নিচ দিয়ে দেখতে লাগল চারপাশে।

“কী সমস্যা? কিছু আছে ওখানে?” আবারও জিজ্ঞেস করলাম।

সায়াকা এখনও উবু হয়ে বসে আছে, দৃষ্টি আমার দিকে।

“এখানে লুকিয়ে ছিল।”

“কে লুকিয়ে ছিল?” কিছুটা বিরক্তই হলাম এবারে। জবাব দেয়ার আগে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে একবার ঢোক গিলল ও।

“আমি...”

“তুমি?” বিভ্রান্ত স্বরে বললাম। ওর কথা বুঝতে পারছি না। “কবে?”

“অনেক আগে...”

“অনেক আগে?” কথাটা বলে আমি নিজেই চমকে উঠলাম। এবারে ধরতে পারছি কী বলতে চাচ্ছে সায়াকা। “তোমার মনে পড়েছে? এই পিয়ানোর নিচে লুকিয়ে ছিলে তুমি?”

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে পিয়ানোর একটা পায়ে হাত দিয়ে ঘষতে লাগল সায়াকা। ধুলো সরে যাওয়ায় কালো রঙ দেখা গেল ওখানে।

“আজকের মত বৃষ্টি পড়ছিল আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল সেদিনও।”

২

সায়াকার হাত ধরে সোফায় বসালাম। এখনও বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এতে যদি সায়াকার স্মৃতি ফিরে আসে, আপত্তি নেই আমার।

কনুই দু'টো হাঁটুর উপরে ওর। দুই হাতের আঙুল এক করে রেখেছে। লম্বা একটা সময় নীরবে বসে রইলো এভাবে। ভাবছে কিছু একটা। ওকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে না। চুপ করে আছি সেজন্যে। প্রায় দশ মিনিট পর অবশেষে মুখ খুললো সায়াকা।

"বজ্রপাত হচ্ছিল একটু পরপর, তাই পিয়ানোর নিচে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল বাড়ি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাবে বুঝি।

"তুমি নিশ্চিত যে এই ঘরেই সেটা?"

"একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না," বলে আবারও চারপাশে তাকালো ও। "কিন্তু এখানেই মনে হচ্ছে। পিয়ানোর নিচ দিয়ে দেখার সময় দেজা ভ্যু[3] হচ্ছিল।"

মাথা নাড়লাম আমি। অবশেষে ধীরে হলেও সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমরা।

শুধু সায়াকার বাবাই নয়, সায়াকার নিজেরও এই পরিবারের সাথে সম্পর্ক আছে। আর সেই সম্পর্কটা কী, তা জানলেই বোঝা যাবে কেন কোনো স্মৃতি নেই ওর।

"সেই সময় কি একাই ছিলে তুমি? নাকি অন্য কেউ ছিল?"

চোখ বন্ধ করে নিল সায়াকা। ঠোঁটগুলো কাঁপছে তিরতির করে। ওর এই অভিব্যক্তি আমার অতি পরিচিত। কিছু মনে করার চেষ্টা করলে এমন চেহারা হয়।

"আরেকজন ছিল," কিছুক্ষণ পর বলে ও। "আমার মনে আছে, দু'জনই লুকিয়ে ছিলাম পিয়ানোর নিচে।"

"পিয়ানোর নিচে? তাহলে অন্যজনও বাচ্চা?"

"বড় কেউ নয়, এই ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। তবে ছেলে নাকি মেয়ে, তা বলতে পারবো না।"

"ছেলেই হবার কথা। ইউসুকে মিকুরিয়া।"

"হয়তো," অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ও।

"আর কিছু মনে পড়ছে তোমার?" জানি লাভ নেই, তবুও জিজ্ঞেস করলাম।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সায়াকা। "কথাগুলো পেটে আসলেও মুখে আসছে না কেন যেন। খুবই বিরক্তিকর।"

"সবকিছু আসলে একসাথে মনে পড়ার কথাও না। এটুকু যে মনে করতে পেরেছ, এটাই অনেক। চলো, ডায়রিটা পড়ে দেখি কিছুদূর। হয়তো এবারে তোমাকে নিয়ে কোনো কিছু পাওয়া যাবে।"

অতীত মনে করতে পারছে না দেখেই হয়তো একটু বিরক্ত দেখাচ্ছে ওকে।

“আমার সাথে এই বাড়ির কী সম্পর্ক? এখানে কেন এসেছিলাম?”

“হয়তো আশপাশেই থাকতে?”

“কিন্তু আমরা তো ইয়োকোহামায় থাকতাম...”

“সেটা শুধু তোমার সিটিজেন ফর্মে লেখা। এমনটাও হতে পারে যে আসলে এখানেই কোথাও থাকতে। ইউসুকে ছোটবেলার বন্ধু ছিল তোমার, প্রায়ই আসতে এই বাড়িতে।”

“ছোটবেলার বন্ধু...” আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করলো সায়াকা। নখ কামড়াচ্ছে। পা ভাঁজ করে বসলো একটু পর, যেন আমি যেটা বললাম সেটা নিয়ে ভালো মতন ভাববে।

হঠাৎই সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকালো। “মনে হয় না যে আমি ইউসুকের ছোটবেলার বন্ধ ছিলাম।”

“কেন?”

“আমাদের বয়সের পার্থক্য অনেক। তেইশ বছর আগে প্রাইমারি স্কুলের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল ও। তখন আমার বয়স সাতও হয়নি। কিন্ডারগার্টেনে পড়তাম নিশ্চয়ই।”

“আরে এটুকু পার্থক্য ওরকম কিছু না।”

“বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটুকুই অনেক। হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবো। প্রথম বর্ষ আর দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা যেন দুই জগতের বাসিন্দা।” এটা ভুল বলেনি ও। মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ডায়রিটা আরও কয়েক পাতা উল্টে বন্ধ করে দিলাম চট করে। আলো কমে এসেছে। এখন আর পড়া সম্ভব না।

“ঠিক আছে, আজকের মতন যথেষ্ট হয়েছে। এবারে ফিরে যাই,” বললাম।

“আচ্ছা,” দুর্বল কন্ঠে বললো সায়াকা।

জানালাগুলো একে একে সব ভেতর থেকে বন্ধ করে বেইজমেন্ট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। বৃষ্টির তেজ একটুও কমেনি। গাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে আমাদের কাপড় ভিজে গেল পুরোপুরি।

“এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। কেউ বিশ্বাসই করবে না এখানে আসার সময় আবহাওয়া কতটা ভালো ছিল,” রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলি। সায়াকা চুপচাপ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে গাড়ির জানালা দিয়ে। বৃষ্টির কারণে ঝাপসা দেখাচ্ছে ওটা।

“আগেও দেখেছি,” একটু পর বলে সায়াকা।

“কী?”

“এই বাড়িটা আগেও দেখেছি। এরকম; দূর থেকে। সেটা অনেক অনেক আগের কথা.” আমার দিকে ফিরল ও। “আমি নিশ্চিত যে আগেও এসেছি এখানে।”

আড়চোখে বাড়িটা দেখে ওর দিকে তাকালাম। “একাই ছিলে তখন?”

"না, কেউ ধরে ছিল আমার হাত।"

"কে? তোমার বাবা-মা?"

"হতে পারে।" কথাটা বলে হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে চোখ বুজলো সায়াকা। একটু পরেই আবার আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বল হেসে বললো, "সরি। চলো এখন।"

"আসলেই যাব?"

"হ্যাঁ। এখানে থেকে সময় নষ্ট করলে তো আর স্মৃতিগুলো ফিরে আসবে না।"

মাথা নেড়ে ইঞ্জিন চালু করলাম।

কাঁচা রাস্তাটা কাদা কাদা হয়ে আছে বৃষ্টির পানিতে। খুব বেশি দূর দেখাও যাচ্ছে না। হেডলাইট জ্বেলে মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

মাতসুবারা লেক গ্যাস স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সায়াকা বললো, "আমরা এখানে থামি একটু?" কারণ জানতে না চেয়ে ব্রেক কষলাম। হয়তো টয়লেটে যেতে হবে ওকে, বাড়িটায় টয়লেটে যাওয়ার সুযোগ হয়নি কারোই।

গ্যাস রিফিল করে নিলাম সেই সুযোগে। বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে তরুণ স্টাফ। হয়তো সে ভেবেছিল আজ রাতে আর কেউ আসবে না।

আসলেও বাথরুমে গেল সায়াকা, এরপর ফোন করলো কাকে যেন। দূর থেকে দেখে মনে হল চোখমুখ শক্ত করে কথা বলছে।

"অপেক্ষা করানোর জন্যে দুঃখিত," গাড়িতে ফিরে বললো ও।

"ফোন করেছিলে কাউকে?"

"হ্যাঁ, শ্বশুড়বাড়িতে। মেয়ে ওখানেই আছে।"

"তোমার জামাইয়ের পরিবারের লোকজন কাছেই থাকে নাকি?"

"না।"

"এখানে আসার আগে চট করে গিয়ে রেখে এসেছ?"

সায়াকার মুখের হাসিটা দুর্বোধ্য ঠেকছে এখন। একটু পরেই সেখানে বিরক্তির ছাপ খেয়াল করলাম।

"না," বললো ও। "অনেক দিন ধরেই ওখানে আছে ও।"

"অনেক দিন ধরেই?"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে এখন ও। চোখ থেকে এক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো।

"ওকে... নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে।"

"কেন?"

"কারণ... আমি মা হবার যোগ্য নই।"

"যোগ্য নও?"

"একটা বাচ্চার লালন পালনের জন্যে যেসব গুণাবলীর দরকার, তা নেই আমার। আমি মা হবার অযোগ্য..." এবারে আর বাঁধ মানলো না চোখের পানি, অঝোর ধারায় ঝরতে লাগল।

৩

গ্যাস স্টেশনের উল্টো দিকে মাতসুবারা লেকের পাবলিক পার্কিং লট। সেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলাম। উইন্ডশিল্ডে ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির পানিতে। এফ এম রেডিওতে কেনি জি'র গোয়িং হোম গানটা বাজছে। ভলিউম কামিয়ে সায়াকার কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"আমার মেয়ের নাম মিহারু। আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় ফুলের মতন সুন্দর।"

"মিহারু," বললাম আমি। আঙুল দিয়ে সিটে লিখলাম নামটা। "সুন্দর নাম।"

"আমার জামাই রেখেছে। অনেক আগে থেকেই নাকি ঠিক করে রেখেছিল মেয়ে হলে মিহারু বলে ডাকবে।"

"হ্যাঁ, এরকম লোক আছে অনেক," হেসে মন্তব্য করি আমি। "খুব কিউট নিশ্চয়ই ও?"

"বেশিরভাগ সময় আমারও সেটাই মনে হয়।"

"বেশিরভাগ সময়?"

"হ্যাঁ। কারণ মাঝে মাঝে আমি নিজেকে বলি ওকে না জন্ম দিলেই ভালো করতাম," রক্তলাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে ও।

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখলাম। "বাচ্চা মানুষ করা সহজ কাজ নয়, সায়াকা। বিরক্ত লাগলে এরকম চিন্তা মাথায় আসতেই পারে।"

ভেবেছিলাম আমার কথায় হয়তো আপত্তি জানাবে ও। কিন্তু সায়াকা রাখঢাক না করেই বললো, "ঠিক বলেছ। একদমই সহজ নয়।"

মাথা নাড়ি আমি। "মিহারু কি খুব জ্বালাতন করে তোমাকে?"

"হ্যাঁ, সারাক্ষণ," ক্ষীণস্বরে বলে সায়াকা। "আমাকে সারাদিন ওর আউলানো জিনিস গোছাতে হয়।"

"আচ্ছা।"

"আমি কিন্তু এটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে মা হলে এসব করতেই হবে। ওর প্রতি ভালোবাসা ভুলিয়ে দিবে সবকিছু।"

"কিন্তু সেরকমটা হয়নি?"

"ওর জন্যে কিছুই অনুভব করি না আমি!" গুঙিয়ে ওঠে সায়াকা। "মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরতেও ইচ্ছে করে না। অন্য মায়েদের তো এরকম আচরণ করতে দেখিনি। মাঝে মাঝে নিজের মেয়ের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা কাজ করে। বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথা?"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয় এটা। এরকম উদাহরণ আরো আছে।"

"হ্যাঁ। তুমিই বলেছ সেটা।"

"আমি?" একটু সময় লাগলেও বুঝতে পারলাম কেন কথাটা বলেছে ও। চোখ বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। "তুমি ওটা পড়েই এসেছ আমার কাছে..."

“হ্যাঁ।”

বিজ্ঞান পত্রিকায় এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন লিখেছিলাম আমি।

“একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু নিপীড়নের ব্যাপারে লেখা দিতে হবে...” কয়েক মাস আগে সম্পাদক আমাকে এই জটিল কাজটা দেয়। “অ্যামেরিকায় প্রতি বছর বিশ লাখ শিশু বাবা-মা বা অভিভাবকের হাতে নিপীড়নের শিকার হয়। তাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মারা যায়। জাপানেও একই রকম ঘটনার উদাহরণ আছে। এক না এক সময় আমাদের এই ব্যাপারে কিছু বলতেই হবে,” আমাকে জোর করে সম্পাদক।

কিন্তু মানা করে দেই আমি। অজুহাতে বলি, একজন সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে এরকম জটিল এবং গুরুগম্ভীর একটা বিষয়ে কিছু বলাটা উচিত হবে না। কিন্তু বারবার জোর করতেই থাকে সম্পাদক। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাকি এই বিষয়ে প্রতিবেদন চাইছে অনেক দিন ধরে। অবশেষে রাজি হই আমি। বলি যে কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নিব। প্রধান সম্পাদক এই বিষয়ে প্রতিবেদন লেখাতে কেন এত আগ্রহী, তার জবাব পেয়ে যাই কিছুদিনের মধ্যেই। ভদ্রলোকের নিজের ভাগ্নি একজন শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। তার কাছ থেকেই তিনি এরকম নানা ঘটনা শুনে এখন নিজের পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপাতে চান। তাই প্রথমে ভদ্রলোকের ভাগ্নির সাক্ষাৎকারই নিই আমি।

শুরুটা মসৃণ না হলেও পুরো অভিজ্ঞতাটা যে খুব খারাপ ছিল, তা বলবো না। আধুনিক সমাজের গুরুতর একটা সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারি আমি। কিন্তু যে প্রতিবেদনটা লিখি, সেটা ছিল গড়পড়তা ধাঁচের। এর আগে এই বিষয়ে যেসব কাজ হয়েছে, সেগুলো থেকে খুব একটা আলাদা নয়। পাঠকেরাও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

এক সময় আমি নিজেই ভুলে যাই ওটার ব্যাপারে। সায়াকা যে এই প্রতিবেদনটা পড়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি আমি।

“প্রতিবেদনে একজন মা’র কথা বলেছিলে যে মাঝরাতে নিজের বাচ্চার গলা চেপে ধরে, কারণ সে কান্না থামাচ্ছিল না, তাই না? লেখাটা পড়ে চমকে গেছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমাকে নিয়েই লেখা হয়েছ।”

“তোমারও কি এরকমটা করতে ইচ্ছে হয়েছে কখনো?”

“হ্যাঁ, হয়েছে। ছোট বেলায় মিহারু রাতের বেলা অনেক কাঁদত। এক রাতে ও কেবলই কান্না শুরু করবে, এমন সময় কী করেছিলাম জানো? তোয়ালে পেঁচিয়ে ওর মুখে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। এটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ না যে আমার সমস্যা আছে?” নিজের প্রতি করুণা থেকেই যেন হাসলো সায়াকা। কিন্তু ওর চোখ এখনও ভেজা। “এটা তো শারীরিক নিপীড়ন, তাই না? তুমি এমন কিছুই লিখেছিলে।”

“শুধু এই একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু বলা উচিত হবে না,” সাবধানি কণ্ঠে বললাম।

শিশু নিপীড়নকে চার ভাগে ভাগ করা যায় শারীরিক নিপীড়ন, শিশুর প্রতি দায়িত্বে অবজ্ঞা, যৌন নিপীড়ন, মানসিক নিপীড়ন। অভিভাবকে কোনো কাজে শিশু যদি শরীরে কোনো প্রকার ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করে, তাহলে সেটা শারীরিক নিপীড়ন। সায়াকা এখন যে কথাটা বললো, এটা শারীরিক নিপীড়নের মধ্যেই পড়ে।

"গত কয়েক মাসের মধ্যে কিছু হয়েছে?"

"ওর পায়ে মেরেছি। মানে, হাঁটু ভাঁজ করে বসতে বলেছিলাম। এরপর থাইয়ের উপরে মারতেই থাকি। লাল হয়ে ফুলে গেলেও থামিনি।"

"কেন?"

"খাচ্ছিল না ও। বলেছিলাম চিপস জাতীয় খাবার না খেতে। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো ঠিকই খায়, এরপর রাতের বেলা আর কিছু মুখে তোলে না।"

"সেজন্যে শাসন করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"ও কান্না করার পরেও থামোনি?"

লম্বা একটা শ্বাস নিল ও। এরপর রোবটের মতন ধীরে ধীরে আমার দিকে ঘুরলো।

"ও কাঁদে না। মারলে ব্যথা লাগে নিশ্চয়ই, কিন্তু কান্নাকাটি করে না। মনে হয় যেন কমার অপেক্ষা করছে।"

"কী কমার অপেক্ষা করছে?"

"ঝড়," চুলে হাত বুলায় সায়াকা। "প্রতিবার এই একই ঘটনা। আমি রেগে গেলেই পাথরের মতন হয়ে যায় ও। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকায় কেবল। ওর চোখে ওরকম দৃষ্টি দেখে মাথা পুরোপুরি আউলে যায় আমার। যতক্ষণে হুঁশ ফেরে, ততক্ষণে মারতে মারতে দাগ ফেলে দিয়েছি।"

"কিন্তু কাজটা যে ঠিক করছো না, এটা তো বোঝো তুমি?"

"অবশ্যই বুঝি। কিন্তু নিজেকে থামাতে পারি না। তোমার কাছে হয়তো অদ্ভুত লাগছে শুনতে। কিন্তু এটাই সত্যি। ওর সামনে গেলেই নিজেকে যেন বুঝতে পারি না আমি। কী করা উচিত, সেই বুদ্ধি লোপ পায়। আমার মারের কারণে ওর পা ফুলে গেছে, এটা দেখে ভয় পেয়ে যাই," সায়াকা বলে। গাল এখনও ভেজা ওর। "আমার মাথায় সমস্যা আছে।"

"নাহ। এরকম আরো অনেক মানুষ আছে।"

সাক্ষাৎকারের সময় জানতে পারি-সত্তর শতাংশ মা, যারা ফোন দিয়ে সাহায্য চেয়েছে, নিজেদের নিপীড়ক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটা শুনে অনেকে বলতে পারে, তারা যেহেতু নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফোন দিয়েছে, তাহলে বাচ্চাকে নির্যাতন না করলেই হয়। কাউন্সেলরের মতে, এই ভাবনাটাই ভুল। যে মায়েরা ফোন দিয়েছে, তারা নিজেদের থামাতে পারে না বলেই ফোন দিয়েছে। যেমন,

রাগের চোটে বাচ্চাকে মাথায় করা আঘাতের ফলে সে অচেতন হয়ে গেলে তাকে হাসপাতালে মায়েরাই নিয়ে যায়। ভেতরে যখন বাচ্চাকে চিকিৎসা দেয়া হয়, তখন এই মা-ই বাইরে বসে কাঁদে। ফোনে তারা বলে যে এরকমটা চলতে থাকলে হয়তো এক সময় নিজের বাচ্চাকে মেরেই ফেলবে।

সায়াকা'কে একটু শান্ত হবার সময় দিলাম। এরপর বললাম, "তোমার স্বামী এই বিষয়ে কিছু জানে?"

"মনে হয় না," রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলে ও। "আমি ওকে কিছু বলিনি। আমি না বললে বাসায় কী হচ্ছে এই ব্যাপারে কিছু জানা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। না জানলেই ভালো। জানলে বাচ্চাকে আমার কাছে রেখে অ্যামেরিকায় যেতে পারত না।"

"তাকে বলোনি কেন?"

"কারণ..." সায়াকার কণ্ঠে দ্বিধা।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি।

নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছিল সত্যটা শুনলে স্বামী ভেবে বসবে যে ওর পক্ষে মেয়ের লালন পালন সম্ভব নয়। সায়াকার আত্মসম্মানের প্রতিও এটা হবে বড় একটা আঘাত।

"সে কখনো কিছু সন্দেহও করেনি? মিহারুকে দেখে?"

"মনে হয় না।"

"কেন?"

"কারণ মিহারু বাবার সামনে একদম লক্ষ্মী হয়ে থাকে। সব কথা শোনে। কোনো প্রকার দুষ্টুমি করে না। আমার জামাই এতেই খুশি। ও তো বলে যে অফিসের অন্য সহকর্মীদের একই বয়সি বাচ্চারা ভীষণ জ্বালায়। মিহারুর মত মেয়েকে যে পেয়েছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য। আসলে ও কিছুই জানে না। নিজের মেয়ের আসল রূপ সম্পর্কে ধারণা নেই বলেই এসব মন্তব্য করে।"

সায়াকার ঠোটের কোণের বাঁকা হাসিটা মেয়ের প্রতি ওর বিতৃষ্ণারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"কারো সাথেই এই বিষয়ে কোনো আলাপ করোনি?"

"না। কিন্তু আমি অনেক বই পড়েছি এসব বিষয়ে।"

"আচ্ছা।"

"যেসব মায়েরা বাচ্চাদের উপরে এরকম শারীরিক অত্যাচার চালায়, তাদের বেশিরভাগই বাজারে লব্ধ সন্তান লালন-পালন বিষয়ক বই অন্ধের মতন অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবে সবকিছু ওভাবে মেনে চলা সম্ভব হয় না কখনোই। অপ্রত্যাশিত সব সমস্যার সৃষ্টি করে বাচ্চারা। অনেকবার নিজেকে থামালেও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে একটা পর্যায়ে। তখন আবারও গায়ে হাত তোলে।

"মিহারু কতদিন ধরে দাদা-দাদির সাথে আছে?"

"দশ দিন হলো।"

“এর আগে তাহলে তোমরা দু’জনেই ছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“তখন কেমন ছিল পরিস্থিতি?”

“একদম বাজে,” বলে সায়াকা। “আমাদের এলাকায় একটা পরিবার আছে, যারা বাচ্চাদের দেখেশুনে রাখে। ওখানে ওকে দেয়ার কথাও ভেবেছি আমি। মিহারুর সাথে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ভয় হতো ভীষণ উল্টোপাল্টা কিছু না করে বসি।”

“সেজন্যেই ওকে শ্বশুর-শাশুড়ির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছ?”

“না,” মাথা ঝাঁকিয়ে বলে সায়াকা। “ওনারা এসে নিয়ে গেছে।”

“কী হয়েছিল?”

“ওই পরিবারের কাছে মিহারুকে মাঝে মাঝে রেখে আসতাম আমি তারাই যোগাযোগ করেছে আমার শ্বশুরের সাথে। ফোন নম্বর পেয়েছে আমার জামাইয়ের কাছ থেকে।”

“হঠাৎ ফোন দিল যে?”

“মিহারুর গায়ে দাগ দেখে ফেলেছিল ওরা।”

“দাগ?” প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। “তুমি আবার মেরেছিলে নাকি ওকে?”

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নাক ঝাড়ল সায়াকা।

“অনেক আগেই নাকি দেখেছে। মিহারু কিছু বলেনি, কিন্তু তারা আঁচ করতে পেরেছিল যে কোনো একটা সমস্যা আছে। তাই শ্বশুরকে ফোন দিয়েছিল।”

“মিহারুকে নিতে এসে তোমার শাশুড়ি কী বলেছিল?”

“এটাই যে, কম বয়সি মায়েদের অবসন্নতা থেকে এমনটা হয় মাঝে মাঝে। মিহারুকে কিছুদিন তারা দেখভাল করবে। স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বলেছিল সে, কিন্তু হাবভাবে বোঝাই যাচ্ছিল যে আমাকে বাচ্চা লালন-পালনের অযোগ্য ধরে নিয়েছে।”

“আর ওকে যেতে দিলে তুমি?”

“আর কোনো উপায় ছিল না। আমি আসলেই মা হবার যোগ্য নই।” এর জবাবে বলার মত কিছু খুঁজে পেলাম না। উইন্ডশিল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

“আমার শাশুড়ি ফোন দিয়ে সেদিন বললো যে মিহারু ওখানে ঠিকঠাকই আছে। তার কথাই হয়তো সত্যি। ভেবেছিলাম বাচ্চারা হয়তো মায়েদের ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু এটা আমার ভ্রম। বাচ্চার দেখাশোনা করতে হচ্ছে না, এজন্যে ভেতরে ভেতরে স্বস্তিবোধ করছিলাম, অস্বীকার করবো না। এই যে আমি এখন ফোন দিলাম, এমন নয় যে মিহারুর কথা মনে হচ্ছিল খুব। আসলে শ্বশুর-শাশুড়ি যেন কিছু বলার সুযোগ না পায়, সেজন্যেই ফোন করেছি।”

“এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু সবসময় নিজের দোষটাই চোখে পড়বে।”

আমার কথাগুলো ওর পছন্দ হলো বলে মনে হয় না। চুপ করে রইলো। “আমার প্রতিবেদনটা পড়ে কি কোনো লাভ হয়েছিল?”

“অনেক কিছু শিখেছি ওখান থেকে,” বলে সায়াকা। “বিশেষ করে, তুমি এক জায়গায় বলেছিলে মায়েদের নিজেদের শৈশবেরও একটা ভূমিকা আছে এরকম আচরণের পেছনে।”

“ওহ…”

আমি নিজেও অবাক হয়েছিলাম তথ্যটা জেনে। যেসব মায়েরা তাদের বাচ্চাদের শারীরিক নিপীড়ন করে, তাদের প্রায় পয়তাল্লিশ শতাংশ নিজেও নিপীড়নের শিকার। আর যদি তেমনটা না হয়ে থাকে, তাহলে শৈশবে একাকীত্বে ভুগেছে তারা। যেমন, বাবা ফেলে রেখে চলে গেছে বা মা অসুস্থ থাকত সবসময়-এরকম। সহজ কথায়, তাদের ভালোবাসার কেউ ছিল না।

যেহেতু নিজেদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে তারা ভালোবাসা পায়নি, তাই সন্তানদেরও ভালোবাসা দিতে অক্ষম সেই মায়েরা। এভাবে চিন্তা করলে বিষয়টা স্বাভাবিকই ঠেকবে। যে নারী কাউন্সিলরের সাথে কথা বলেছিলাম আমি, সে এমনটাই বলেছিল।

“প্রতিবেদনটা পড়ার পরই নিজের অতীত নিয়ে সন্দেহ জাগে আমার মনে। আমার শৈশব স্মৃতি বলতে কিছু নেই, এই কথাই মাথায় ঘুরতে থাকে প্রতিনিয়ত।”

“ওহ, তাহলে এই কথা।”

“কিন্তু আমার একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না, এজন্যেই তোমাকে ফোন দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো বুঝবে আমাকে। আসলে, তুমিই আমাকে সবচেয়ে ভালো চেন।”

“এসব কথা আমাকে আরো আগে বললেই পারতে।”

“সরি। আমার সাথে এখানে এসেছে, এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।”

“আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত তুমি।” ওর বাম হাতের কব্জির দিকে তাকালাম। ক্ষতস্থানে ডান হাত দিয়ে ডলছে ও।

“ঝোঁকের বসে কাজটা করি, মিহারুকে নিয়ে যাওয়ার পর।”

“একদমই ঠিক করোনি।”

“ক্ষতটা ওরকম গুরুতর না। শুধু চামড়া কেটেছে। ঘুমের ঔষধও খেয়েছিলাম। উঠে দেখি আর রক্ত ঝরছে না। নিজের জন্য নিজেরই খারাপ লাগছিল তখন।

“এই ধরনের চিন্তা আর মাথায় আনবে না।” সায়াকা কেন ঘুমের ঔষধ খেয়েছে, তা ভাবছি।

“না, আনবো না।”

গিয়ারে হাত রাখলাম।

“গাড়ি স্টার্ট দিব?”

“হ্যাঁ,” বললো সায়াকা। কিন্তু গাড়ি নিয়ে পার্কিং লট থেকে বের হব এসময় আমাকে থামালো ও। “দাঁড়াও।”

ব্রেক কষলাম।

“আমরা কি ফিরে যেতে পারি?” এক মুহূর্ত চুপ থাকার পর বলে ও।

“ফিরে যাব? বাড়িটায়?”

“হ্যাঁ,” গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে সায়াকা।

“কেন?”

চোখ নামিয়ে পায়ের উপরে সামনে পেছনে হাত ঘষতে থাকে ও।

“এভাবে ফিরে যেতে চাই না। আমার মানসিক সমস্যার কারণ যেহেতু এই বাড়িটাই, একদম গভীরে যেতে চাই বিষয়টার। টোকিওতে ফিরে ধীরে ধীরে মনে করার চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এই বাড়িতে গিয়ে সবকিছু আবারও দেখতে ভালো মতন, তাহলে স্মৃতি ফিরে পেতে পারি।” ওর কথাটা বুঝতে পারছি।

“যুক্তি আছে তোমার কথায়, কিন্তু আজ অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।”

“তোমার থাকতে হবে না, শুধু আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসো, বাকিটুকু আমি বুঝে নিব,” এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল সায়াকা। “তুমি চলে যাও।”

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে ভাবতে লাগলাম। ওর দৃঢ় কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। আমি কিছু বললে রাজি হবে না।

“এই বাড়িতে নির্ঘুম রাত কাটাবে?”

“শুধু এক রাতই তো। ব্যাপার না। “

“খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?”

“এক দিন না খেলে কিছু হবে না আমার।”

“শরীরের জন্যে তো ভালো না সেটা। চলো দেখি কোনো কনভেনিয়েন্স স্টোর পাই কিনা,” বলে ব্রেক থেকে পা সরালাম।

হাইওয়ে ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার পাশের একটা কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে স্যান্ডউইচ, ড্রিঙ্কস আর টর্চ কিনে বাড়িটার দিকে এগোলাম। বৃষ্টি ধরে এসেছে। তবে থেকে থেকে বজ্রপাতের শব্দ কানে আসছে দূর থেকে।

টর্চ জ্বেলে ঢুকে পড়লাম বাড়িটায়। বেজমেন্টে খুঁজে পাওয়া মোমবাতিটা জ্বেলে লিভিং রুমের কফি টেবিলের উপরে রাখলাম। বাতাস ঢুকছে কোনো এক ফাঁক দিয়ে। দোল খাচ্ছে আগুনটা, সেই সাথে দেয়ালে দোল খাচ্ছে ছায়াগুলো।

“একা থাকতে ভয় লাগবে না?” জিজ্ঞেস করি।

“সেটা বলতে পারছি না। লাগতেও পারে। কিন্তু আমি একটু চাপের মধ্যে থাকলেই বোধহয় ভালো,” সোফায় বসে বলে ও। ঠাট্টা করছে নাকি সিরিয়াস, সেটা বুঝতে পারলাম না। “ডায়রিটা কোথায়?”

“এই যে,” মোমবাতির পাশেই রাখা ছিল ওটা। “আর কিছু দরকার হবে তোমার? লাগলে নিয়ে আসব আমি।”

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সায়াকা। "চিন্তা করো না। আমি ঠিকঠাকই থাকবো।"

"আসি তাহলে।"

"আচ্ছা। ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করলে।"

ওকে বিদায় জানিয়ে দরজা খুললাম। পেছনে ফিরে দেখি, মোমের আলোয় সায়াকা আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে।

সেই মুহূর্তে আমার অনুভূতির কথা শুনলে হয়তো হাসবে অনেকে। ওকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। প্রচণ্ড দ্বিধায় ভুগছিলাম যে যাব কিনা কিন্তু থেকে গেলে ওর সাথে রাত কাটাতে হবে এখানে, যেটা শুরু থেকেই এড়াতে চাইছি আমি।

বেজমেন্ট একদম ঠাণ্ডা। এই বাড়িটা অদ্ভুত বললেও কম বলা হবে। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু শীতল নিস্তব্ধতা। এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্যে হলেও যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে চাই এখান থেকে। কিন্তু বাড়িটায় ঢোকা আর বের হওয়ার রাস্তা বেজমেন্টে বানানো হলো কেন?

দরজার সামনে গিয়ে হাতলে হাত রাখলাম। বাইরে বের হবার আগে অবচেতন মনেই একবার আলো ফেললাম দরজার উপরের ফ্রেমের দিকটায়। ধুলোর কারণে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছু একটা আছে ওখানে। হাত বাড়িয়ে ধুলো পরিষ্কার করলাম।

ছোট একটা ক্রুশ। কাঠ কুঁদে বানানো।

ক্রুশটা দেখার সাথে সাথে অস্বস্তি আরো গাঢ় হয়ে চেপে বসলো আমার মনে। এরকম একটা জিনিস কে এখানে লাগাবে?

দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ডানে ঘুরে উপরতলায় উঠে এলাম। করিডোর পার হয়ে লিভিং রুমে ঢুকে দেখি সায়াকা ডায়রিটা পড়ছে। অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো ও।

"কী হয়েছে?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর বললাম, আমিও থেকে যাব।

বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করলো সায়াকা।

"আমার জন্যে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।"

"চিন্তা করছি না," বলি। "আমিও জানতে চাই এই বাড়িটায় কী ঘটেছিল অতীতে।"

একদিকে ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ ভাবে সায়াকা।

"আরো স্যান্ডউইচ কিনলে ভালো হতো।" হাসি ফুটেছে মুখে।

"একদিন অল্প খেলে সমস্যা হবে না," বলে ওর পাশে বসে পড়লাম।

৪

ক্রুশটার ব্যাপারে জানালাম সায়াকা'কে। আমার মতই অবাক হলো ও। জিনিসটা দেখার জন্যে আবারও একসাথে নিচে নামলাম দু'জনে।

"আসলেই দেখি একটা ক্রুশ," দরজার উপরে টর্চের আলো ফেলে বলে সায়াকা। "এই পরিবারটা হয়তো খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু এর আগে কখনো কোথাও এভাবে পেরেক দিয়ে ক্রুশ আটকাতে দেখিনি।

"যদি আসলেও খ্রিস্টান হয়ে থাকে, তাহলে আরো ভালো একটা ক্রুশ লাগানো উচিত ছিল," মাথা কাত করে বললাম।

লিভিং রুমে ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর। ইউসুকের ডায়রিটা পড়তে হবে। আলো কম হওয়ায় আরো তিনটা মোমবাতি জ্বেলে নিলাম।

সায়াকা বললো আবারও প্রথম থেকে কোনো কিছু বাদ না দিয়ে পড়ে যেতে। দ্বিমতের কোনো কারণ নেই, হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে।

পড়তে পড়তে একটা সময় আবিষ্কার করলাম ইউসুকে যখন মে মাসের ৫ তারিখে প্রথম ডায়রি লেখা শুরু করেছিল, তখন সে প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ গ্রেডের শিক্ষার্থী। পরের বছরের এপ্রিল মাসে, নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে ছেলেটা লিখেছে, 'আজ থেকে আমি পঞ্চম গ্রেডের ছাত্র। এই পর্যন্ত উল্টোপাল্টা কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই ডায়রিতে। নিয়মিত পড়াশোনা করে ইউসুকে, বন্ধুদের সাথে সম্পর্কও ভালো। বাসার পরিবেশ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বছরের জুনে হঠাৎ পাল্টে গেল পরিস্থিতি।

'১৫ জুন, বৃষ্টি
আজ সন্ধ্যায় বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ঘরে হোমওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি। হঠাৎ শুনি মা চিৎকার করছে। গিয়ে দেখি মা'র পাশে শুয়ে গোঙাচ্ছে বাবা। মা বলেছিল রুমে ফিরে যেতে, কিন্তু চিন্তা হচ্ছিল বিধায় ওখানেই থেকে যাই। অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে নাকি জিজ্ঞেস করলে বাবা হাত নেড়ে ঝামেলা করতে মানা করে দেয়। বেরিয়ে যেতে বলে আমাদের। এই প্রথম বাবাকে ওভাবে চিৎকার করতে শুনলাম। তখন মা আমার হাত ধরে নিচে নিয়ে আসে। বাবা অসুস্থ কিনা জিজ্ঞেস করলে বলে চিন্তার কিছু নেই। আমি মা'র সাথে রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছি, এমন সময় বাবা নেমে আসে নিচে। ঘামে চুপচুপে হয়ে ছিল তার চুল। বাবা আমাকে কাউকে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার ব্যাপারে কিছু বলতে নিষেধ করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় যে

এটা ওরকম কোনো বিষয় নয়। বুকের ভেতরে ধুকপুক করছিল আমার, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

'২০ জুন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, হালকা বৃষ্টি
স্কুল থেকে ফিরে দেখি করিডোরের সামনে বাবার জুতা। সপ্তাহের মাঝখানে এই সময়ে তার অফিসে থাকার কথা। একটু অবাকই হয়েছিলাম। ব্যাগ নামিয়ে রেখে বাবার ঘরে গিয়ে উঁকি দেই। শার্ট-প্যান্ট পরেই বিছানায় শুয়ে ছিল সে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালে একবার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে চোখ খোলে বাবা, এরপর চোখ বন্ধ করে নেয়। খুব চিন্তা হচ্ছিল আমার। সন্ধ্যায় ইয়ামামোতো আমাকে দেখানোর জন্যে ওর ব্যাঙাচিগুলো নিয়ে এসেছিল। খুব ভালো লেগেছে দেখে। কিন্তু মন ভালো হয়নি।'

ডায়রির এই দু'টো এন্ট্রি পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে ইউসুকের বাবার শরীর খারাপ করেছিল সেই সময়ে।

"দেখেছ, শরীর খারাপ, কিন্তু ছেলেকে বুঝতে দিতে চাচ্ছে না লোকটা। এসব একদমই ভালো লাগে না আমার," সায়াকার উদ্দেশ্যে বলি। "আসলেও কি গুরুতর কিছু হয়নি, নাকি..."

"খারাপ কিছু?" আমার প্রশ্নটা শেষ করলো সায়াকা। "কিন্তু ইউসুকের ডায়রি পড়ে মনে হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরেই অসুখের ব্যাপারে জানত সে।"

"অ্যাম্বুলেন্স ডাকার কথা বললে ওরকম চিৎকার করলো কেন বুঝছি না।"

"অনেক দিন ধরে অসুস্থ হলে সেটার আরো আলামত থাকার কথা," যে পাতাগুলো পড়া হয়েছে, সেগুলো উল্টে গেল সায়াকা। খানিক বাদে ডায়রির একটা পাতার দিকে নির্দেশ করে বললো, "এদিকে দেখ।"

'১৫ মে, রোদ
আজকে রাতের খাবারে বিফ হট পটের আয়োজন করেছিল মা, মা, আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার। একেবারে অনেকগুলো মাংস খেয়ে ফেলেছিলাম প্রথমে, তাই মা সবজি খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার পিয়াজ ভালো লাগে না একদমই, তাই গুগুলো ফেলে দিয়েছিলাম বেছে। বাবার মাথাব্যথা করছিল, তাই রুমে ফিরে যায় খাওয়ার মাঝে। তার ভাগের মাংসও খাই আমি। পেট একদম ভরা।'

ডায়রির পাতা থেকে মুখ তুললাম। "মাথাব্যথার কথা লেখা আছে এখানে।"

“শুধু এখানেই না, এই জায়গায় দেখো।” আরেকটা পাতা দেখাল আমাকে ও। সেখানে লেখা-

> ‘২১ এপ্রিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আজকে স্কুল বন্ধ ছিল। ইয়ামামোতো, কানেই আর শিমিযুর সাথে ডজবল খেলেছি আমি বাসার সামনে। ফুটবলও খেলেছি কিছুক্ষণ। কিন্তু শব্দ বেশি করছিলাম দেখে মা বকুনি দেয়। বাবার শরীর একটু খারাপ তাই বিশ্রাম নিচ্ছিল ভেতরে। আমাদের হৈচৈ করতে মানা করে মা। তখন কানেইয়ের বাসায় যাই আমরা। অনেকগুলো গোল্ডফিশ আছে ওদের। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে চোখ বের করা বড় মাছটা।’

এরপর একটু খেয়াল করে পড়তেই বুঝতে পারলাম অনেক জায়গাতেই ইউসুকের বাবার শরীর খারাপের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইউসুকে বিষয়টাকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। জুনের ১৫ তারিখের এন্ট্রিতে প্রথম চিন্তিত হতে দেখা যায় তাকে।

বাকি লেখাগুলো পড়তে শুরু করলাম। জুনের ২০ তারিখের পর লম্বা সময় ইউসুকের বাবার খোঁজ মিলল না লেখায়। সেটা কি ইচ্ছেকৃত নাকি লিখে রাখার মতন কিছু ঘটেনি বলে, তা বলতে পারব না। আগস্ট মাসে মোড় বদলে গেল ঘটনার।

> ‘১০ আগস্ট, রোদ
> মা আর আমি বসে তরমুজ খাচ্ছিলাম, এসময় বাবার অফিস থেকে ফোন আসে। শরীর বেশি খারাপ করায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। তখনই বেরিয়ে যায় মা, আমিও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা বলে বাসায় অপেক্ষা করতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি, কিন্তু মা আসেনি। সন্ধ্যায় অবশেষে যখন ফেরে, তখন বাবার অবস্থা জানতে চাই আমি। মা বলে চিন্তা না করতে। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে। বাবা ঠিক আছে তো?’

> ‘১১ আগস্ট, রোদ
> মা আর আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। নার্স বললো বাবা নাকি গতকাল পুরোটা সময় ঘুমিয়েছে। আমাদের দেখে হাসি ফোটে তার মুখে। বাবা তখন আমাকে বলে যে সে ঠিক আছে। আসলেও ভালো দেখাচ্ছিল তখন। একটু স্বস্তি পাই আমি। কিন্তু বাসায় ফেরার পথে মা বলে বাবাকে নাকি

হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হবে। বাবার কী অসুখ হয়েছে জানতে চাইলে মা জবাব দেয় যে চিন্তা করার মত কিছু হয়নি।'

'১২ আগস্ট, রোদ
গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে যে বাড়ির কাজ দিয়েছিল, সেগুলো সকালেই করে ফেলেছি আমি। দুপুরে মা'র সাথে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাবার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। মা কী নিয়ে যেন ডাক্তারের সাথে কথা বললো অনেকক্ষণ। একটু পর শুনি বাবা ঘুমাচ্ছে, তাই দেখা করা যাবে না। বাসায় ফিরে অনেক জায়গায় ফোন করেছে মা, কাঁদছিল ভীষণ। ভয় লাগছে আমার।'

'১৩ আগস্ট, রোদ
আজকে মা একাই গিয়েছিল হাসপাতালে। আমি বাসায় একা ছিলাম। ওটাই আন্টি এসেছিল দুপুরবেলা। আমাকে নুডলস রান্না করে খাইয়েছে। তার কাছে বাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে আন্টি বলে বাবা ঠিকই আছে, খুব দ্রুত ফিরে আসবে বাসায়। মা যে কাঁদছিল, এটা তাকে বলি আমি। ওটাই আন্টি চুপ করে ছিল শুনে। আমি আবারও বাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু এবারে আর কিছু বলেনি সে।'

এই সময় প্রায় প্রতিদিনই ডায়রি লিখেছে। বেশিরভাগ কথাই তার বাবাকে নিয়ে। প্রথমে সে ধরে নিয়েছিল যে বাবা অসুস্থ, কিন্তু অসুস্থতার মাত্রা যে এত বেশি, তা বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে ভয় দানা বাধতে থাকে ছেলেটার মনে। মা-ও পরিষ্কার করে কিছু না বলায় আরো বেশি চিন্তায় পড়ে যায়।

সেপ্টেম্বর নাগাদ দ্বিতীয় সাময়িক শুরু হয়ে যাওয়ায় বাবার ব্যাপারে খুব বেশি লেখার সময় পায়নি ইউসুকে। তখনও হাসপাতালে ছিল সে। ইউসুকে তার অনুপস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়।

কিন্তু বাবাকে ভোলেনি সে। সপ্তাহে দুই তিনবার গিয়ে দেখে আসে। বেশিরভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটান মি. মিকুরিয়া। কিন্তু জেগে থাকলে ছেলের সাথে এমন ভাবে গল্প করেন যেন কিছুই হয়নি।

'২০ সেপ্টেম্বর, মেঘ
আজকে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বিছানায় বসে একটা বই পড়ছিল সে। আইনের মোটা বই। বাবা এখন লম্বা সময়

ধরে কিছু পড়তে পারে না, তাই বিরতি দিয়ে পড়ে। বই না পড়লে নাকি তার ভালো লাগে না। আসলে আগে থেকেই পড়তে খুব ভালোবাসে বাবা, তাই এটাই স্বাভাবিক। বাবা সবসময় বলে যে বেশি বেশি পড়া উচিত সবার। অলসতা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। আমিও বাবার মত বড় আইনজীবি হতে চাই। অঙ্কে একশোতে নব্বই পেয়েছি শুনে বকা দিয়েছে আমাকে। পরের পরীক্ষায় যে করেই হোক পুরো নম্বর পেতে হবে।'

বাবা হিসেবে বেশ কঠোর লোকটা, ভাবি আমি। কিন্তু শরীর দুর্বল হলে মনও এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইউসুকে এখনও জানে না ওর বাবার কী হয়েছে, কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছে। অক্টোবরে এই বিষয়ে প্রথম লিখেছে সে।

'৯ অক্টোবর, রোদ
স্কুল শেষে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখনও ঘুমাচ্ছিল বাবা। তার বিছানার পাশে বসে একটা বই পড়েছি। বাবা চোখ খোলার পর জিজ্ঞেস করি যে ঘুম হয়েছে কিনা। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না যেন। কথাও শুনতে পারছিল না। শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ, যেন তার শরীর থেকে তার আত্মা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা একবার আমাকে বলেছিল আত্মা বলতে আসলে কিছু নেই। মানুষ তার ব্রেইনের মাধ্যমে সবকিছু করে। তাহলে কি বাবার ব্রেইনে কিছু হয়েছে?'

ব্রেইন?

ইউসুকের আন্দাজ যুক্তিসঙ্গতই মনে হলো আমার কাছে। এর আগের এন্ট্রিগুলোয় আমরা পড়েছি, প্রায়ই মাথাব্যথায় ভুগত লোকটা। "ব্রেইনে কী কী অসুখ হতে পারে?" সায়াকা জিজ্ঞেস করে। "অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন টিউমর," জবাবে বলি আমি "ব্রেইন টিউমর..." ঢোঁক গেলে সায়াকা। "তাহলে তো সুস্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। দেখি কী হয়।" আবারো ডায়রি পড়তে শুরু করলাম আমরা।

'২৪ অক্টোবর, মেঘ বাবা টানা পাঁচ দিন ধরে ঘুমাচ্ছে। মা প্রতিদিনই হাসপাতালে যায়, কিন্তু বাবার জ্ঞান ফেরে না। ডাক্তার আংকেলও বলতে পারেনি কবে ঘুম ভাঙবে বাবার।'

‘২৬ অক্টোবর, বৃষ্টি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন
বাবার জ্ঞান ফিরেছে শুনে হাসপাতালে গিয়েছিলাম আজকে। কিন্তু তার সাথে দেখা হয়নি। মা একা ঢুকেছিল ওয়ার্ডে। ফিরে এসে বলে ঠিক আছে বাবা। কিন্তু সেটা কি সত্যি?’

‘৩০ অক্টোবর, হালকা মেঘ
আজকে বাবার সাথে দেখা হয়েছে। মা আর আমি দুপুরের দিকে গিয়েছিলাম। পথে ফলের দোকান থেকে ফল কিনি আমরা। আগের মত আর দাঁড়াতে পারে না বাবা। সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। ওজন কমে গেছে। মা বলেছে ঘুমের সময় খেতে পারেনি দেখে এমন হয়েছে। আপেল ছোট ছোট টুকরো করে কেটে খাওয়াতে হচ্ছিল বাবাকে। অনেকক্ষণ ধরে চিবুনোর পর একবার শুধু ‘মজা’ বলেছিল বাবা। কিন্তু ভালো করে শুনতে পাইনি আমি।’

এই পর্যায়ে ইউসুকের বাবার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ডায়রিতে প্রায়ই ‘কোমায় চলে গেছে’, ‘লম্বা ঘুম’ জাতীয় কথা দেখতে পাই আমরা।

নভেম্বরের মাঝ দিকে অবশেষে ইউসুকের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় তার মা।

‘১০ নভেম্বর, বৃষ্টি
আজকে রাতের খাবারের পর মা আমার সাথে বাবার অসুস্থতা নিয়ে কথা বলেছে। বাবা আসলে খুবই অসুস্থ, পুরোপুরি সেরে উঠবে না কখনোই। তখন আমি জিজ্ঞেস করি বাবা মারা যাবে কিনা। ‘হ্যাঁ’ বলে কাঁদতে শুরু করে মা। আমিও কেঁদেছি। তখন মা বলে বাবার সামনে এভাবে কাঁদা যাবে না। তাহলে সে-ও ভেঙ্গে পড়বে। আমি কথা দিয়েছি বাবার সামনে কাঁদব না।’

‘১১ নভেম্বর, রোদ আজ সারাদিন মাথাব্যথা করেছে। কালকে রাতে ঘুমাইনি, এজন্যেই বোধহয়। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে বাবা মারা যাবে।’

‘১২ নভেম্বর, রোদ

মা আর আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বাবা জেগে ছিল পুরো সময়, কিন্তু আমাদের দিকে তাকায়নি একবারের জন্যে। আমি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জবাব দেয়নি। মা তার ডায়পার বদলে দিয়েছে।'

'২০ নভেম্বর, মেঘ
আজকের জাপানি সাহিত্য ক্লাসের সময় একজন তরুণ টিচার দরজা খুলে আমাদের টিচারকে বাইরে ডেকে নেয়। একটু পর আমাকে ডেকে নিয়ে যায় জাপানি সাহিত্যের টিচার। হাসপাতালে বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে, আমাকে নাকি তক্ষুনই যেতে হবে। স্কুলব্যাগ রেখেই বেরিয়ে যাই আমি। হাসপাতালে পৌঁছে দেখি মা কাঁদছে। বাবা মারা যায়নি। কিন্তু ডাক্তার বলেছে কোনোমতে বেঁচে গেছে সে। শুনে মন থেকে চিন্তা দূর হয় আমার। কিন্তু মা তখনও কাঁদছিল।'

সেই দিনের পরে আতঙ্কে কাটতে থাকে ইউসুকের দিন। কখন খারাপ খবর আসে হাসপাতাল থেকে! ডিসেম্বরে অবশেষে সেই দিনটা এলো। সেদিন ডায়রিতে কেবল এক লাইন লিখেছে ইউসুকে।

'৫ ডিসেম্বর, রোদ বাবা মারা গেছে আজকে।'

ছেলেটার মনের কষ্ট প্রকাশের জন্যে এই একটা বাক্যই যথেষ্ট। এরপর এক মাস ডায়রিতে কিছু লেখেনি সে। এই সময়ে নিশ্চয়ই শেষকৃত্য এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সারতে হয়েছে। সেগুলো নিয়ে কিছু লেখার মত শক্তি ছিল না ইউসুকের।

বেশ কয়েকটা খালি পাতা। এরপর নতুন বছরের জানুয়ারির ৭ তারিখে আবার একটা এন্ট্রি দেখতে পেলাম।

'৭ জানুয়ারি, রোদ
ওই লোকটা এসেছে আমাদের বাসায়। মা বলেছে এখন থেকে নাকি আমাদের সাথেই থাকবে। আমি একদমই চাই না সেটা। বাবা সবসময়ই বলে এসেছে যে লোকটা আস্ত একটা গর্দভ। আমাকে কোনো ভাবেই তার মত হওয়া যাবে না। বিকেলে আমি রুমে ছিলাম, তখন নক না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ে সে। আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি পড়াশোনার

সময় আমাকে বিরক্ত না করতে। তখন চলে গেছে। এখন থেকে আমার ঘরে ঢুকলে এই কথাই বলবো।'

এখানেই প্রথমবারের মত নতুন আগন্তুককে 'ওই লোকটা' হিসেবে উল্লেখ করেছে ইউসুকে।

"আমার মনে হয় এই লোকই বড়দিনে উপহার পাঠিয়েছিল ইউসুকে'কে," সায়াকা বলে। "ইউসুকের বাবা উপহারের ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিল, মনে আছে? আবার ভদ্রলোক এটাও বলেছে যে 'কোনভাবেই তার মতন হওয়া যাবে না'। এটা পরিষ্কার যে লোকটাকে একদমই পছন্দ ছিল না তার।"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু ইউসুকে আর ওর মা এই লোকটার সাথে কেন থাকবে?"

"এটুকু পড়ে তা বলা সম্ভব না," বলে পাতা উল্টে চললো সায়াকা। "দেখো! লোকটা ওদের বাসায় এসে উঠেছে।"

পাতাটার দিকে তাকালাম আমি। জানুয়ারির ১৫ তারিখ। সেইজিন নো হি[4] দিবস সেদিন।

'১৫ জানুয়ারি, রোদ
লোকটা একটা বড় ট্রাকে করে তার মালপত্র নিয়ে এসেছে এখানে। নিচতলার বেডরুমটায় থাকার ইচ্ছা তার। ওখানেই রেখেছে সবকিছু। সে কেন আমাদের সাথে থাকবে, এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম মা'কে। তখন মা বলে যে আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি লোকটা এসেছে। আমি আসলে বুঝতে পারছি না সেই 'ভালো 'টা কী হতে পারে। এরকম একটা লোককে বাসায় চাই না আমি। কিন্তু চামি অনেক আদুরে, ওকে পেয়ে ভালো লাগছে। শুধু চামিকে আমাদের কাছে দিয়ে গেলে ভালো হতো।'

এই লেখাটা বিভ্রান্তিকর ঠেকল আমার কাছে।

"ইউসুকের মা বলেছে তাদের ভালোর জন্যেই এসেছে লোকটা। এটার মানে কী?"

"পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা ইউসুকের সৎ বাবাও হতে পারে।"

"মানে ইউসুকের মা আবার বিয়ে করেছে? অসম্ভব। এক মাসও হয়নি তার স্বামী মারা গেছে।"

"জানি, কিন্তু এরকমটাই মনে হচ্ছে কেন যেন।"

"একটু বেশিই ভেবে ফেলেছ এবারে।"

"হয়তো..." সায়াকার অভিব্যক্তিতেও বিভ্রান্তি I

"তবে এখন এটা নিশ্চিত যে চামি নামের বিড়ালটা ওই লোকই এনেছে," ডায়রির পাতা উল্টে বললাম।

এরপর লম্বা একটা সময় 'ওই লোকটা'র ব্যাপারে কোনো কিছু লেখেনি ইউসুকে, কেবল স্কুল আর বন্ধুদের বিষয়ে লিখেছে। তবে চামির উল্লেখ আছে বেশ কয়েকবার। ইচ্ছেকৃতভাবেই লোকটার ব্যাপারে আলাপ করা থেকে বিরত থেকেছে ছেলেটা।

মার্চের এন্ট্রিগুলো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। ঘাড় লেগে আসায় মাথা এদিক ওদিক করলাম কয়েকবার।

"একটু বিশ্রাম নেই আমরা? তোমাকে দেখেও ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কিছু খাই চলো।"

"আচ্ছা।"

কনভেনিয়েন্স স্টোরের ব্যাগটা থেকে একটা ক্যানড কফি আর কোকের বোতল বের করলো সায়াকা। অনেক দিন পর বোতলের কোক দেখলাম। মাথায় কর্ক ক্যাপ এটার। সায়াকাকে এই কথা বললে ভ্রু কুঁচকে তাকালো শু।

"আমি একটা গাধা। বটল ওপেনার তো কিনিনি।"

"রান্নাঘরে আছে হয়ত।"

"আমি গিয়ে দেখছি," টর্চ হাতে সেদিকে গেল সায়াকা। মিনিট দুয়েক পর ফিরে এলো রান্নাঘর থেকে।

"ওপেনার পেয়েছ?"

"হ্যাঁ," বলে হাত নেড়ে জিনিসটা আমাকে দেখাল ও। "কিন্তু একটা বিষয়ে একটু খটকা লাগছে। আমার সাথে আসবে?"

"কী হলো?" উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"নিজেই খুলে দেখো," রান্নাঘরের ছোট ফ্রিজটার দিকে ইঙ্গিত করলো ও। ২০ বছর আগে বাসা-বাড়িতে এই ধরনের ফ্রিজই ব্যবহৃত হতো। এরকম ডিজাইন ছোটবেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দিল।

ফ্রিজের দরজা খুললাম আমি। বিদ্যুৎ না থাকায় কাজ করছে না কম্প্রেসর। কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করলাম ভেতরে নানা রকমের খাবার সাজানো। ক্যানজাত খাবার, ক্যানজাত ড্রিঙ্কস। কর্নড বিফ, ফ্রুট জেলি, কারি আর এবং জ্যুস।

"এখানে খাবার রাখা কেন? তোমার কী মনে হয়?" সায়াকা জিজ্ঞেস করলো।

"হয়তো এখানে যারা থাকত, তারা চলে যাওয়ার সময় নিতে ভুলে গেছে।"

"কিন্তু তারিখগুলো দেখ।"

"তারিখ?" একটা জ্যুসের ক্যান দেখে উৎপাদনের তারিখ দেখলাম। দুই বছরের পুরোনো।

"আমার মনে হয় বাবা এটা রেখেছে এখানে।"

"হতে পারে। তখন হয়তো বিদ্যুতও ছিল। "

"সেক্ষেত্রে খাবারগুলো কার জন্যে? সবই তো ক্যানজাত খাবার।"

"হুম..." যুতসই কোনো জবাব মাথায় এলো না। আমতা আমতা করতে লাগলাম।

"একটা বিষয়ে নিশ্চিত আমি, বাবা এগুলো খায়নি।"

"একথা মনে হচ্ছে কেন?"

"কারণ কর্নড বিফ ভীষণ অপছন্দ তার," আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো সায়াকা।

লিভিং রুমে ফিরে এসে হালকা খাবার খেয়ে নিলাম আমরা। সায়াকা কোক খেল আর আমি কফি ও স্যান্ডউইচ। ফ্রিজে কেন খাবারগুলো রাখা হয়েছে, তা দু'জনের একজনও বুঝতে পারছি না।

"ডায়রির লেখার বিষয়ে যদি বলতে হয়," এক হাতে কোক নিয়ে বললো সায়াকা। "সেখানে লেখা 'নিচতলার ঘরটায় থাকার ইচ্ছা তার।' কোনো ঘরের কথা বলেছে ইউসুকে?"

"জাপানি নকশার ঘরটা।"

"কিন্তু ওখানে তো মনে হয় মেহমানদের আপ্যায়ন করা হতো। এরকম ঘরে সাধারণত কেউ থাকে না।"

"বুঝলাম, কিন্তু ডায়রিতে তো কেউ মিথ্যে লিখেনা। হয়তো কোনো বিশেষ কারণে ঘরটা বেছে নিয়েছিল লোকটা।"

"তাই মনে হয় তোমার?" কোকের বোতলটা মুখের কাছে নিয়েও শেষ মুহূর্তে নামিয়ে নিল সায়াকা। "উপরের ঘরটাও আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। ইউসুকের বাবা তো মারা গেছে, তাই না? তাহলে স্যুটটা ওভাবে ঝুলছে কেন। ডেস্কেরও কোনো কিছু সরানো হয়নি।"

"অনেকেই কিন্তু পরিবারের কেউ মারা গেলে তার ঘরটা আগের মতনই রেখে দেয়।"

"কিন্তু... কোন একটা সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।"

"ডায়রিটা পড়ি চলো, তাহলে বোঝা যাবে।" বাকি স্যান্ডউইচটুকু মুখে পুড়ে আবারও তুলে নিলাম ডায়রিটা। ইউসুকে ষষ্ঠ গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে ইতোমধ্যে। 'ওই লোকটা'কে নিয়ে আবারও লিখতে শুরু করেছে সে, কিন্তু এবারে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে পরিস্থিতিতে।

> '১৫ এপ্রিল, মেঘ
> রাতের বেলা আমার রুমে বসে আছি, এমন সময় লোকটা হুট করে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে তার ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কাছে উল্টোপাল্টা কিছু বলেছি কিনা আমি। জবাবে বলি যে যা সত্য, সেটাই বলেছি। রাগে লাল হয়ে যায়

তার চেহারা। আমাকে জোরে থাপ্পড় দিয়েছে একটা। বরফ লাগানোর পরেও জ্বলছে। '

'৩০ এপ্রিল, হালকা বৃষ্টি
স্কুল থেকে ফিরে দেখি সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা। তাকে না দেখার ভান করে সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ি। তখন হঠাৎই রেগে যায় সে। আমি নাকি তার দিকে তাকিয়ে গালাগালি করেছি। বলি যে আমি ওরকম কিছু করিনি; তবুও আমার পেটে জোরে লাথি মেরেছে। ভাগ্যিস তখন ফোন বাজছিল, নাহলে আরো মার খেতে হতো আমাকে। মা ইদানিং আমাকে আর বাঁচায় না।'

'৫ মে, রোদ
বাসায় থাকতে ইচ্ছে করছিল না, তাই বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম খেলতে। বাসায় ফিরে দেখি মা কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলেনি। রাতের বেলা গলা পর্যন্ত মদ গিলে বাসায় আসে লোকটা।

যতই সামনের দিকে এগোচ্ছি, লোকটার পরিচয় নিয়ে ততই বিভ্রান্ত হচ্ছি আমরা। উঠতে বসতে ইউসুকে'কে মারে সে, আবার এই বাড়িতেই থাকে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় নয়, এটা নিশ্চিত।

"তোমার ধারণাই ঠিক মনে হচ্ছে এখন। এরকম উদাহরণ আরো আছে। মা আবার বিয়ে করলে অনেক সৎ বাবাই আগের পক্ষের সন্তানকে মারধোর করে, দুর্ব্যবহার করে।"

"সেজন্যেই তো বলেছিলাম তখন।"

"তাই বলে এত তাড়াতাড়ি আবার বিয়ে করবে মহিলা? এটা মানতে পারছি না আমি।"

"আমিও না।" ডায়রিটা হাতে নিয়ে পরের পাতা পড়লো সায়াকা। চেহারার অভিব্যক্তি নরম হয়ে এলো এবারে। "ইউসুকে চামিকে খুব পছন্দ করে।"

"কিছু লেখা আছে নাকি?"

"হ্যাঁ। ৭ মে, বৃষ্টি। আজকে কাগজের বল বানিয়ে চামির সাথে খেললাম। প্রথমে বল ধরতে পারছিল না ঠিক মত, এখন একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে।"

"বিড়াল কি বল দিয়ে খেলতে পারে?"

"হ্যাঁ, সামনের থাবা দু'টো দিয়ে ধরে। আমার বন্ধুর বিড়ালকে দেখেছি খেলতে।"

“ওহ। যাইহোক, বাড়ির নতুন বাসিন্দারা ইউসুকের জীবনে বেশ বড় প্রভাব ফেলেছে। ডায়রিতে কিন্তু এখন আর অন্য কারো ব্যাপারে কিছু লেখে নাও, খেয়াল করেছো?”

“হ্যাঁ। কিন্তু এখানে অনেক দিন পরে ওটাই আন্টির ব্যাপারে লিখেছে...” হঠাৎ জমে গেল সায়াকা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেখাগুলোর দিকে।

“কী লেখা এখানে?”

জবাবে আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ডায়রিটা এগিয়ে দিল সায়াকা। খোলা পাতাটার দিকে তাকালাম। ১১ই মে ছিল সেদিন।

> ‘১১ মে, রোদ সন্ধ্যায় ওটাই আন্টি এসেছিল তার মেয়েকে নিয়ে। চামির সাথে নাকি দেখা করতে চায় সে, তাই ঘরে গিয়ে চামিকে নিয়ে আসি। ওটাই আন্টির মেয়ে এত মিষ্টি করে ‘হ্যালো, আমার নাম সায়াকা’ বললো!’

দম আটকে এলো আমার। বিস্ফারিত নয়নে তাকালাম সায়াকার দিকে।

তৃতীয় পর্ব

১

লম্বা একটা সময় কথা না বলে একে-অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। সায়াকাই প্রথমে মুখ ফিরিয়ে নিল।

“তুমিই এটা। একই নামে অন্য কেউ এখানে আসবে, এটা হতে পারে না।”

সোফা ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি শুরু করলো সায়াকা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে একটু পর পর। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে জোরে।

“এখানে আগেও এসেছি আমি।”

“সেটাই তো মনে হচ্ছে।”

“তাহলে...” হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ও। “দেজা ভ্যু নয়, অদ্ভুত অনুভূতিটা এজন্যেই হচ্ছিল।”

“একটু আগে বলছিলে যে কারও সাথে এখানে এসেছ তুমি। সে ওটাই আন্টি-ই হবে।”

কপালে হাত রাখলো সায়াকা। ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করছে কিছু একটা। খানিক বাদে বললো, “তাহলে ইউসুকের ওটাই আন্টিই আমার মা।”

“হ্যাঁ, তোমার মা’র নাম কী যেন?”

“টামিকো।”

“টামিকো, আচ্ছা,” মাথা নাড়লাম আমি। “সবাই নিশ্চয়ই ও-টামি ডাকত তাকে। সেটা উচ্চারণ করতে পারত না দেখে ওটাই করে নিয়েছে ইউসুকে।”

“ওটামি আন্টি...” বিড়বিড় করে বলে সায়াকা, এরপর মাথা তুলে তাকায় আমার দিকে। “তার মানে আমার মা এখানে আসত।”

“সেটাই মনে হচ্ছে। আর ডায়রির লেখাগুলো ইঙ্গিত করছে যে এক সময় এই বাড়িতে কাজও করতো সে।”

ঘাড় কাত করে মোমবাতির দিকে তাকালো সায়াকা। অধরা স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই।

“তোমার মা’কে কি কখনো এরকম কিছু করতে শুনেছ?” জিজ্ঞেস করি। কোনো প্রকার ইতস্তত না করেই মাথা ঝাঁকায় ও।

“নাহ। আসলে তার বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানি না আমি।” দুর্বল একটা হাসি ফুটলো ওর মুখে।

কিছু না বলে আবারও ডায়রিটার দিকে তাকালাম।

“যাইহোক, তাহলে আমার ধারণাই সম্ভবত ঠিক। ইয়োকোহামায় যাওয়ার আগে এখানে থাকতে তোমরা।”

“কিন্তু বাবা এই বাড়িটার ব্যাপারে আমাকে কখনো কিছু বলেনি কেন? এখন তো মনে হচ্ছে আমার জীবনে এই বাড়িটার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা আছে।”

“হয়তো ঠিক এই কারণেই বলেনি।”

“হয়তো,” বলে ধীরে ধীরে ডায়রিটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ও। “ওটাই আন্টি...” ফিসফিসিয়ে বলে যে পাতাগুলো পড়া হয়ে গেছে সেগুলো আবারও দেখলো ও। “এই কথাগুলো আমার মা'কে নিয়েই লেখা হয়েছে। তরমুজ ভালো চিনত, ইউসুকের জন্যে মাঝে মাঝে এসে রান্না করে দিয়ে যেত।”

ওর চেহারায় এখন একই সাথে দু'টো অনুভূতির মিশ্রন। ছোটবেলায় হারানো মায়ের ব্যাপারে অজানা কিছু তথ্য যেমন আনন্দের খোরাক হয়ে এসেছে, তেমনি সেই সময়কার কোনো স্মৃতি না মনে করতে পারার বিষয়টা খুব পীড়া দিচ্ছে। এমনকি মায়ের চেহারাটাও মনে করতে পারছে না ও। চুপ করে বসে রইলাম আমি। ওটাই আন্টিকে নিয়ে লেখাগুলো পড়ে চলেছে সায়াকা, সেটাই দেখছি।

প্রথম পাতায় ফেরার পর ডায়রিটা আবারও টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখলো ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরবে।

“মনে হচ্ছে মা খুব হাসিখুশি থাকত সবসময়...”

“তোমার স্মৃতি কি অন্য কথা বলছে?”

“আসলে আমি মা'কে বেশিরভাগ সময় অসুস্থই থাকতে দেখেছি তো -”

“ডায়রিতে কিন্তু ওটাই আন্টির অসুস্থতার ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।”

“আমিও এটাই ভাবছিলাম,” হাতের উপরে থুতনি রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বলে সায়াকা।

আবারও ডায়রিটা খুললাম। এবারে, কিছুদূর পরপরই 'সায়াকা' নামটা দেখা গেল।

> '২০ মে, মেঘ, বৃষ্টি স্কুল থেকে ফিরে আমাদের বাসায় খেলতে এসেছিল সায়াকা। চামির পেছন পেছন ঘুরে বেড়িয়েছে গোটা বাসায়। চামিও একজন খেলার সাথি পেয়ে খুশি।'
>
> '১ জুন, বৃষ্টি আমি ঘরে পড়াশোনা করছিলাম, এসময় হঠাৎ নক না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ে সায়াকা। চামিকে খুঁজছিল নাকি। সরিও বলেছে। সায়াকা এলে বাড়িটা গমগম করে।'

“ইউসুকে আর মিকুরিয়া পরিবার তোমাকে পছন্দ করতো, বোঝাই যাচ্ছে,” ডায়রির লেখাগুলো সায়াকাকে দেখালাম।

“আমার পরিবার নিয়ে কিছু লিখেছে?”

“এখন পর্যন্ত তো লেখেনি, আরেকটু পড়ে দেখি।”

কিন্তু সায়াকার পরিবারের ব্যাপারে কিছুই নেই ডায়রিতে। যতই পড়ছি, ততই মনে হচ্ছে যে ভেতরের লেখাগুলো আবর্তিত হয়েছে কেবল ইউসুকের পরিবারকে ঘিরে। বিশেষ করে ওর বাবার মৃত্যুর পর থেকে অন্য কারো সম্পর্কে খুব বেশি উল্লেখ করেনি ছেলেটা। আর সেটা যে ওই লোকটার উপস্থিতির কারণে, তা আমাদের বলে দিতে হবে না।

‘২৬ জুন, বৃষ্টি
ওই লোকটা আজ সারাদিন মদ গিলেছে। তাই আমি চেষ্টা করেছি প্রয়োজন না পড়লে ঘর থেকে না বেরুতে। ভেতর থেকে ছিটকানি আটকে রেখেছিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাতে শুরু করে জানোয়ারটা। ‘খোল্, খোল’ বলে চিৎকার করছিল। যদি খুলতাম, কী করতো কে জানে। সে শান্ত হয়ে আসার পরেও লম্বা একটা সময় বাথরুমেও যাইনি ভয়ে।’

‘১০ জুলাই, মেঘ
রাতের খাবার খাচ্ছি, এসময় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে লোকটা। ঘরে আসার জন্যে দাঁড়িয়েছি কেবল, অমনি ‘কই পালাচ্ছিস?’ বলে জোরে ধাক্কা দেয় আমাকে। আরেকটু হলেই ব্যথা পেতাম ভীষণ। মা থামানোর চেষ্টা করলে আরো রেগে যায় লোকটা। টেবিলের সবকিছু ছুড়ে ফেলে। মাথায় আসলেই সমস্যা আছে তার।’

লোকটার এরকম খারাপ ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ডায়রি জুড়ে সেটারই প্রমাণ।

‘১২ আগস্ট বৃষ্টি
ওই লোকটা মরে না কেন? কী সুন্দর দিন হাসিখুশি দিন কাটাচ্ছিলাম আমরা। এখন সব পণ্ড হয়ে গেছে।’

‘৩১ আগস্ট, রোদ বাঁচলাম! আজ গরমের ছুটি শেষ। স্কুলে গেলে অন্তত হারামিটার চেহারা দেখতে হবে না। সাপ্তাহিক ছুটি না থাকলেই ভালো হতো।’

‘৮ সেপ্টেম্বর, প্রথম বৃষ্টি, এরপর রোদ আজকে আবার ক্ষেপেছিল লোকটা। কেন এভাবে হঠাৎ রেগে গেল জানি না। চিৎকার করছিল পাগলের মত, গ্লাস ভাঙছিল। আমি

> পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার দিকে একটা কাঁচের অ্যাশট্রে ছুড়ে মারলে মাথায় এসে লাগে। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ফুলে গেছে অনেকটা। রাগ করে তার দিকে তাকালে ছুটে এসে আমার কোমড়ে লাথি মেরেছে। মা পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।'

ইউসুকের উপরে চলমান নির্যাতনের কথা পড়তে পড়তে একটা ভাবনা মাথায় এলো। সায়াকার দিকে তাকালাম। "তুমি কখনো এরকম দৃশ্য দেখেছ?"

"দৃশ্য? কীরকম?"

"এই যে ইউসুকে মার খাচ্ছে লোকটার কাছে। তোমার মনে আছে এরকম কোনো দৃশ্যের কথা?"

পর। ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করলো সায়াকা। মাথা ঝাঁকাল একটু

"দেখেছি বোধহয়। কিন্তু সেটা টিভিতে কিনা...?"

"তোমার স্মৃতিতে এরকম কোনো দৃশ্যের অভিজ্ঞতা নেই?"

"হুম..." মাথা নেড়ে প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সায়াকা। "কী ঘুরছে তোমার মাথায়, বলো তো।"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলাম আমি। বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম একবার।

"হ্যাঁ, ইউসুকে একদম শিশু নয়, কিন্তু ওকে বাচ্চাই বলা যায়। ওই লোকটা'র দ্বারা শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে ছেলেটা। অন্য দিকে 'সায়াকা' মানে তুমি, প্রায়ই এই বাসায় আসতে। তাই এমনটা খুবই সম্ভব যে নিজ চোখে হয়তো ওকে মার খেতে দেখেছ তুমি।"

"যেটা আমার অবচেতন মনে গেঁথে আছে। আর সেই কারণেই নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসতে পারি না। আমার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়েছে ঘটনাটা দ্বারা..." একটানা কথাগুলো বলে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো সায়াকা। "এটাই বলতে চাইছ?"

"তুমি সরাসরি নিপীড়নের শিকার হওনি যদিও, কিন্তু এরকম একটা দৃশ্য দেখলে সেটার প্রভাব পড়বেই তোমার উপরে।"

আমার কথাগুলো শুনে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল সায়াকা। বেশ কয়েক মিনিট কিছু বললো না। আমিও বসে থাকলাম ওভাবেই। বজ্রপাতের শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে।

"নাহ, মনে নেই," মাথা নিচু করে খসখসে কণ্ঠে বললো ও। "আরো জানতে হবে আগে, এরপর হয়তো বলতে পারব।"

"ঠিক বলেছ। আমি কিন্তু জোর করে তোমার উপরে কিছু চাপিয়ে দিতে চাচ্ছি না। একটা সম্ভাবনার কথা বললাম আর কি।"

"বুঝতে পেরেছি," বলে ডায়রিটা তুলে নিল ও। "আর খুব বেশি বাকি নেই।"

"আশা করি এটুকু থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সূত্র খুঁজে পাব।"

পরবর্তী এন্ট্রিগুলোতে ইউসুকে 'ওই লোকটা'র হাতে উপর্যুপরি মার খাবার ঘটনা লিখে গেছে টানা। তার প্রতি ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ছেলেটার। বছরের শেষ দিকে একটা সিদ্ধান্ত নিল সে।

> '১০ ডিসেম্বর, মেঘ আর নিতে পারছি না আমি। এই বাড়িতে থাকা সম্ভব না। পালাবো ঠিক করেছি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? যে কোনো এক জায়গায় গেলেই হলো। কিন্তু এখানে থাকব না। যা জমানো টাকা আছে, সব নিয়ে ট্রেনে করে যত দূরে যাওয়া সম্ভব, যাব। কোনো কাজ খুঁজে নিব। এই নরক থেকে বের হতে হবে আমার।'

কিন্তু পরের লেখাগুলো পড়ে বোঝা গেল, কাজটা করেনি সে। কেন করেনি, তা পরিষ্কার লেখা নেই অবশ্য। কিন্তু পরিকল্পনাটা মাথা থেকে একেবারে ঝেরেও ফেলেনি। আরো বেশ কয়েকবার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

> '৩০ ডিসেম্বর, রোদ
> বছর শেষ হবার আর এক দিন বাকি। আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ বছর ছিল এটা। আগামী বছরটাও এভাবে যাবে ভাবলেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দূরে কোথাও চলে যেতে চাই, যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না। কোনো খামারে যেতে পারলে ভালো হতো। গরু-ঘোড়া পালব নাহয়। কিন্তু আমি চলে গেলে সবাই মন খারাপ করবে। স্বার্থপরের মতন হয়ে যাবে কাজটা।
> কী করবো?'

> '১ জানুয়ারি, বৃষ্টি
> নববর্ষ উদযাপনের জন্যে নিজের সব আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করেছিল লোকটা। তার জন্যে সব উৎসবই মদ খাওয়ার উপলক্ষ মাত্র। সব ওয়াইন আর হুইস্কি নিজেই গিলেছে শেষ পর্যন্ত। তবে মাথা গরম করেনি এবারে। এত বেশি ভালো মেজাজে ছিল যে অস্বস্তিই হচ্ছিল আমার। এমনকি আমাকে এক হাজার ইয়েনের একটা নোটও দিয়েছে উপহার হিসেবে। পালানোর সময় কাজে আসবে টাকাটা। যত ভালো ব্যবহারই করুক না কেন আমার সাথে, লাভ হবে না।'

‘৩ জানুয়ারি, রোদ
প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজকে। বাইরে যাওয়ার সময় মা’র বোনা নীল গ্লোভসটা হাতে দিয়ে গিয়েছিলাম। ভালোই গরম ওগুলো। লোকটা গত দুই দিন ধরে শান্ত ছিল। আজ আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে যাওয়ার পর হঠাৎ চড়াও হয় আমাদের উপরে। আমরা নাকি তাকে খাটো করেছি সবার সামনে। আমার মাথায় মেরেছে জোরে, মা ‘কেও মেরেছে। এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। কিন্তু একা তো যাওয়া সম্ভব না।’

মা’কে রেখে যাওয়া সম্ভব না বলেই পালায়নি ইউসুকে, এটা মোটামুটি পরিষ্কার। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু ভদ্রমহিলার আচরণ কেমন যেন দুর্বোধ্য ঠেকছে। লোকটাকে থামাচ্ছে না কেন সে? যদি থামানো সম্ভব না হয়, তাহলে ছেলেকে নিয়ে চলে গেল না কেন?

এখান থেকে ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ অবধি ঘুরে ফিরে সেই একই কথা লিখেছে ইউসুকে। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পালাতে পারছে না ইউসুকে।

শুধু একটা এন্ট্রিই একটু অন্যরকম লাগলো। সেখানে লেখা-

‘২৯ জানুয়ারি, রোদ কাল যা দেখেছি, আজ সারাদিন কিছু করতে পারিনি সেজন্যে। খুব বেশি অস্বস্তিকর একটা দৃশ্য। আজ রাতেও কি একই ঘটনা ঘটবে? প্রতিদিনই ঘটে? গতকাল রাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠে শব্দটা শুনতে পাই হঠাৎ। সাধারণত এই সময়ে উঠি না আমি, এজন্যেই হয়তো আগে খেয়াল করিনি। যদি এরকম জঘন্য একটা ব্যাপার আসলেও প্রতিদিন ঘটে থাকে! ভাবলেই বমি আসছে আমার। আজ স্কুল থেকে ফিরে দেখি বাগানে দাঁড়িয়ে আছে ও। দ্রুত চলে এসেছি ঘরে। কালকে কী করে ওর মুখোমুখি হবো, কে জানে।’

এর আগের দিন নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু ঘটেছে। কিন্তু পাতা উল্টে দেখলাম ২৮ তারিখ কিছু লেখেনি ইউসুকে।

“কী ঘটতে পারে? এমন কী দেখেছে ছেলেটা?” সায়াকা’কে জিজ্ঞেস করলাম।

“কিসের যেন শব্দ শুনতে পেয়েছে। গভীর রাতে। এরকম সময়ে অদ্ভুত শব্দ কানে এলে ভয় লাগারই কথা।”

“কিন্তু ইউসুকে লিখেছে অস্বস্তিকর একটা দৃশ্য।”

"যদি এরকম জঘন্য একটা ব্যাপার আসলেও প্রতিদিন ঘটে থাকে! ভাবলেই বমি আসছে আমার।'- এটা লিখেছে ইউসুকে।"

"সেক্ষেত্রে..."

"হ্যাঁ," বলে আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল সায়াকা।

লম্বা শ্বাস ফেললাম আমি। ইউসুকে হয়তো ওর মা আর লোকটার ঘনিষ্ঠ হবার দৃশ্য দেখে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে লোকটা ওর সৎ বাবা না হয়ে পারে না।

শেষ পাতার লেখাগুলো পড়ে ডায়রিটা বন্ধ করে দিলাম। ছেলেটার সমস্ত আবেগ আমাকেও বিদ্ধ করেছে একই ভাবে।

"তো..." বললাম আমি। "এখন কী করবো আমরা? ডায়রিটা তো শেষ।"

"হ্যাঁ," বলে বন্ধ ডায়রিটার দিকে তাকালো সায়াকা। "কিন্তু এখানেই শেষ করলো কেন? এখনও অনেক পাতা খালি।"

"হয়তো পালিয়ে যায় ও।"

"মানে ঘর ছেড়ে চলে গেছে?"

"ওই তো, একই কথা।"

"সেক্ষেত্রে একটু হঠাৎই হয়ে গেল না বিষয়টা? হ্যাঁ, এর আগেও বেশ কয়েকবার পালানোর কথা বলেছে ও, কিন্তু প্রতিবারই দোটানায় ভুগে থেকে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত।"

"হয়তো এবারে এমন কিছু ঘটেছিল, যে কারণে এমনটা করতে বাধ্য হয়েছে ইউসুকে।"

"সেক্ষেত্রে ডায়রিতে অন্তত উল্লেখ থাকবে সেই ঘটনার। আর বাড়ি থেকে পালালে, ডায়রিটা সাথে করে নিয়ে যেত নতুবা পুড়িয়ে দিত।"

"আসলে..." বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। যুক্তি আছে সায়াকার কথায়। তর্কের খাতিরেও বলার মতন কিছু পাচ্ছি না।

"কিন্তু কিছু একটা ঘটেছিল সেই সময়, এটা নিশ্চিত," নিজেকে শোনানোর জন্যেই যেন বলে সায়াকা। "কারণ ইউসুকের ঘরটা দেখে মনে হবে ষষ্ঠ গ্রেডের এক শিক্ষার্থীর ঘরে সময় থমকে গেছে আচমকা। ডায়রির লেখাও সেই সময়েই শেষ হয়েছে।"

"চলো, ওর ঘরে যাই। আরেকটা ডায়রি পাওয়া যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, সেটাই করি," বলে টর্চ হাতে উঠে দাঁড়াল সায়াকা।

ইউসুকের ঘরে প্রবেশ করে একটা মোম জ্বেলে খুঁজতে শুরু করলাম আমরা। বুকশেলফের বইগুলো একটা একটা করে নামিয়ে দেখলাম প্রথমে। এরপর টেবিলে খুঁজলাম, কিন্তু ডায়রি নেই কোথাও। ছোট আলমারিটাও খুলে দেখলাম। ভেতরে কেবল অব্যবহৃত অন্তর্বাস, মোজা-এসব। "কিছু নেই।"

"তাই তো মনে হচ্ছে," নিচু চেয়ারটায় বসে বললাম। সায়াকা ও বিছানার উপরে পা ভাঁজ করে বসলো। "এখন কী করবো আমরা? এই ঘরে আর কিছু

আছে বলে মনে হয় না। এখন বাদ কেবল ওর বাবা-মা'র ঘরটা। ওই বাক্সটাও খুলতে হবে আমাদের।"

"আমার আর মা'র ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য পেলে ভালো হতো," কিছুক্ষণ পর বললো ও।

"ছোট্ট সায়াকা আর ওটাই আন্টি।"

ইউসুকের ডায়রি পড়ে যা বুঝেছি, সায়াকা আর ওর মা মিকুরিয়া পরিবারের বাইরের মানুষ ছিল। তাহলে কি সায়াকার স্মৃতিভ্রমের কারণ অন্য কিছু?

লম্বা শ্বাস ছেড়ে আঙুল দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরলো সায়াকা।

"তুমি নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত," ওকে বলি। "এই অন্ধকারে ডায়রিটা পড়তে কষ্টই হয়েছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ক্লান্ত," দুর্বল হেসে বলে সায়াকা। পরক্ষণেই আবারো আগের গাম্ভীর্য ফিরে আসে চেহারায়। "তুমি একটু আগে বোধহয় ঠিকই বলেছিলে।"

"কখন?"

"বলেছিলে আমার এরকম অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ইউসুকে'কে ওভাবে নিপীড়িত হতে দেখা।"

কপালে ভাঁজ পড়লো আমার।

"অস্বাভাবিক আচরণের কথা একবারও বলিনি আমি, বলেছি ঘটনাটা দ্বারা প্রভাবিত হলেও হতে পারো।"

"উহু, ওই কারণেই আজকে আমার এই অবস্থা। তুমিও টের পেয়েছ নিশ্চয়ই।"

"একদমই না," বলি। "তোমার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই, যদি নিজ থেকে আমাকে ঘটনাটার ব্যাপারে না বলতে..."

"আসলেই?"

"হ্যাঁ। বুঝলে প্রেম করতাম?"

চুলে একবার হাত বুলিয়ে হাতের টর্চটা জ্বালাতে-নিভাতে শুরু করলো ও। প্রতিবার যখন টর্চ জ্বলে উঠছে ওর স্কার্ট ভেদ করে ভেতরের অবয়ব দেখতে পাচ্ছি খানিকটা।

হঠাৎই হাসি ফুটলো সায়াকার মুখে। "তাহলে আমি বোধহয় একটু বেশি বেশি ভেবে ফেলেছি।"

"কীরকম?"

"ভাবতাম, আমাদের যখন সম্পর্ক ছিল, তখনই আমার মধ্যে অস্বাভাবিক এই বিষয়গুলো খেয়াল করেছ তুমি। তবুও আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছ। এর আগে কেউ কখনও অমনটা করেনি। এজন্যেই তোমার প্রেমে পড়েছিলাম।"

অপ্রস্তুত হাসি ফুটলো আমার মুখে।

"আমাকে বোধহয় একটু বেশিই দাম দিয়ে ফেলেছ তুমি। অবশ্য ওই বয়সের প্রেম-ভালোবাসায় এমনটাই হয়।"

“সেটা বলিনি আমি। কীভাবে যে বোঝাব...” রক্তিম হয়ে উঠেছে সায়াকার চেহারা। একবার কাঁধ নাচাল ও। “আসলেও বোকা আমি। এখন এসব বলে লাভ কী। সরি, কিছু মনে করো না।”

“আরে, ব্যাপার না,” অজান্তেই চোখ বন্ধ হয়ে এলো আমার।

২

হাইস্কুলের দ্বিতীয় বর্ষে সায়াকা আর আমাকে একই শাখায় দেয়া হয়। পরিচয় শুরুটা সেখান থেকেই। এর আগে ওকে চিনতাম না। একদমই সাধারণ একটা মেয়ে। আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতন কিছু ছিল না ওর মধ্যে; আমার অন্তত সেটাই মনে হতো। কিন্তু পাশাপাশি বসে কিছুদিন ক্লাস করার পর ধারণা পুরোপুরি বদলে যায়।

সমবয়সি অন্য মেয়েদের মত বাড়তি কোনো আদিখ্যেতা নেই, অনর্থক আহ্লাদ নেই। ভিড়ের পেছন দিকে থেকে বোঝার চেষ্টা করে সবকিছু। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্তর্মুখী স্বভাবের মেয়েটা, সেজন্যেই সবসময় এমন আচরণ। তবে সেই ভুলও ভেঙ্গে যায় কিছুদিন বাদে।

ওকে দেখে প্রায়ই মনে হতো যেন হাইস্কুলের দ্বিতীয় বর্ষ শিরোনামে কোনো মঞ্চনাটক দেখছে। তবে নিজে কখনো সেই নাটকে অংশ নিবে না। চেহারায় শিশুসুলভ একটা কমনীয়তা থাকলেও, ব্যক্তিত্ব তার পুরো বিপরীত।

এই সায়াকা'কে একদমই অন্যরকম একটা মেয়ে মনে হয় আমার কাছে। ওর সাথে কথা বলতেও ভালো লাগতো। সেই সময়ে আমি নিজের রেজাল্ট নিয়ে খুব গর্বিত ছিলাম। ভেতরে ভেতরে নিজেকে বলতাম আশপাশের সবার তুলনায় অনেক এগিয়ে আমি।

"কুরাহাশি, তুমি দেখি একাই থাকো সবসময়," একদিন সায়াকা'কে বলি আমি। "নিজেকে অন্যদের চেয়ে একটু উপরেই ভাবো বোধহয়।" জবাবে কিছু বলে না ও। কিছুক্ষণ পর পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আমার দিকে।

"তোমার হাবভাবেও তো সেটাই মনে হয়।"

"আমি? হ্যাঁ, আমিও অনেকটা ওরকমই।"

আমার জবাব শুনে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ে সায়াকা। "একা থাকতেই ভালো লাগে আমার। ওদের সাথে মিশতে পারি না। কিন্তু কিছু করার নেই আসলে।"

"কেন?"

"কারণ..." কাঁধ ঝাঁকায় ও। "ওরা আমাদের সমবয়সি হলেও মানসিকতা এক রকম নয়। এটা মেনে নিতেই হবে। "

ওর জবাব শুনে থ বনে যাই।

একবার আমাদের স্কুলের কাছের একটা কালচারাল সেন্টারে 'আন্তর্জাতিক সমাজের মুখোমুখি হবার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়ে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সায়াকা'কেও আমার সাথে যেতে বলি।

"একাও যাওয়া যায়, কিন্তু কারো সাথে গেলে পরে এই বিষয়ে আলাপ করা যাবে। তাছাড়া আমার সহপাঠীদের মধ্যে তুমিই একমাত্র যে ঘুমিয়ে পড়বে না ওখানে গেলে। অন্যরা হয়তো 'সেমিনার' অর্থও জানে না।"

কথাটা শোনার পর মৃদু হাসি ফুটলো ওর মুখে। “আমারও সেটাই ধারণা,” বলে সেমিনারে যেতে রাজি হয়ে যায় সায়াকা।

এরপর আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। প্রায়ই বিভিন্ন ক্যাফেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। এক সময় আরো গভীর হয় সম্পর্ক। তখন ছুটির দিনগুলোও একসাথে কাটাতে শুরু করি আমরা। কথা বলার বিষয়ের অভাব ছিল না; তবে অর্থহীন কোনো বিষয়ে অযথা তর্ক করে সময় নষ্ট করতাম না।

“এভাবে কথা বলার মত একজন মানুষ খুঁজছিলাম এতদিন,” বলি আমি।

“আমিও,” সায়াকা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়।

এর কিছুদিন পরেই ওর বাড়ির কাছে একটা জায়গায় সন্ধ্যাবেলা চুমু খাই আমরা। তারও এক বছর পর একদিন ওর বেডরুমে মিলিত হই দু’জনে। বিপরীত লিঙ্গের শরীরের ব্যাপারে দু’জনেরই জ্ঞান তখন পর্যন্ত বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ।

“আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর কিছু নেই,” ওকে বলি। “সবাই করে। অনেকটা খাবার খাওয়া, কাপড় পরার মতন বিষয়টা।”

সায়াকাও একমত হয় আমার সাথে। “কেবল একসাথে শুয়েছে বলেই একে অপরকে সেটা নিয়ে কথা শোনানোর কোনো মানে হয় না। শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্কের দোহাই দিয়ে কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক টেকে না।”

জানি না সেদিন কে কাকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আমরা। শুধু এটুকু জানি যে ওর মত একজন সঙ্গীর খোঁজেই ছিলাম সারাজীবন।

* * *

“ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?”

কন্ঠস্বরটা কানে আসতেই চোখ খুলি। সায়াকা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে

“না, চোখ লেগে এসেছিল একটু।”

“উল্টো দিকের ওই ঘরটা দেখতে চাই আমি।”

“আমিও যাব সাথে, চলো,” বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

বিছানা থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙছে সায়াকা, সেই সময় খেয়াল করলাম দাবার ছকের মতন সাদা-কালো নকশার কম্বলের নিচ থেকে কিছু একটা বের হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কাগজ।

“এটা কী?”

কম্বলের এক কোনা ধরে উঠালাম আমি। বালিশেরপাশেই একটা কাগজ। সেটা উঠিয়ে দেখলাম গুটি গুটি অক্ষরে অনেক কিছু লেখা। একজন নয়, অনেকে লিখেছে কাগজটায়। ভালো করে দেখার জন্যে টর্চের সামনে আনলাম ওটা।

হঠাৎ একটা বাক্য দেখে জমে গেলাম ওখানেই।

“কী হলো?” পাশ থেকে জিজ্ঞেস করে সায়াকা।

ধীরে ধীরে ওর হাতে কাগজটা দিয়ে লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করলাম।
সায়াকারও আমার মতনই দশা হলো।
‘তোমার আত্মা শান্তি পাক, ইসুকে মিকুরিয়া।’ -
এই কথাটাই লেখা সেখানে।

৩

এই সম্ভাবনাটা যে আমার মাথায় উঁকি দেয়নি, তা নয়। ইউসুকের এই ঘরটা যেন নির্দিষ্ট একটা সময়েই থমকে আছে। ডায়রির লেখা হুট করে থেমে যাওয়ার কারণ হিসেবে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল ক্ষণিকের জন্যে হলেও। কিন্তু ভাবনাটা এত বেশি হৃদয় বিদারক যে মুখে আনিনি।

কাগজটা সায়াকার হাত থেকে নিয়ে আবারও চেয়ারটায় বসে প্রতিটা শব্দ সময় নিয়ে পড়লাম।

> ‘মিকুরিয়া, স্বর্গে ভালো থেকো।’- হিরোমি ইয়ামামোতো ‘বিদায়। তোমার জিরো ফাইটার প্লেন মডেলটা যত্ন করে রেখে দিব আমি।’- ইয়োচি ফুজিমোতো ‘আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। খুব বেশি খারাপ লাগছে। আবারও তোমার সাথে খেলতে চাই।’- হিরোশি ওনো

ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রঙের মার্কার দিয়ে সহপাঠীর জন্যে বিদায়বার্তা লিখেছে কাগজটায়। এরপর নিশ্চয়ই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে কাগজটা তুলে দেয়া হয় ইউসুকের পরিবারের কাছে। এই লেখাগুলো যে ছেলেটার পরিবারের মানুষদের, বিশেষ করে ওর মা’র মন ছুঁয়ে গেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দু’টো বার্তা আলাদাভাবে নজর কাড়ল আমার।

> ‘আর কিছুদিন পরেই প্রাইমারি স্কুল পাশ করে যেতাম আমরা, এই সময়ে তোমাকে হারালাম। প্রচণ্ড খারাপ লাগছে।’- ইয়াসুকো ওটা ‘প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ ইউসুকে মিকুরিয়ার কথা মনে হবে আমার।’- ওসামু তোদোকোরো

প্রাইমারি স্কুল শেষ হওয়ার কথা বলেছে ইয়াসুকো ওটা নামের ছেলেটা, অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেডে পড়াকালীন সময়েই মারা গেছে ইউসুকে। ডায়রিতে শেষবারের মতন লিখেছিল ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে, এই হিসেবও মিলে যাচ্ছে। ইউসুকে ডায়রি লেখা থামায়নি, তার জীবনটাই থমকে গেছে।

“কী মনে হচ্ছে তোমার?” কাগজটা সায়াকার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“কোন ব্যাপারে?”

“ইউসুকের মৃত্যুর কারণ। এভাবে হঠাৎ মারা গেল কেন? ডায়রি পড়ে তো মনে হয়নি যে কোনো অসুখে ভুগছে।”

“দুর্ঘটনা হতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনা।”

"এই সম্ভাবনাই প্রথমে মাথায় আসে, তাই না? স্কুলের কোনো শিক্ষার্থী মারা গেলেই আমরা সড়ক দুর্ঘটনার কথা ভেবে নিই।"

"তোমার কি ধারণা ওর অন্য কিছু হয়েছিল?" মাথা একদিকে কাত করে জানতে চায় সায়াকা।

"এই ব্যাপারে তো নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব না এখন। কিন্তু আমার মন বলছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি ইউসুকের। ও কিন্তু ডায়রিতে 'ওই লোকটা'র মৃত্যুও কামনা করেছে শেষদিকে। এর পরপরই মারা গেল। এটাকে কি কাকতালীয় হিসেবে মেনে নেয়া যায়?"

আমার কথা শুনে শক্ত হয়ে গেল সায়াকার চেহারা। "কী বলতে চাইছ?"

"যেমনটা বললাম, এখনই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাবে না। শুধু সন্দেহ হচ্ছে আর কি।"

"তোমার গলা শুনে তো মনে হচ্ছে আগে থেকেই ধারণা করেছিলে এমন কিছু হবে।"

"দুর্ঘটনার কোনো প্রমাণ কিন্তু পাইনি আমরা, পেয়েছি?"

"দুর্ঘটনা না হলে কীভাবে মারা গেল? ইউসুকে'কে কেউ খুন করেছে?" আমার দিকে তাকিয়ে বলে সায়াকা। রাগের ছাপ চোখে মুখে। একটু অবাকই হলাম। ইউসুকের জন্যে বোধহয় বেশিই খারাপ লাগছে ওর। ডায়রির লেখাগুলো পড়তে পড়তে ছেলেটার উপর মায়া জন্মে গেছিল।

"শুধু খুনই না..."

"তাহলে?"

"আত্মহত্যাও হতে পারে," দ্বিধা ঝেরে বলেই ফেললাম। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো সায়াকার মুখ দিয়ে। ওর অভিব্যক্তি খেয়াল করে পরের কথাগুলো বললাম। "ওই লোকটা' আসলে কে, এটা জানি না আমরা। কিন্তু ইউসুকে তাকে পছন্দ করতো না, সেটা নিশ্চিত। এমনটাও হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।"

"কিন্তু ওকে তো দুর্বল চিত্তের মনে হয়নি।"

এবারে নিশ্চিত হলাম ইউসুকের প্রতি আসলেও অনুরক্ত হয়ে পড়েছে সায়াকা।

"আত্মহত্যা যারা করে, তারা যে দুর্বল চিত্তের, এই ধারণাটা ভুল। কিন্তু যেমনটা বললাম একটু আগে, নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। একটা সম্ভাবনার কথা বলেছি।"

সায়াকা মুখে কিছু বললো না, কিন্তু আমার কথার সাথে একমত বলেও মনে হচ্ছে না।

"যাইহোক, চলো ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরটা থেকে ঘুরে আসি আগে" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলি।

হাতের কাগজটা বালিশের উপর রেখে কম্বলটা আগের মত করে দিল সায়াকা।

ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরে ঢুকে প্রথমেই কাজ ভাগ করে নিলাম আমরা। কোথাও খোঁজা বাদ রাখলাম না। সায়াকার ধারণা ইউসুকের বাবা যেহেতু ছেলেকে ডায়রি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার নিজেরও হয়তো ডায়রি লেখার অভ্যাস ছিল। এটা খুবই সম্ভব।

তবে ইউসুকের বাবার ডায়রি পাওয়া গেলেও সেটা আমাদের কোনো কাজে আসবে কিনা সন্দেহ, ইউসুকের মৃত্যুর অনেক আগেই লোকান্তরিত হয়েছিল সে।

আলমারির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সিন্দুকের মতন বাক্সটা খুলতে হবে। বেশ পুরোনো, খোলা সহজ হবে না।

এসবই ভাবছি, এমন সময় সায়াকা বললো, "এটা কী?"

ওর দিকে তাকালাম। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে বাদামি একটা ব্যাগ বের করে আনলো।

"দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে ভেতরে," বলি আমি।

ভেতরে উকি দিল ও। "চিঠির মতন লাগছে।"

"বের করে আনো।"

আশপাশে তাকিয়ে অবশেষে বিছানার উপরে ওগুলো ছড়িয়ে রাখলো সায়াকা। দশ বারোটার মতন ভাঁজ করা কাগজ। দেখে মনে হচ্ছে খাম থেকে বের করা হয়েছে সদ্য। কিন্তু খাম দেখলাম না। একটা চিঠি হাতে নিলাম। একপাশে কেমন আঠার মত হাতে ঠেকল। নিশ্চয়ই অতীতে কোনো এক সময়ে ব্যান্ড দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

প্রথম যে চিঠিটা হাতে নিয়েছি, সেটাই প্রায় তিন পাতার মতন লম্বা। মূল লেখা পড়ার আগে একদম শেষে উঁকি দিলাম একবার, জানতে চাই চিঠিটার প্রেরক আর প্রাপক কে।

চিঠির একদম শেষে সুন্দর নীল কালি দিয়ে লেখা-

"৩০ আগস্ট, কেইচিরো মিকুরিয়া
মাসাতসুগু নাকানো বরাবর।"

অবাকই হলাম দেখে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম চিঠিগুলোর প্রাপক হবে মিকুরিয়া পরিবার প্রধান। কিন্তু এখন দেখছি উল্টো। সায়াকা'কে বললাম কথাটা।

"আমিও সেটাই ভেবেছিলাম," অন্য চিঠিগুলো দেখে বললো ও। সবগুলোই মাসাতসুগু নাকানোর উদ্দেশ্যে কেইচিরো মিকুরিয়ার লেখা চিঠি।"

"কেইচিরো মিকুরিয়া তো বোধহয় ইউসুকের বাবা। কিন্তু এই মাসাতসুগু নাকানোটা কে?"

"আমি কেবলই নামটা কোথায় যেন দেখলাম। কই গেল..." বলে বইয়ের তাকটার দিকে এগোলো সায়াকা।

আমার হাতের চিঠিটার দিকে তাকালাম। নিয়ম রক্ষার কিছু কুশল বার্তার উপরে চোখ বুলিয়ে মূল লেখাটুকু পড়তে শুরু করলাম জোরে-

> ‘আমাদের বড় ছেলেকে দেখেশুনে রাখার জন্যে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। স্কুল থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ওরা ওকে নিতে রাজি। ওর ভবিষ্যত নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি; অলস বসে থাকবে না, অসৎ সঙ্গেও জড়াবে না। সত্যি বলতে অনেক দিন পর একটু ভারমুক্ত অনুভব করছি। ভেবেছিলাম ওকে আরো ভাল করে চেষ্টা করতে বলবো। কিন্তু একটা গ্লাসে এক গ্লাস পানিই আটবে; এর বেশি নয়। এখন আর আগের মতন উচ্চাশা করছি না। আপনাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য মাফ করবেন।’

কী চলছে কিছুই বুঝছি না। এখানে বড় ছেলে বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে, সে নিশ্চয়ই ইউসুকে মিকুরিয়া। কিন্তু, ওর সাথে বাকি বর্ণনাটুকু ঠিক খাপ খায় না। আর এই ভর্তির ব্যাপারটা কী?

“এই যে, পেয়েছি,” সায়াকার হাতে পেল্লায় একটা বই। পাতাগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ পুরোনো। বইটার নাম ‘আইন ব্যবস্থা’, যেখানে সম্পাদকদের মাঝে একজন হচ্ছে মাসাতসুগু নাকানো।

বইটায় ভদ্রলোকের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে কিনা জানার জন্যে প্রথম দিকের পাতাগুলো ওল্টালাম। শুরুতে কিছু নেই, কিন্তু একদম শেষ দিকে তার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পেলাম। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক।

“কেইচিরো মিকুরিয়া খুব সম্ভবত মাসাতসুগু নাকানোর ছাত্র বা ইউনিভার্সিটির জুনিয়র।” সদ্য পড়া চিঠিটা সায়াকা’কে দেখালাম। ওকেও বিভ্রান্ত দেখাল ওটা পড়ার পর।

“বড় ছেলে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? ইউসুকে?”

“সেক্ষেত্রে হিসেব তো মেলে না,” বলে বইটা কবে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা খুঁজতে লাগলাম। প্রায় ত্রিশ বছর আগে। কিন্তু আমি অবাক হলাম পাশের লেখাটা পড়ে। “আরে...”

“কী হলো?”

“দেখো, এটাও সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে কেনা হয়েছে।”

প্রিন্টার্স লাইন[5] পাতাটা দেখালাম। ওখানে ছোট্ট করে পেন্সিল দিয়ে মূল্য লেখা। কপালে ভাঁজ পড়লো সায়াকার।

“অদ্ভুত! লোকটা কেইচিরো মিকুরিয়ার শিক্ষক হোক বা সিনিয়র; তাই বলে সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে তার বই কিনবে?”

সায়াকা একবার আমার দিকে, আবার বইটার দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

“বাদ দাও, বাকি চিঠিগুলো পড়ি চলো।”

প্রতিটি চিঠিতে তারিখ লেখা থাকলেও বছর লেখা নেই। তাই সেগুলো সময়ক্রম অনুযায়ী পড়ছি কিনা আমরা, তা বলতে পারব না। বিছানায় পাশাপাশি বসে দু'জনেই টর্চের আলোতে চিঠি পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাইরে মুহুর্মুহু বজ্রপাত থেমেছে, বৃষ্টিও ধরে এসেছে, কিন্তু ঝড়ো বাতাস বইছে এখনো।

> ‘উপহারগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা জানবেন। আমার স্ত্রী’র ভীষণ পছন্দের জিনিস, আমার চেয়ে ও-ই বেশি খুশি। আপনার মূল্যবান পরামর্শ সত্ত্বেও এই বছরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আবারও অকৃতকার্য হয়েছে আমার ছেলে। ওর আচার আচরণ দেখে তো মনে হয় এই প্রজন্মের সবার একই অবস্থা; প্রচণ্ড অলস। ওকে দেখামাত্র মাথা ধরে যায় আমার। আরো এক বছর এভাবে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে। তা-ও নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না যে আগামী বছরেও ও সফল হবে কিনা। ভবিষ্যতে কপালে কী খারাবী অপেক্ষা করছে কে জানে।
>
> এভাবে অভিযোগ জানানোর জন্যে দুঃখিত। আপনার স্বাস্থ্য ঠিক আছে শুনে ভালো লাগছে। এই বছর ঠাণ্ডা বেশি পড়বে, নিজের খেয়াল রাখবেন।’

চিঠিটা লেখা হয়েছে ডিসেম্বরের ২০ তারিখে। পড়ে যতদূর বুঝলাম এর আগেই কেইচিরো মিকুরিয়া ভালো কিছু উপহার পেয়েছে মাসাতসুগু নাকানোর তরফ থেকে। সিনিয়র কেউ আগে উপহার দেয় না সাধারণত, হয়তো কেইচিরো মিকুরিয়াই প্রথমে কিছু পাঠিয়েছিল। সেটার বিনিময়ে পাল্টা উপহার দিয়েছে মাসাতসুগু নাকানো।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কোনো এক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে মিকুরিয়ার ছেলে। পরীক্ষাটা সম্ভবত প্রতি বছরেই অনুষ্ঠিত হয়।

“অ্যাই, এটা দেখো,” আমি গভীর ভাবনায় মগ্ন, এমন সময় বলে সায়াকা। “ইউসুকের নাম আছে এখানে।”

ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

> ‘আপনি প্রথম উপহার পাঠালেন। আমরা তো নিশ্চিতও ছিলাম না যে ছেলে হবে নাকি মেয়ে। পরে যখন দেখলাম ছেলে, খুশি না হয়ে পারিনি। আপনার কাছে বোধহয় হাস্যকর শোনাচ্ছে কথাটা।
> ওর নাম রেখেছি ইউসুকে। পুরো রাত ধরে ভেবেছি কী নাম দেয়া যায়। আশা করি ও অন্তত নামের মর্যাদা রক্ষার জন্যে হলেও কিছু একটা হবে।
> ইউসুকে একটু বড় হলে পুরো পরিবার নিয়ে আপনার সাথে দেখা করে যাব। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

দু’বার পড়লাম চিঠিটা। “*আশা করি ও অন্তত নামের মর্যাদা রক্ষার জন্যে হলেও কিছু একটা হবে*। এই কথাটা...”

“আমারও খটকা লেগেছে এখানটায়,” সায়াকা বলে। “যেন ইউসুকের জন্মের আগে কেউ হতাশ করেছে তাকে।”

একটু আগে পড়া চিঠিটা আবারও হাতে নিলাম।

“ইউসুকে তার বড় ছেলে নয়। এখানে যার কথা বলা হয়েছে, সে-ই মনে হচ্ছে প্রথম সন্তান। মিকুরিয়া দম্পতির আসলে দুই ছেলে ছিল।”

“তাহলে কি চারজনের পরিবার?

“সেটাই মনে হচ্ছে এখন।”

“দু’জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক বেশি।”

“একটু আগে কী আলোচনা করেছিলাম আমরা, মনে আছে? ইউসুকে বাবা-মা’র বাড়তি বয়সের সন্তান। অর্থাৎ অ্যালবামে আমরা যে বয়স্ক মহিলাকে দেখেছি, তিনিই ইউসুকের মা।”

“আচ্ছা...” বলে মাথা নাড়ে সায়াকা। আমার হাতের চিঠিটার দিকে মাথা নুইয়ে তাকায়। “কোন পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এখানে?”

“এটা নিয়েই ভাবছি এতক্ষণ ধরে। আমার ধারণা সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্যে যে পরীক্ষা নেয়া হয়, সেটার কথা বলা হয়েছে। জুডিসিয়াল সার্ভিস এক্সাম। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা না। নাহলে ছেলেটার বাবা এভাবে বলবে কেন?”

“মিস্টার মিকুরিয়া আইনজীবি ছিলেন। হয়তো ছেলেকে উত্তরসূরী বানাতে চেয়েছেন।”

“কোনো সন্দেহ নেই সেই ব্যাপারে। কিন্তু বড় ছেলে কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারেনি। তাই তাকে জজ না বানিয়ে শিক্ষক বানানোর সিদ্ধান্ত নেন।”

“শিক্ষক?”

“এই যে এখানেই আছে,” প্রথম চিঠিটা দেখাই ওকে। “স্কুল ওকে নিতে রাজি হয়েছে, এটাই তো লিখেছেন উনি, তাই না? এখানে আসলে স্কুলে চাকরির সুযোগ

মিলেছে বুঝিয়েছেন মিস্টার মিকুরিয়া।”

“একটা গ্লাসে কেবল এক গ্লাস পানিই আটে...” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে সায়াকা। “তাহলে দ্বিতীয় সন্তানের উপরেই ভরসা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।”

“হ্যাঁ। কিন্তু ইউসুকে’কে সফল হতে দেখার আগেই তার মৃত্যুর ব্যাপারটা দুঃখজনক। বেঁচে থাকলে অবশ্য সন্তানের মৃত্যুর সাক্ষী হতে হতো, সুতরাং এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে ভালোই হয়েছে।”

“হুম...” ভাবছে সায়াকা। হঠাৎই ভ্রু-জোড়া কপালে উঠে গেল ওর কিছু একটা ধরতে পেরেছে নিশ্চয়ই। যদি ইউসুকের উপরেই বাজি ধরার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তিনি, তাহলে বড় ছেলের মনের অবস্থা কী হবে চিন্তা করো।”

“আমরা বোধহয় একই কথা ভাবছি,” বলি আমি।

বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকালো সায়াকা। “তুমিও কি এটাই ভাবছ? ডায়রির ‘ওই লোকটা’ আসলে ইউসুকের বড় ভাই?”

“আমারও সেটাই মনে হচ্ছে। ডায়রিটা যখন লিখতে শুরু করে ইউসুকে, তখন বড় ছেলে মিকুরিয়াদের সাথে থাকত না। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সে সুযোগ বুঝে ফিরে আসে।”

“এসেই টর্চার করতে শুরু করে ইউসুকে’কে।”

“হ্যাঁ।”

দাঁতে দাঁত চেপে আমার দিকে তাকালো সায়াকা।

“বাকি চিঠিগুলো পড়ে ফেলি। তাহলে পুরো চিত্রটা বোঝা যাবে।”

“হ্যাঁ,” বলে আবারও চিঠিগুলো হাতে নিল ও।

আমাদের আন্দাজ বোধহয় ভুল না। চিঠিগুলোতে যা লেখা, সেখান থেকে মিকুরিয়া পরিবারের সেই সময়কার অবস্থা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারলাম।”

> ‘আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। ইউনো খুব শিঘ্রই ফিরবে নাকি? ওর ভালো ফলাফলের কথা শুনে আমরা সবাই খুব খুশি। ও ফিরলে দেখা করবো অবশ্যই। আপনি যে দ্বিতীয় সন্তানের ব্যাপারে এত দ্রুত জানতে পেরেছেন, এটা শুনে অবাক হয়েছি। আসলে আমরা কাউকেই বলিনি তখন। মাফ করবেন সেজন্যে। যেহেতু এর আগে ছেলে হয়েছে, তাই এবারে ছেলে হোক বা মেয়ে, আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

এই চিঠিটা নিশ্চয়ই ইউসুকের জন্মের আগের। কেইচিরো চিঠিতে বলেছেন ঠিকই যে ছেলে হোক বা মেয়ে, আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু ইউসুকের জন্মের পরে ঠিকই খুশি হয়েছিলেন।

আর তার বড় ছেলে শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশের পরপরই বিয়ে করে ফেলে। নাকানো মাসাতসুগুও নিমন্ত্রিত ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানে। চিঠিটা এরকম-

> ‘বড় ছেলের বিয়ের পর অবশেষে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি। ব্যস্ততার কারণে সেদিন আপনার সাথে খুব বেশি কথা হয়নি, মাফ করবেন। আমার ছেলে আর ছেলের বউ মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে আমাদের সাথে দেখা করে গেছে। বিয়ে হয়েছে ওর, আশা করি এবারে একটু হলেও দায়িত্ববানের মত আচরণ করবে। সেদিন অতিথিদের সামনে কনের পরিচয় পর্ব একটু তাড়াহুড়ো করেই শেষ করা হয়েছিল বোধহয়। এখানে বিস্তারিত বলছি। মেয়ে আসলে আমার স্ত্রী’র পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, হোলসেল ফুডের ব্যবসা ওদের। দুই বোনের মধ্যে ও ছোট, পড়াশোনা শেষে পারিবারিক ব্যবসায় সাহায্য করেছে কিছুদিন। এমনি মেয়ে খুব ভাল, কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য বেশ দুর্বল, এজন্যে চিন্তা হয়। কিন্তু আমার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এটাই অনেক।
> ভবিষ্যতেও আপনার পরামর্শের দরকার হবে আমার, আশা করি তখন সময় দিতে পারবেন। আবহাওয়া এই ভালো তো এই খারাপ, নিজের যত্ন নেবেন।’

কেইচিরো মিকুরিয়া ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করা থামাতে পারেননি, এই চিঠিতেও সেটা স্পষ্ট। আর তার এই চিন্তা যে যুক্তিসঙ্গত তা পরবর্তী দুটো চিঠি থেকে আরো ভালো করে বোঝা যায়।

> ‘মাফ করবেন, আপনাকে কথাটা আরো আগে জানানো হয়নি, আমার ছেলে আবারও বিয়ে করেছে। ওর বর্তমান স্ত্রী একজন পিয়ানো বাদক, বাবা-মা নেই। আর পিয়ানো সে কোনো শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে বাজায় না, বাজায় নাইটক্লাবে। সেখানেই আমার ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে তার। আপনি তো জানেন, আমার আগের পুত্রবধূ বিয়ের দুই বছরের মাথায় মারা যায়। এরপরে অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি মানা করে দিয়েছি। কারণ আমার ছেলে এখনও পরিবারের দায়িত্ব নিতে অক্ষম। মেয়েটা খুব সম্ভবত আমার ছেলের অত্যাচারেই মারা গেছে, ওর কারণেই স্বাস্থ্য বেশি ভেঙ্গে পড়েছিল। এই চিন্তাটা মাথায়

আসলেই বুক ফেটে কান্না পায়। জানি না কবে আমার ছেলের একটু দায়িত্বজ্ঞান হবে।'

তাহলে কেইচিরো মিকুরিয়ার বড় ছেলের প্রথম স্ত্রী মারা গেছে। আগের চিঠিতেই অবশ্য তিনি লিখেছিলেন যে মেয়েটা শারীরিকভাবে দুর্বল। কোনো অসুখ ছিল বোধহয়।

দ্বিতীয় বিয়েটাও টেকেনি।

'আপনাকে এত ঝামেলায় ফেলার জন্যে দুঃখিত। টাকাপয়সার দিকটা আমি সামলে নিয়েছি। স্কুলের তরফ থেকে বলেছে ও স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

আসলে এই বিষয়ে কথা বলতে গেলেই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর নিতে পারছি না এই বয়সে। কিছুদিন আগে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা বাসায় বসেছিল ওর ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলার জন্যে। এরকম জঘন্য একটা কাজ যে করতে পারে, তার জন্যে আমার কোনো মায়া নেই। একজন শিক্ষক যদি জুয়ার মত ঘৃণ্য ব্যাপারে জড়িত থাকে, তাহলে মানুষ তো রাগবেই। অনেকে নানারকম কথা শুনিয়েছে। অসংখ্য পাওনাদার আছে এখনো। কিন্তু ওর মধ্যে অনুতাপের ছিটেফোঁটাও দেখিনি। মানসিক সমস্যা আছে বোধহয়। ওকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর কথাও বলেছে অনেকে। দ্বিমত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না আমার।

এখন আপাতত আমার নজরদারিতেই আছে। চাই, নতুন করে আবার শুরু করুক সবকিছু। আমারও বয়স হয়েছে। কিন্তু এখন যদি হাল ছেড়ে দেই, ইউসুকের জন্যে সেটা একটা খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকবে। আসলে আমি ইউসুকের ভবিষ্যত নিয়েই বেশি চিন্তিত। ভাগ্য ভাল যে ছেলেটা কারো সাতে পাঁচে নেই।

ওর দ্বিতীয় স্ত্রী-ও চলে গেছে। সামনের দিনগুলোতে কী করবে, তা আমার জানা নেই। যাইহোক, চোখে চোখে রাখতে হবে, একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। নিজেকে শোধরাতে পারছে কিনা, সেই খেয়াল রাখাটা আমার কর্তব্য।

আপনার শরীর কেমন আছে? একজন ভালো ডাক্তারকে চিনি আমি। যদি আপনি চান, তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে

দিতে পারি। জানাবেন দয়া করে।'

যেহেতু চিঠিটায় বছরের উল্লেখ নেই, কেইচিরো মিকুরিয়ার বড় ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে কতদিন টিকেছিল, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন তার এই হাল হলো, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"ইউসুকের বড় ভাই একদম বখাটে ধরনের ছিল তাহলে," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্তব্য করে সায়াকা।

"ধীরে ধীরে বিষয়গুলো পরিষ্কার হচ্ছে। 'ওই লোকটা' আসলে মিকুরিয়াদের বড় ছেলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইউসুকে মারা গেল কীভাবে?"

"হ্যাঁ," বিচলিত দৃষ্টিতে আশপাশে তাকিয়ে বলে সায়াকা। "এই প্রশ্নের উত্তর পেলে স্মৃতিগুলোও ফিরে পাব হয়তো।"

"সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। হয়তো তুমি এখানে কেবল খেলাধুলা করতে আসতে," সরাসরিই বললাম কথাটা।

"তাই?" সন্দিহান ভঙ্গিতে একদিকে মাথা কাত করলো সায়াকা। "চিঠিগুলো পড়া শেষ?"

"আরো একটা আছে," বলে শেষ চিঠিটার ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলাম। এখানে মূলত কেইচিরো মিকুরিয়ায় কাজ সংক্রান্ত আলাপই বেশি। ইউসুকে এবং তার বড় ভাইয়ের কোনো উল্লেখ নেই। চিঠিটা যে আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, এটা কেবলই সায়াকা'কে বলবো, এমন সময় শেষ অনুচ্ছেদটা চোখে পড়লো। না চমকিয়ে পারলাম না।

"কী হয়েছে?"

কিছু না বলে সায়াকার দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলাম। পড়তে পড়তে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠলো ওর। যখন চিঠিটা নামিয়ে রাখল, দু'চোখ একদম লাল।

"এখানে কি বাবার কথা বলা হয়েছে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে," মাথা নেড়ে বলি।

চিঠির শেষে লেখা-

> 'আমাদের বাসায় যে মেয়েটা কাজ করতো তার সাথে কিছুদিন আগে আমাদের ড্রাইভারের বিয়ে হয়েছে। এই ড্রাইভার ছেলেটাই কিন্তু চুরি করতে ঢুকেছিল আমাদের বাড়িতে, আপনাকে আগে বলেছিলাম বোধহয়। ওর এই পরিবর্তন দেখে এত ভালো লাগে। আমরা খুব দ্রুত মানুষকে বিচার করে ফেলি।'

কম্পমান হাতে চিঠিটা আবারও দেখলো সায়াকা।

"বাবা তাহলে আসলেও এসেছিল এখানে। এখানেই থাকতো।"

"একটু চিন্তা করে দেখো, ওনাদের যদি বাসায় পরিচারিকা রাখার সক্ষমতা থাকে, তাহলে ড্রাইভার রাখাও কোনো ব্যাপার না। এটা আরো আগে ভাবা উচিত ছিল আমার।"

"কিন্তু বাবা চুরি করার জন্যে ঢুকেছিল এখানে..."

"শোনো, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে অনেক কিছুই করতে হয় মানুষকে এটা নিয়ে বেশি ভেবো না। আর চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে, কেবল চুরির চেষ্টা করেছিল সে। মিকুরিয়া পরিবারও পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেনি।"

"এরপর তাকে ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দেয়।"

"হ্যাঁ, কেইচিরো মিকুরিয়াও বুঝতে পেরেছিলেন যে বাধ্য হয়েই চুরি করতে ঢুকেছিলেন আংকেল।"

"তাহলে বাবার ভাগ্য ভালো বলতে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ," জবাবে বলি।

চিঠি হাতে বিছানা থেকে উঠে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলো সায়াকা।

"কেইচিরো মিকুরিয়া বাবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করেছেন নিশ্চয়ই।"

"অসম্ভব কিছু না।"

"সেক্ষেত্রে," আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "যে বয়স্ক মহিলার ছবি আমরা অ্যালবামে দেখেছি, যাকে আমি দাদি বলতাম, তিনিই মিসেস মিকুরিয়া। বাবা সবসময় বলতো যে উনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন।"

একমত না হয়ে পারলাম না।

"কিন্তু," আবার আঁধার ঘনালো ওর চেহারায়। "বাবা আমাকে এই ব্যাপারে কিছু বলেনি কেন? বললেই তো ভালো হতো।"

"কোনো বাবা-মাই চায় না অতীতের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে তার সন্তান কিছু জানুক।"

মাথা একদিকে কাত করে কিছুক্ষণ ভাবে সায়াকা, এরপর আমার উদ্দেশ্যে চিঠিটা নেড়ে জিজ্ঞেস করে, "আমার কি এটা নেয়া উচিত হবে?"

"অবশ্যই। এটা তোমারই প্রাপ্য।"

মৃদু হেসে চিঠিটা সুন্দরমত ভাঁজ করে স্কার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সায়াকা।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। "বাইরে যাই একটু।"

"কোথায়?"

"দেখি গাড়িতে কী যন্ত্রপাতি আছে। ওটা খোলার চেষ্টা করবো," সিন্দুকের মতন বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বলি। "ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকলেও থাকতে পারে।"

"পারবে খুলতে?"

"দেখা যাক।" ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশের গাছপালা সব বিলীন হয়ে গেছে অন্ধকারে। গাড়ির কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমার জুতো কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

এরকম একটা জায়গায় বাড়ি বানানোর মানে কী? ছুটি কাটানোর জায়গা হলে তা-ও মানা যেত, কিন্তু একজন বিচারকের পরিবার এখানে থাকবে কেন?

অনেক কিছুই অদ্ভুত ঠেকছে এখনও।

আমার গাড়িতে যন্ত্রপাতি বলতে কাঠের কিছু যন্ত্রপাতি। ছুটির দিনগুলোতে শখের বশে কাঠ দিয়ে এটাসেটা করি আমি। এগুলো আদৌ কোনো কাজে আসবে কিনা কে জানে।

ভেতরে ফিরে দেখি সায়াকা বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন যেরকম মানসিক আর শারীরিক ধকল গেছে বেচারির উপর দিয়ে, ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক। আমি কোনো শব্দ না করে যন্ত্রপাতির বাক্সটা নামিয়ে পাশের রকিং চেয়ারটায় বসলাম। পুরোনো চেয়ারটা আমার ভার সইতে না পেরে মৃদু ক্যাচ শব্দ করে উঠলো একবার, তবে সায়াকার ঘুম ভাঙল না তাতে।

ইউসুকের ডায়রি আর চিঠিগুলোর ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে ঘরময় চোখ বুলালাম একবার। মোটামুটি একটা চিত্র দাঁড় করিয়ে ফেললাম কিছুক্ষণের মধ্যে।

প্রথমে, এই বাড়িটার মূল বাসিন্দা ছিল তিনজন। কেইচিরো মিকুরিয়া, তার স্ত্রী এবং বড় ছেলে। এছাড়াও তখন বাড়িতে কাজ করতো 'ওটাই 'আন্টি', যার আসল নাম তামিকো কুরাহাশি। মাঝে সন্তান লালন পালনের জন্যে কিছুদিনের বিরতি নেয় তামিকো।

বাড়ির প্রধান, কেইচিরো চেয়েছিলেন বড় ছেলে তার মতই বিচারক হবে, কিন্তু তার আশায় পানি ঢেলে দেয় ছেলেটা।

দ্বিতীয় সন্তান হলে, তাকে নিয়ে প্রত্যাশার জাল বুনতে শুরু করেন তিনি। ততদিনে বড় ছেলে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেয়ার পর বিয়েও করে ফেলেছে। দু'বছরের মাথায় মারা যায় তার প্রথম স্ত্রী। এরপর এক পিয়ানোবাদিকাকে বিয়ে করে সে। তবে সেটা যে কতদিন পরের কথা, তা চিঠিতে উল্লেখ নেই।

একসময় জুয়ার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে ইউসুকের বড় ভাই। প্রচুর টাকা ধার করে এর-ওর কাছ থেকে। এই কথা জানাজানি হবার পর শিক্ষকতার চাকরিও ছাড়তে হয় তাকে।

ইউসুকে যখন প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী, তখন কেইচিরো মিকুরিয়া পরলোকগমন করেন। খুব সম্ভবত ব্রেইন টিউমর হয়েছিল তার। এই সুযোগে বড় ছেলে ফিরে আসে বাসায়।

এরপর প্রায় এক বছর বড় ভাইয়ের হাতে নির্যাতনের শিকার হয় ইউসুকে। এক পর্যায়ে ডায়রিতে তার মৃত্যু কামনা করে ছেলেটা, নির্যাতনের মাত্রা এতই বেশি ছিল।

ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে মারা যায় ইউসুকে।

এই বাড়িটার এরকম বিমর্ষ হাল কেন, তা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি এখন। বিজ্ঞানকে হিসেবের আওতার বাইরে রেখে বললে, বাড়িটা অভিশপ্ত। সেই অভিশাপের কারণেই সায়াকার স্মৃতিবিভ্রাট হয়েছে কিনা, তা জানতে হবে।

এসবই ভাবছি, এমন সময় ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠলো সায়াকা। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

বিছানায় গোঙাচ্ছে ও। সাপের মত মোচড় খাচ্ছে পুরো শরীর। সামনে এগিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম।

"কী হয়েছে! ওঠো! ওঠো।"

ওর গালে কয়েকবার চাপড় দিলাম ধীরে।

অল্প চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকালো সায়াকা, যেন কিছু একটা খুঁজছে। এরপর আমাকে দেখতে পেল সামনে। কাঁধজোড়া এখনও কাঁপছে মৃদু।

"কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখছিলে?"

ফ্যাকাসে হয়ে আসা গালে দুই হাত রেখে আবারো চারপাশে নজর বুলালো ও।

"কালো ফুলদানি, সবুজ পর্দা..." ঘোরলাগা কণ্ঠে বললো একটু পর।

"কী?"

"হ্যাঁ, ছিল তো! লম্বা কালো ফুলদানি, সবুজ পর্দা। ওই ঘরে! আমি যেখানে গিয়েছিলাম। "

"কোন ঘর?"

"ওই যে ওখানে," বলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল সায়াকা। আমিও টর্চ হাতে গেলাম পেছন পেছন।

নিচতলায় চলে এলো ও। লিভিং রুম পার হয়ে ডাইনিং রুমের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে ছোট্ট করিডোরটার একদম মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"কী হলো?"

দেয়ালের দিকে ইশারা করলো ও। "এই যে এখানে।"

"এখানে? কী এখানে?"

"দরজা।"

"দরজা?"

"এখানে একটা দরজা ছিল, আমি ভেতরে গিয়েছিলাম। ঘরটায় কালো ফুলদানি আর সবুজ পর্দা। ওখানে, আমি..."

এটুকু বলে মেঝেতে ঢলে পড়লো সায়াকা।

8

পিয়ানোর উপরে রাখা পুতুলটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সায়াকা'কে একটা সোফার উপরে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু ওর জ্ঞান আছে কিনা, তা বুঝতে পারছি না। চোখ খোলা হলেও শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিলিং বরাবর।

"সায়াকা!" জোরে ডাক দিলাম একবার। ওর মণিগুলো ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো আমার দিকে। চোখ পিটপিট করলো কয়েকবার।

"সরি," ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললো একটু পর।

"তুমি ঠিক আছো?"

"হ্যাঁ। এখন ঠিক আছি।" উঠে বসলো ঠিকই, কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে ঠিক আছে। চোখ বন্ধ করে ওভাবেই রইলো টানা কিছুক্ষণ।

"তুমি হঠাৎ ওভাবে পড়ে যাওয়ায় চমকে গেছি।"

"তাই?" দুর্বল হেসে বলে সায়াকা। "প্রথমবার হলো এমনটা। হঠাৎই গা গুলিয়ে উঠলো একবার, এরপর সবকিছু ঘুরতে শুরু করলো বনবন করে, আর কিছু জানি না।"

"কোথাও ব্যথা করছে?"

"না, সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।"

ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

"অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে অদ্ভুত কীসব যেন বলছিলে।"

বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি কয়েকবার ঘষলো ও। "হ্যাঁ, আসলেও অদ্ভুত।"

"স্বপ্ন দেখছিলে?"

"বলা যায়। কিন্তু ঠিক স্বপ্নও না। আসলেও মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা দেখেছি।"

"ওখানে?"

"হ্যাঁ, ভেতরে একটা কালো ফুলদানি আর সবুজ পর্দা।"

উঠে দাঁড়িয়ে কম্পমান পায়ে যেখানটায় জ্ঞান হারিয়েছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল সায়াকা। আমিও পিছে পিছে গেলাম।

"এখানে একটা দরজা ছিল, যেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতাম," করিডোরের দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে আবারও সেই একই কথা বললো ও।

"কিন্তু এখানে তো কোনো দরজা নেই," আমি ওকে বলি। "আর ওরকম কোনো ঘরও নেই, কারণ দেয়ালের ওপাশে তাতামি ঘরটা। "

"হ্যাঁ," বলে দুই হাতে কপাল চেপে ধরে সায়াকা। "কিন্তু আমার পরিষ্কার মনে আছে এখানে একটা দরজা ছিল। সেই দরজা দিয়েই রুমটার ভেতরে ঢুকতাম। আসলেও অদ্ভুত। দরজাটা নেই কেন এখানে?" অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলো ও।

“আমি একটা গর্দভ। যেহেতু দেখাই যাচ্ছে যে এখানে দরজা নেই, তাহলে তো আসলেও নেই। কিছু বলা অর্থহীন।”

“অন্য কোনো ঘরের সাথে গুলিয়ে ফেলোনি তো?”

সম্ভবত ওর মনে ধরলো কথাটা। গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। কিন্তু খানিক বাদেই মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিল। চেহারায় আত্মবিশ্বাস প্রকট হচ্ছে ক্রমশ।

“নাহ, সন্দেহ নেই। এখানেই ছিল। দরজাটা খুললে সেখান থেকে রান্নাঘর দেখা যেত।”

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টর্চ ফেললাম দেয়ালে। কিন্তু সেখানে পুরোনো কোনো দরজার চিহ্নমাত্র নেই। বরং আমার নজর কাড়লো পাশের পিলারটা।

“আরে, এটা কী?”

সামনের দেয়ালে আমার চোখের সমান্তরালে তিন সেন্টিমিটারের মতন লম্বা একটা বলপয়েন্ট কলমের দাগ।

“নিচেও আছে দেখো,” সায়াকা বললো।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি আমি যে দাগটা দেখেছি তার কিছুটা নিচে আরো একটা দাগ। সেটার নিচেও একই রকম দাগ বেশ কয়েকটা।

“উচ্চতার তুলনা করছিল বোধহয়। তখন দাগ দিয়েছে, নাকি?”

“উচ্চতার তুলনা?”

“কেন, নার্সারির ছড়া-গানটা মনে নেই? ওটা গাওয়ার সময়েই তো পিলারে দাগ দেয় বাচ্চারা।”

“ওহ, ওইটা।”

আমি নিজে আসলে কখনো এরকম কিছু করিনি। গানটা অবশ্য জানি। লোকে যে আসলেও ওটা গাওয়ার সময় পিলারে দাগ দেয়, তা জানতাম না।

পিলারটা টর্চের আলোয় দেখতে লাগলাম। সবচেয়ে নিচের দাগটা মেঝে থেকে আশি সেন্টিমিটার উপরে। সেখানে দাগের পাশাপাশি কিছু একটা লেখাও আছে।

ঝাপসা হয়ে আসা হাতের লেখাটা পড়লাম। “৫ মে, ইউসুকের তিন বছর।”

“হ্যাঁ, কোন বয়সে কতটুকু লম্বা ছিল, সেটা বোঝানোর জন্যেই দেয়া হয়েছে দাগগুলো,” মাথা নেড়ে বলে সায়াকা। “এটা ইউসুকের নানান বয়সের উচ্চতার রেকর্ড বলতে পার।”

“কিন্তু সেটা তোমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে না?”

“কেন?”

“সবচেয়ে উপরের দাগটা দেখ, প্রায় ছয় ফিট।”

“তো কী...” বলতে গিয়েও থেমে গেল সায়াকা। পরক্ষণে চোখ বড় বড় করে বললো, “ইউসুকে তো প্রাইমারি স্কুলের ষষ্ঠ গ্রেডে থাকতে মারা গেছে।”

“তাহলে, হিসেব অনুযায়ী তার বয়স তখন ছিল এগারো কি বারো। যদি বয়সের তুলনায় তাড়াতাড়িও লম্বা হয়, তবুও এখানে পৌঁছানোর কথা না।”

"তাহলে এটা কার উচ্চতা?"

"ইউসুকের যদি না হয়, তাহলে ওর ভাইয়ের।" আবারও পিলারে টর্চের আলো ফেললাম। হয়তো তার নামও এখানে লেখা আছে কোথাও।

"হতে পারে..."

নিশ্চিত কোনো জবাব না পেয়ে চুপ করে রইলাম আমরা।

"আচ্ছা, আমরা দরজাটা নিয়ে ভাবি বরং," সায়াকার উদ্দেশ্যে বললাম। "তোমার এটা মনে আছে যে এখানে একটা দরজা ছিল, যেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে?"

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ও।

"ফুলদানি আর পর্দা বাদে অন্য কোনো কিছুর কথা কি মনে আছে?"

"অন্য কোনোকিছু..." ওর নিষ্প্রাণ চোখ দু'টো আশপাশের অন্ধকার কোণে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যেখানে টর্চের আলো পৌঁছাতে পারছে না। "অনেক বেশি অন্ধকার ছিল... অনেক বেশি।"

"ঘরটায় কী করছিলে তুমি, মনে আছে? কিছু ঘটেছিল ?"

"কী জানি! ভুলে গেছি আসলে।" হাতে মাথা রেখে আমার দিকে তাকালো সায়াকা। দৃষ্টিতে ভয়।

"কী হলো?"

"মনে করতে পারছি না, কিন্তু ভয় লাগছে খুব।"

"ভয় লাগছে?"

"হ্যাঁ। যখনই রুমটার কথা মনে হয়, অস্বস্তি চেপে বসে মনে। আমারই অন্য এক সত্ত্বা যেন বারবার সতর্ক করছে আর কিছু না জানার চেষ্টা করতে। সেজন্যেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসতে গিয়েও আসছে না..." দেয়ালে ঠেস দিয়ে কথাগুলো বললো সায়াকা, যেন দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। "মাথা ব্যথা করছে।"

"কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই চলো।"

আবারও লিভিং রুমের সোফায় নিয়ে বসালাম ওকে। সামনে ঝুঁকে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজলো। পিঠ কেঁপে উঠছে বারবার। ওর এই হাল প্রমাণ করছে যে আসলেও ঘরটায় খারাপ কোনো অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিল ও। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সামনে কোনো দরজাই নেই, ঘর তো দূরের কথা। এর ব্যাখা কী? সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত জবাব হতে পারে, ওর কোনো ভুল হচ্ছে। কিন্তু এমন একটা ভুল কেন হবে?

এই প্রশ্নের জবাব এত সহজে মিলবে বলে মনে হয় না। বাড়িটায় আসার পর থেকে রহস্য বাড়ছে তো বাড়ছেই। কিন্তু যুতসই কোনো জবাব পাচ্ছি না।

যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে একটা হাতুড়ি আর মোটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরে গেলাম সিন্দুকটা খোলার জন্যে।

বেশ পুরোনো হলেও পোক্ত সিন্দুক। উপরের ঢাকনাটা শক্ত হয়ে এঁটে আছে। স্ক্রু ড্রাইভারের মাথাটা ঢুকিয়ে চাড় দেয়ার চেষ্টা করলাম। একবার ক্যাচ করে শব্দ

হলো, কিন্তু ঢাকনা নড়লো না একচুল। আবার অন্য জায়গায় স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে একই কাজ করলাম, এবারেও লাভ হলো না কোনো। বরং, আরেকটু হলেই স্ক্রু ড্রাইভারই ভাঙতে বসেছিল। এভাবে আধঘণ্টা চেষ্টার পর হাতের জিনিসগুলো ছুড়ে ফেলে রকিং চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম হতাশ মনোরথে।

এভাবে চেষ্টা করার চেয়ে কম্বিনেশন মিলিয়ে খোলাই সহজ হবে বোধহয়। মালিক নিশ্চয়ই কোথাও লিখে লুকিয়ে রেখেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কেইচিরো মিকুরিয়ার ডেস্কের দিকে এগোলাম। সায়াকা অবশ্য আগে একবার তল্লাশি চালিয়েছে এখানে। কাজে আসতে পারে এমন কিছু পায়নি বলেছিল। ওর কথাই ঠিক। পড়ার টেবিলে বই খাতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, ওরকম কিছু নেই। কেবল মাত্র আনকোরা নতুন একটা নোটবুক চোখে পড়লো। ভেতরের পাতাগুলো খালি।

টেবিলটা ছেড়ে ঘরের প্রতিটা কোনায় কোনায় টর্চের আলো ফেললাম। কোথাও হয়তো লেখা থাকবে সিন্দুকের কম্বিনেশন। কিন্তু বাড়ির মালিক আমার মত করে না-ও ভাবতে পারে।

এসময় হঠাৎই জানালার সামনে রাখা টেলিস্কোপটার দিকে নজর গেল। ওটার পাশেই একটা কেসে টেলিস্কোপের বিভিন্ন অংশ রাখা। কেসটা খুললাম। ভেতরে বাড়তি একটা লেন্স আর কাপড়ে মোড়ানো ফিল্টার। সেই সাথে একটা রেকর্ড পেপার, যেখানে কালো কালিতে লেখা ‘জুলাইয়ের ২৫ তারিখ, আজ বুধ গ্রহ দেখেছি।’ চিঠির হাতের লেখার সাথে মিলে গেল এই লেখা। অর্থাৎ, কেইচিরো মিকুরিয়াই লিখেছে এটা।

কাগজটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। সবকিছু আগের মত গুছিয়ে রেখে আবারও হাতুড়ি আর স্ক্রু ড্রাইভার তুলে নিলাম হাতে। সর্বশক্তিতে ঝাপিয়ে পড়লাম সিন্দুকটার উপরে। হাতুরি দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের উপরে বাড়ি বসিয়েছে দশবার, এমন সময় টের পেলাম পেছনের দরজাটা খুলে গেল। তাকিয়ে দেখি সায়াকা ঢুকছে ঘরে।

“শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছে?” জিজ্ঞেস করি।

“না, ঘুম আসছে না। অস্থির লাগছে।” “লাগারই কথা।”

বিছানায় বসলো ও।

“বাবার কথা ভাবছিলাম। এই বাড়িটার কথা বা মিকুরিয়াদের উপকারের কথা কেন আমাকে বলেনি, কে জানে!”

“কারণ, সেক্ষেত্রে অতীতের ভুলগুলোর ব্যাপারেও বলতে হতো।”

“এজন্যেই কি? চাইলে তো ওটুকু বাদও দিতে পারত।”

“তোমার কাছে কী কারণ মনে হচ্ছে?”

“জানি না, হয়তো আমার ভালোর জন্যেই।”

“তোমার ভালোর জন্যে? মানে?”

“বাবা নিশ্চয়ই ভেবেছে অতীত সম্পর্কে জানার পর যদি এই বাড়িতে ফিরে আসি তাহলে হয়তো সবকিছু আবারো মনে পড়ে যাবে। এজন্যেই বলেনি।”

স্ক্রু ড্রাইভার আর হাতুড়ি হাত বদল করলাম।

“তাহলে আমরা এখানে এসে যা করছি, সেটা করা উচিত হচ্ছে না।” মাথা ঝাঁকায় সায়াকা, যেন ও নিজেও বুঝতে পারছে না যে কাজটা উচিত হচ্ছে কিনা। বিছানায় একপাশে রাখা চিঠিগুলো তুলে নিল এসময়।

“এগুলো এখানে কেন, বলো তো। এমন যদি হতো যে কেইচিরো মিকুরিয়া চিঠিগুলোর প্রাপক, তাও বুঝতাম। কিন্তু, যে প্রেরক, তার কাছেই চিঠিগুলো থেকে যাওয়াটা একটু অদ্ভুতই।”

“আচ্ছা, এমনটা কি হতে পারে যে নাকানো মাসাতসুগু কোনো কারণে চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ধরো, মিস্টার মিকুরিয়ার মৃত্যুর পর? শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে?”

“চিঠিগুলোর গুরুত্ব যদি এতই বেশি হয়ে থাকে, তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় নিয়ে গেল না কেন? ইউসুকের ডায়রির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।”

গুঙিয়ে উঠলাম। এই পরিবারের সবাই একই সাথে কোথায় যে উধাও হলো, সেই ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।

“আরেকটা ব্যাপার,” সায়াকা বলে। “চিঠিগুলোর খাম কোথায়?”

“ফেলে দিয়েছে বোধহয়।”

“কেন?”

“কে জানে,” ওর এই প্রশ্ন শুনে বিভ্রান্ত না হয়ে পারলাম না। “কী বোঝাতে চাইছ?”

“কিছু বোঝাতে চাইছি না...” চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। “এই বাড়িটার ঠিকানা কিন্তু এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি আমরা, এটা খেয়াল করেছ?”

“ঠিকানা?”

“হ্যাঁ।”

“জানব না কেন? নাগানো প্রিফেকচার, কৌমি...”

আমি কথা শেষ করার আগে মাথা ঝাঁকায় সায়াকা। “উঁহু, সেটা বলছি না। সাধারণত, প্রতি বাসাতেই কিন্তু অন্তত একটা কিছু থাকে, যেটায় ঠিকানার উল্লেখ আছে, তাই না? এই ধরো বিজনেস কার্ড, পোস্টকার্ডএরকম। এখানে কিন্তু ওরকম কিছু নেই।”

“আসলেই তো, ঠিক বলেছ।” কোমরে দুই হাত রেখে আশপাশে তাকালাম। “তোমার মতে এটা ইচ্ছাকৃত?”

“সেটাই তো মনে হচ্ছে। নতুবা, কিছু থাকবে না কেন? কিন্তু এরকমটা করার কারণ কী...”

এক মুহূর্ত চুপ থাকলাম দু'জনই। এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব নেই আপাতত। সিন্দুকটার দিকে ফিরে লকের পাশে ইঞ্চিখানেক ফাঁকা জায়গায় স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিতে শুরু করলাম।

"এটা কি আদৌ খুলবে?" উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করে সায়াকা। "বোঝা যাচ্ছে না। একটু ফাঁকা হয়েছে আগের তুলনায়।" "সিন্দুক সহজে খুলতে পারার কথাও না।"

হয়তো ঠাট্টাচ্ছলে বলেনি সায়াকা, কিন্তু ওর এই কথায় হালকা হলো পরিবেশ।

"তা ঠিক," হাসতে হাসতে বললাম।

স্ক্রু ড্রাইভারটা যখন ভাঙল, তখনও 'আমার মুখে হাসি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফলাটা ছিটকে এসে বাম কব্জির একদম মাঝে গেঁথে গেল। রক্ত বের হচ্ছে চুইয়ে চুইয়ে।

"আহহা!"

"বেশি ব্যথা পাইনি।" পকেট থেকে একটা টিস্যু পেপার বের করলাম। "দাঁড়াও, আমি গিয়ে ফাস্ট এইড কিটটা নিয়ে আসছি," সায়াকা বলে।

"ফার্স্ট এইড কিট?"

"হ্যাঁ, রান্নাঘরে আছে।"

দুই কি তিন মিনিট পর একটা ছোট বাদামি বাক্স নিয়ে ফিরে এলো সায়াকা। সামনের দিকে একটা লাল রঙের ক্রস আঁকা।

"রান্নাঘরে ছিল এটা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, নিচের দুই পাল্লার কাবার্ডটার ভেতরে।"

ফাস্ট এইড কিটটার ভেতরে মূলত মাথাব্যথার ঔষধ, গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ, বার্ন ক্রিম আর কিছু ব্যান্ডেজ। কোনোটাই খোলা হয়নি।

"ক্ষতস্থানে লাগানোর ঔষধও আছে," বলে চিকন একটা ওয়েনমেন্টের টিউব বের করলো সায়াকা।

"এটা যে কতদিন ধরে এখানে আছে, কে জানে। ব্যবহার করা কি ঠিক হবে?"

"দশ বছর আগের," বাক্সটার গায়ের লেখা দেখে বললো সায়াকা।

"তাহলে বাদ দাও।"

"আচ্ছা, ব্যান্ডেজ করে দেই অন্তত।"

দক্ষ হাতে গজ কাপড় কেটে সেটা ক্ষতের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে দিল সায়াকা।

"তুমি দেখি ভালোই পার এই কাজ।"

"মিহারু'কে ব্যান্ডেজ করে দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"ছোট্ট মিহারু কি প্রায়ই ব্যথা পায় নাকি?"

"হ্যাঁ, আমিই ব্যথা দেই।"

মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললাম কিছুক্ষণের জন্যে। উজবুকের মতন একটা প্রশ্ন করে ফেলেছি।

কাঁধ ঝাঁকাল সায়াকা। “ওকে নিজেই ব্যথা দিয়ে আবার ব্যান্ডেজ করে দেই। সমস্যাটা আমারই, তাই না?”

কিছু না বলে ব্যান্ডেজটায় ছুঁয়ে দেখলাম একবার, কথার বিষয়বস্তু পাল্টাতে চাইছি যত দ্রুত সম্ভব, তাই ফাস্ট এইড কিটটার দিকে তাকালাম।

ঢাকনাটার উল্টো পিঠে একটা পকেট আছে। যেখানে টেস্ট রিপোর্ট আর হেলথ ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স কার্ড রাখা হয় সাধারণত। ভেতরে হাত দিলাম। একটাই কার্ড সেখানে। তবে সেটা কোনো টেস্ট রিপোর্ট বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড নয়।

ইংরেজিতে ‘ফ্যামিলি হেলথ কার্ড’ লেখা উপরে। ডাক্তারের নাম, পরিবারের সদস্যদের নাম আর প্রতিদিনকার ঔষধের তালিকা লেখার ঘর দেখতে পেলাম। বেশিরভাগ ঘরই খালি, শুধু পরিবারের সদস্যদের নাম লেখা। কেইচিরো মিকুরিয়া, ফুজিকো আর ইউসুকে নাম তিনটা পরপর লিখেছে কেউ। ফুজিকো নিশ্চয়ই ইউসুকের মা, যাকে সায়াকা ‘দাদি’ বলে ডাকত।

রক্তের গ্রুপ লেখার জায়গায় কেবল কেইচিরো মিকুরিয়ারটা লেখা। বাকিগুলো খালি। ‘ও’ রক্তের গ্রুপ ছিল ভদ্রলোকের।

“ইউসুকের বাবার রক্তের গ্রুপ ও,” বলে কার্ডটা সায়াকার দিকে এগিয়ে দেই।

“ও?” কার্ডটার দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল ও। “কোথাও একটা সমস্যা আছে।”

“কী সমস্যা?” জিজ্ঞেস করি।

ইউসুকের ডায়রিতে কিন্তু এক জায়গায় রক্তের গ্রুপের কথা লেখা ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে...” আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও। আমিও অনুসরণ করলাম ওকে।

লিভিং রুমে আসার পর কফি টেবিল থেকে ডায়রিটা তুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সায়াকা। চেহারা গম্ভীর।

“পেয়েছি, এই যে এখানে,” আমাকে দেখাল ও।

এর আগে লেখাটায় কেবল চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলাম। স্কুলের রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা লিখেছিল ইউসুকে।

> ‘১১ মে, রোদ
> আজ স্কুলে আমাদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আমি আগের তুলনায় লম্বা হয়েছি। কিন্তু ওজন খুব একটা বাড়েনি। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের জন্যে রক্তও নিয়েছিল। সাধারণত চার ধরনের রক্তের গ্রুপ আছে। এ, বি, এবি আর ও। সেই সাথে যোগ হয় আরএইচ পজিটিভ আর নেগেটিভ। সাধারণত হাজারে একজনের আরএইচ নেগেটিভ থাকে। আমার ব্লাড গ্রুপ এবি। আর-

> এইচ ফ্যাক্টর পজিটিভ। সুতরাং এবি পজিটিভ। কোনদোর কাছে একটা বই আছে যেখানে রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ওটা একদমই কাজের না। বাসায় ফিরে মা'র ব্লাড গ্রুপ কি, তা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু মা জানে না। আগেকার মানুষেরা বোধহয় এসব ব্যাপারে খুব বেশি কিছু পড়েনি। বাবাকেও জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অফিসে বাড়তি চাপের জন্যে আজকে সে বাসায় ফিরবে না।'

সায়াকার দিকে তাকালাম। "ইউসুকের রক্তের গ্রুপ এবি?" নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

"তাহলে তো বিষয়টা আসলেও অদ্ভুত। কারো বাবার রক্তের গ্রুপ যদি 'ও' হয়, তখন মা'র রক্তের গ্রুপ 'এ' বা 'বি' যা-ই হোক না কেন, সন্তানের রক্তের গ্রুপ 'এবি' হবে না কখনোই।"

৫

"তোমার গাড়ির চাবিটা আমাকে একটু দিবে?" হঠাৎই জিজ্ঞেস করলো সায়াকা। আমার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে একসাথে, তাই বুঝতে একটু সময় লাগলো।

"চাবি? নিশ্চয়ই," বলে পকেট থেকে চাবি বের করে দিলাম ওকে। "কী করবে?"

চাবিটা নিয়ে একবার ভ্রু নাচাল ও। "একটু ঘুরে আসছি।"

"ঘুরে আসবে? এই সময়ে?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবো।"

"এখন কি ঘুরতে-" বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নিশ্চয়ই বাথরুমে যেতে হবে ওকে। নিজের বোকামিতে নিজের উপরেই বিরক্ত হলাম। "চলো, আমিও যাব তোমার সাথে। একা যাওয়াটা নিরাপদ না-ও হতে পারে।"

"আরে, চিন্তার কিছু নেই।"

"আমারও যেতে হবে আসলে।"

মুখ বাঁকিয়ে চাবিটা ফেরত দিল ও।

"আচ্ছা, রক্তের গ্রুপের ব্যাপারটা..." গাড়ি বেশ কিছুদূর আসার পর বলে সায়াকা। "কী মনে হচ্ছে তোমার?"

"যদি ইউসুকে আর কেইচিরো মিকুরিয়ার রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে কোনো ভুল না হয়ে থাকে," স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়ির চাকা কাদা থেকে উঠিয়ে বললাম। "তাহলে তারা বাবা-ছেলে নয়।"

"আমিও এটাই ভাবছিলাম..." শ্বাস চেপে বলে সায়াকা। "ওকে কি তাহলে দত্তক নিয়েছিলেন উনারা?"

"না, আমার সেটা মনে হয় না। চিঠিতে তো ইউসুকের জন্মের ব্যাপারে খুশি মনেই মিস্টার মাসাতসুগুকে জানাতে দেখেছি কেইচিরো মিকুরিয়াকে।"

"তা ঠিক। কিন্তু দত্তক যদি না নিয়ে থাকে... আর সে যদি কেইচিরো মিকুরিয়ার নিজের ছেলে না হয়, তাহলে-" সায়াকা যেন দ্বিধায় ভুগছে পরের কথাটা বলবে কিনা। আমি আঁচ করতে পারছি ওর মনে কী ঘুরছে।

"এমনটা হতে পারে যে মিসেস মিকুরিয়ার অন্য কারো সাথে সম্পর্ক ছিল, ইউসুকে তার ছেলে।"

"নাহ, এটা একটু বেশি বেশি বলে ফেললে। ডায়রি পড়ে এমনটা মনে হয়নি।"

"আমারও সেটাই মনে হচ্ছে।"

"কেন?"

"স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিনে মা'কে নিজের রক্তের গ্রুপ বলেছিল ইউসুকে। সে যদি মিসেস মিকুরিয়া এবং অন্য কারো সন্তান হতো, তাহলে কথাটা শোনার পর চিন্তায় পড়ে যাওয়ার কথা মহিলার। কিন্তু, ডায়রিতে সেরকম কিছু লেখেনি ইউসুকে।"

"ঠিক বলেছ। তাহলে কেইচিরো মিকুরিয়া জানতেন যে ইউসুকে তার ছেলে নয়, তবুও মন থেকে ভালোবাসতেন ওকে..." গালে হাত রাখে সায়াকা। "নাহ, ভজকট পাকিয়ে যাচ্ছে সব।"

"ইউসুকের আসল বাবার পরিচয় জানা নেই আমাদের, এটাই সমস্যা।" কিছুক্ষণ পর পাকা রাস্তায় উঠে এলো গাড়ি। বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমেছে, তবে উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার বন্ধ করার মত অবস্থায় আসেনি। কোনো পথবাতি নেই দুই পাশে। আঁকাবাঁকা রাস্তা। দেখতে কিছুটা সমস্যাই হচ্ছে। তবে এই সময়ে উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসার ভয় নেই। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত দু'টো।

মাতসুবারা লেকের পাবলিক পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম একটু পর। লেক পার্কের এক কোনায় নারী পুরুষের আলাদা টয়লেট আগেই চোখে পড়েছিল। ইউরিনালের সামনে দাঁড়িয়ে হালকা হতে হতে ভাবতে লাগলাম এরকম একটা জায়গায় কী করছি আমি। সায়াকার সমস্যার সমাধানের জন্যে এত দূরে এসে পড়েছি?

টয়লেট থেকে বেরিয়ে লেকের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। শান্ত হয়ে এসেছে পরিবেশ, কিন্তু লেকের পানিতে কাঁপন ঠিকই উঠছে একটু পরপর। উল্টোদিকে ঘন বন। একদম কালো দেখাচ্ছে এখন।

"মনে হচ্ছে যেন দুনিয়ার সব রাক্ষসের বাস ওখানে," সায়াকা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পাইনি।

"এই প্রথম এত রাতে কোনো লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি।"

"রাতের সমুদ্রও ভয়ঙ্কর, কিন্তু এখানকার পরিবেশ অন্যরকম। মনে হচ্ছে যেন সময় ভিন্ন নিয়মে প্রবাহিত হয় এই এলাকায়।" টের পেলাম যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সায়াকা। আমিও ওর দিকে ঘুরলে চোখাচোখি হলো দু'জনের। সাথে সাথে অন্যদিকে তাকালো ও।

"আমার জন্যে অনেক সমস্যা হচ্ছে তোমার," বললো ও।

"নাহ। মাঝে মাঝে এরকম অ্যাডভেঞ্চার ভালই লাগে।"

"সত্যি বলতে এখানে আসার আগে ভাবিনি যে এত কিছু জানা যাবে।"

"কিন্তু তুমিই না বলেছিলে ওখানে গেলে হারানো স্মৃতি ফিরে পেতে পারি।"

"আসলে, নিজেকেই সাহস যোগাচ্ছিলাম। পরে যেন আফসোস না হয় যে স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্যে কোনো চেষ্টাই করিনি..." শূন্য দৃষ্টিতে লেকের দিকে তাকিয়ে রইলো ও কিছুক্ষণ, এরপর বললো, "তুমি আমার সাথে না এলে আসা হতো না।"

ওর এই স্বীকারোক্তি ধন্ধে ফেলে দিল আমাকে। মনের গহীনে কোথায় যেন খুশির ডঙ্কা বাজছে। জোর করে চেপে রাখতে চাইলাম সেই অনুভূতিটা।

"ভেবেছিলাম এখানে এলে কিছু একটা হবে তোমার আর আমার মাঝে। হলে যে অখুশি হতাম, তা নয়। এমনকি এটাও ভেবেছিলাম অমন কিছু হলে দুঃখ ভুলে

থাকতে পারব। কিন্তু তুমি কিছুই করোনি। বরং আমার সমস্যার সমাধানে রাজি হয়ে গেছ কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই। নাকি কিছু করার ইচ্ছে আছে সামনে?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলি। "শুরু থেকেই খেয়ালি ছিলাম যেন এমন কিছু না হয়।"

"সেটাই ভেবেছি," মৃদু হেসে বলে সায়াকা। "তুমি আগের তুলনায় একদম বদলে গেছ। তখন সবসময়ই বলতে যে সেক্স গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।"

"এখন পরিস্থিতি এক নয়।"

"তা ঠিক, আমি বিবাহিত," খানিকটা ঠাট্টার সুরে কথাটা বললো সায়াকা। পা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে। "আমাকে ঘৃণা করতে, তাই না?"

"মানে?"

"ব্রেকআপের পর?"

"আরে... ওটা অনেক দিন আগের কথা।"

"তুমি কথা না বলতে চাইলে থাক।"

"না, বলো। সমস্যা নেই।" পকেটে হাত ঢুকালাম। চুইং গামের প্যাকেটটা এখনও রয়ে গেছে ওখানে। বের করে একটা মুখে দিলাম। সায়াকাকে সাধলে মানা করে দিল।

"তোমাকে কখনোই ঘৃণা করিনি আমি। দোষও দেইনি কোনো প্রকার, চুইং গামের প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে বলি। "তবে আমরা প্রথমেই কথা বলে নিয়েছিলাম যে কেউ কাউকে জোর করবো না কখনো। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলাম, এটা ঠিক। অবাকও হয়েছিলাম। এরকম কিছু যে ঘটবে, তা আসলেও আঁচ করতে পারিনি। তাই হুট করে যখন এসে বললে অন্য একজনকে ভালোবাসো, বিশ্বাস হচ্ছিল না।"

"বুঝতে পারছি," কয়েক কদম এগিয়ে গেলো ও, এরপর ফিরলো আমার দিকে। দুই হাত পেছনে। "আসলে, অন্য কাউকে ভালোবাসতাম, এজন্যে ব্রেকআপ করিনি। প্রথমে আমাদের সম্পর্কটা ছিন্ন করতে চেয়েছিলাম। এরপর তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে খুঁজে নিয়েছি।"

"কেন ব্রেকআপ করেছিলে?"

"এটা ব্যাখা করা কঠিন। সহজ কথায় বললে, আমাদের স্বপ্নের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।"

"সরি, বুঝতে পারছি না তোমার কথা," তিক্ত হেসে বলি। "এটার মানে কী?"

"আমাদের সেই সময়কার আলাপগুলো মনে আছে? হেন কোনো বিষয় নেই, যেটা নিয়ে কথা হতো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াত যে, আমরা অনন্য, সবার চেয়ে আলাদা। সবাইকে গর্দভ ভাবতাম, ভরসা করতাম না কাউকে। যেন বোকার স্বর্গে আমি আর তুমিই কেবল চালাক।"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

পুরোনো চায়ের দোকান, কফি, সেভেন স্টার সিগারেট। স্বস্তা বার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই...

"তোমার সাথে থাকার সময়টা ভালো লাগতো ঠিকই, কিন্তু এটাও মনে হতো যে এভাবে জীবন চলবে না। আমাদের চারপাশে যারা আছে, তাদের সবাইকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়া যায় না। শুধু দুইজনকে দিয়ে কি সমাজ চলে? ওভাবে চলতে থাকলে আমাদের দু'জনের জীবনই নষ্ট হয়ে যেত। তাই স্বপ্নটা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সেই সময়ে এটাই মনে হয়েছিল আমার।"

"তো," বলি আমি। "বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করেছিলে?"

"বলতে পারো।"

"ভবিষ্যত নিয়ে আমার চিন্তাভাবনাগুলো বোধহয় ঠিক ছিল না। বাস্তববাদী কাউকে খুঁজে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত ছিল তোমার জন্যে।"

"শুধু সেটাই না, কীভাবে বলি কথাটা..." ঘাড় একদিকে কাত করলো ও। "বাচ্চাদের মতন আচরণ ছিল আমাদের।"

"হ্যাঁ, এখন সেটাই মনে হয়।"

"তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এসব এখন অতীত।"

"ঠিক বলেছ। অতীত," ঠোঁট ভেজায় ও। "শেষ একটা কথা বলি। তোমার কি মনে হয় না যে আমরা দু'জনই একদম একই রকম ছিলাম তখন? একটু বেশিই একই রকম। তোমাকে দেখলে মনে হতো যেন আয়নায় উঁকি দিচ্ছি। ব্যাপারটা যে কতটা অস্বস্তিকর, তা বলে বোঝাতে পারব না।"

"হুম," পায়ের কাছের মাটিতে বুড়ো আঙুল দিয়ে নকশা কেটে বললাম। সেই সময়কার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। একটু পরপর সেক্স, মেকি গুরুগম্ভীর আলোচনা, অলীক সব স্বপ্ন।

হঠাৎই মনে হলো বুকের ওপর কেউ ভারী একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে।

"বৃষ্টির তেজ বাড়ছে আবার," লেকের পানির অস্থিরতা খেয়াল করে বলে সায়াকা। ওর চুলও ভিজে গেছে।

"ফিরে যাই, চলো।"

৬

বৃষ্টির মধ্যেই ফেরার পথ ধরলাম আমরা। গাড়ি চালাতে চালাতে ওর স্বীকারোক্তির কথা ভাবছি। আমরা একটু বেশিই একই রকম কথাটা গেঁথে গেছে মনে। আমারও এমনটাই মনে হতো। শুধু যে আমাদের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা ধরন আর মূল্যবোধের ব্যাপার সেটা, তা নয়। বরং আমাদের ভেতরকার যা কিছু আমাদের পরিচয় বহন করে, সবই ছিল একই রকম। সেই সময়ে আসলে বুঝতে চাইতাম না ব্যাপারটা। কিন্তু অবচেতন মনে ঠিকই জানতাম।

সায়াকার সাথে যখন আমার পরিচয় হয়, তখনকার জীবন নিয়ে ভাবতে খুব একটা ভালো লাগে না আমার। অনেকটাই ছেলেবেলার বিরক্তিকর সব ছবি ভর্তি অ্যালবাম দেখার মতন ব্যাপারটা।

বাবা একজন ডাক্তার। তবে কোনো বড় হাসপাতাল নয়, বরং মফস্বলের ছোট একটা ক্লিনিকের দায়িত্বে ছিলেন। আশপাশের এলাকাগুলো থেকে রোগী আসতো তার কাছে। দু'জন নার্স ছিল সেখানে, যাদের একজন আমার মা।

জুনিয়র হাইস্কুলের প্রথম বর্ষে থাকতে আমাকে জানানো হয় যে আমি তাদের আপন ছেলে নই। এরকম একটা কথা পুরো জীবন লুকিয়ে রাখা সম্ভব না, তাই তারা সঠিক সময় বুঝে আমাকে সত্যটা জানিয়ে দেন।

বিয়ের পর লম্বা সময় অতিবাহিত হলেও তাদের কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। তারা যখন কাউকে দত্তক নেয়ার কথা ভাবছে তখন কাকতালীয়ভাবে বাবার এক চাচাত ভাইয়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। কিছুদিন আগেই সন্তান হয়েছিল সেই দম্পতির। আমার পালক বাবা-মা'কে সেই নবজাতককে দত্তক নেয়ার প্রস্তাব দিলে সানন্দে রাজি হয়ে যায় দু'জনে।

আমাকে আদর যত্নে বড় করার জন্যে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ঠিকই, কিন্তু কষ্টও পেয়েছিলাম ভীষণ। তাছাড়া, এই তথ্যটা এমন সময় জানতে পারি যখন আমার মাথায় প্রশ্ন ঘুরছিল যে বাবা-মা আমাকে নিয়ে কী ভাবে।

"তুমি আমাদেরই সন্তান, এই সত্যটা কখনোই বদলাবে না। সবকিছু আগের মতই থাকবে। এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিও না," বাবা বলে আমার উদ্দেশ্যে। নীরবে কেবল মাথা নেড়েছিলাম তখন। এরকম একটা কথার প্রেক্ষিতে কী বলা উচিত, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না সেই মুহূর্তে।

বাবা যেমনটা বলেছিল, তেমনটা মেনে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় ছিল। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ নয়। তারা যে আমার আসল বাবা-মা নয় এই কথাটা ক্ষতের সৃষ্টির করেছিল আমার মনে। দু'জনই খেয়াল করেছিল বিষয়টা। এরপর আর সহজ হতে পারিনি কখনো।

এর কিছুদিন পরেই স্কুলে যাওয়ার পথে একদিন এক মহিলা দেখা করে আমার সাথে। বুঝতে অসবিধা হয় না যে সে-ই আমার মা। কথা বলতে চাইলে মানা করিনি তাই। নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার বাবা-মা, স্কুল-এসব বিবিধ

বিষয়ে জানতে চায় সে। মাথা নিচু করে বিড়বিড়িয়ে কী বলেছিলাম সেদিন, তা আর মনে নেই।

দিন কয়েক পর বাড়িতে এসে উদয় হয় সেই নারী। আমাকে বাবা-মা নিজের ঘরে থাকতে বললেও লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনি।

ভদ্রমহিলা বলে সে তার সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। দৃঢ় কণ্ঠে তাকে মানা করে দেয় আমার পালক বাবা। তাদের কথা শুনে যা বুঝেছিলাম ওনার দ্বিতীয় বিয়েটা টেকেনি। এখন একাই থাকতে হয়, তাই ছেলেকে ফেরত চাচ্ছে।

"আমি আপনাদের সামনে হাতজোড় করছি, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। ওর জন্যে আপনারা যা খরচ করেছেন, তা আমি শোধ করে দিব," কাঁদতে কাঁদতে বলে আমার জন্মদাত্রী মা।

"এখন আপনার এই কথা বলা মানায় না। ওকে এভাবে দিয়ে দেয়া সম্ভব না আমাদের পক্ষে," চিবিয়ে কথাগুলো বলে বাবা। "তাছাড়া, শেষবার আমি আপনাকে বলেছিলাম ওর সামনে না আসতে, ভুলে গেছেন? কিন্তু আপনি কোনো প্রকার যোগাযোগ না করেই এভাবে বাড়িতে হাজির হয়েছেন।"

বাবার জবাব শুনে বুঝতে পারি কিছুদিন আগেই আমাকে সত্যটা জানানো আর ভদ্রমহিলার সাথে আমার দেখা হওয়া মোটেও কাকতালীয় নয়। ইচ্ছে করেই বলেছিল যেন আমার আসল মা এভাবে চলে এলে আকাশ থেকে না পড়ি।

লম্বা সময় আলাপ হয় তিনজনের। একটু পর তাদের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে।

"আমি কি তাহলে বাকিটা জীবন একাই কাটাবো?"

"এজন্যেই তো বলেছিলাম ভালো কাউকে খুঁজে নিন। তাছাড়া, ওকে ছাড়া আমাদেরই বা আর কে আছে? এত যত্নে মানুষ করছি কেন? আপনি এভাবে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না।"

অর্থাৎ, আমার জন্মদাত্রী মা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল একাকীত্ব ঘোচানোর জন্যে আর পালক বাবা-মা চিন্তায় ছিল আমি না থাকলে তাদের উত্তরাধিকার কে হবে?

হ্যাঁ, শুধু এ দু'টোই যে মূল কারণ, তা বললে অন্যায় হবে। তিনজনই নিজেদের মত করে ভালোবাসত আমাকে। কিন্তু তের বছরের একটা ছেলের পক্ষে সেটা বোঝা কষ্টকরই বটে।

শেষমেষ তাদের আলোচনা শেষ হলো 'কিছুদিন পর ও নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিবে' এই কথার মাধ্যমে। আমার আসল মা অবশ্য খুব একটা খুশি হয়নি কথাটা শুনে। সে ধরেই নিয়েছিল আমি মানা করে দিব।

সেদিনের পর থেকে আমার প্রতি পালক বাবা-মা'র আচরণে বেশ পরিবর্তন আসে। পালক মা আগের তুলনায় আদর যত্ন বাড়িয়ে দেয়। বাবা ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। বলে, আমি যদি ডাক্তার না হতে চাই, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আমার যে বিষয়ে আগ্রহ, সেটাই পড়াবে। সেই সাথে

বারবার ছোটবেলার নানা ঘটনার কথা বলতো বাবা। এক পর্যায়ে তো এটাও বলে যে আমাকে কত কষ্ট করে বড় করেছে দু'জনে; কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

আমার আসল মা প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর দেখা করতে শুরু করে আমার সাথে। কাছের একটা পার্কে বসে আলাপ করতাম আমরা। আসলে সে বলত, আমি শুনতাম। কথায় কথায় জানায় যে আমাকে নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না বলেই কাজটা করেছিল সে। ভীষণ আক্ষেপ হয় সেজন্যে। কথা বলার মাঝে টপটপ করে চোখ থেকে পানি ঝরতো।

এর এক সপ্তাহ পর আমার আসল মা আবারও আসে বাড়িতে। এবারে তাদের সাথে খাবার টেবিলে বসি আমি। বাবা তখন আমাকে বলে, "তুমি কার সাথে থাকতে চাও, এটা পুরোপুরি তোমার সিদ্ধান্ত। আমরা কেউ কিছু বলবো না।"

জুলুজুলু চোখে তিনজন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কিন্তু ততদিনে আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। 'আমি কী চাই' সেই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে, আমি আসলে খুঁজেছি 'সহজ সমাধান'।

"বাবা-মা'র সাথেই থাকবো," জানিয়ে দেই।

পালক বাবা-মা'র মুখে হাসি ফুটলেও আমার জন্মদাত্রী মা মুষড়ে পড়ে। তবে যাওয়ার সময় শর্ত দিয়ে যায় যে মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করতে দিতে হবে। বাবা-মা বলে যে আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি, চিন্তার কিছু নেই। কোনো রাখঢাক না করেই আমার আসল মা সম্পর্কে যা-তা বলে দু'জনে। এমনকি এটাও বলে যে আরেকটু হলে জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল আমার।

সারারাত কেঁদেছিলাম বিছানায় শুয়ে। দুঃখের কারণটা অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল, এটা ঠিক। হয়তো ধরতে পেরেছিলাম যে আমি আসলে জগতে একা।

এরপর আমার আসল মায়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত একদমই কমে যায়। হাই স্কুলের প্রথম বর্ষে উঠে জানতে পারি সে তৃতীয় বিয়ে করেছে। নিজেই কথাটা আমাকে জানায় সে। পালক বাবা-মা'র বাসায় আগের মতনই চলতে থাকে জীবন। অন্যদের সামনে আমরা একদমই সাধারণ একটা পরিবার। কিন্তু আমার কেবলই মনে হতো যে তাদের ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছি কেবল। মা-বাবার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এই পৃথিবীতে সবই আসলে ভ্রম। দিন শেষে মানুষ নির্জন দ্বীপের মতন একা- এরকম চিন্তা মাথায় নিয়েই দিনাতিপাত করতে থাকি। এরপরই দেখা হয় সায়াকার সাথে।

* * *

আবহাওয়া আরো খারাপ হয়েছে। উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির ফোটার শব্দ বাস্তবে নিয়ে এলো আমাকে। ওয়াইপারের গতি বাড়িয়ে দিলাম।

"ঘুম পেয়েছে নাকি তোমার?" জিজ্ঞেস করি।

“নাহ, এমনি চোখ বন্ধ করে আছি। ঘুমিয়েছিলাম তো একটু আগে।”

“খুব বেশি না।”

“কী ভাবছ তুমি?”

“জরুরি কিছু না।” রেডিও চালু করে দিলাম। একটা রক গান বাজছে। ব্যান্ডটা চিনিনা আমি, কিন্তু সায়াকার পরিচিত মনে হচ্ছে গানটা। তালে তালে মাথা দোলাতে লাগল।

আমরা একটু বেশিই একইরকম। ওর বলা কথাটা মনে হলো আবারও। ঠিকই বলেছিল। ওর সাথে পরিচিত হওয়া মাত্র আকর্ষিত হয়েছিলাম চুম্বকের মত। মনে হতো ও বুঝতে পারবে আমাকে। সায়াকাও একাকী ছিল সেই সময়ে। বাড়ির সাথে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে তখন। যত দ্রুত সম্ভব ওখানে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।

“তুমি কেমন যেন বদলে গেছ বাবা,” একদিন পালক মা বলে আমাকে। সম্ভবত লম্বা সময় ধরেই কথাটা মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল সে। বলার চেষ্টা করেও পারেনি।

“তাই?”

“আমাকে আর মা বলে ডাকো না। ইচ্ছে করে না?”

“ওরকম কিছু না। যাই এখন,” দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি পালিয়ে বাঁচি যেন।

সত্যি বলতে পালক বাবা-মা’কে আসলেও বাবা-মা বলতে বাধছিল আমার। কেন, তা বলতে পারব না। হয়তো আর সুখী পরিবারের অভিনয় করতে পারছিলাম না।

সুখী পরিবারের অভিনয়?

ব্রেক কষলাম আচমকা। ভেজা মাটিতে কর্কশ শব্দ করে উঠলো চাকা। সায়াকার চোখে মুখে ভয়। “পাগল হলে নাকি?”

“আমরা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। আসলে, ভুল বুঝেছি,” বলি আমি।

“ভুল বুঝেছি?”

“হ্যাঁ, ইউসুকের বাবার ব্যাপারটা। আগে বাড়িটায় যাই, চলো,” অ্যাকসেলেটর দাবানো মাত্র সামনে বাড়লো গাড়ি।

গন্তব্যে পৌঁছে এক দৌড়ে গিয়ে লিভিং রুম থেকে ইউসুকের ডায়রিটা হাতে নিলাম প্রথমে। দ্রুত পাতা উল্টে যেখান থেকে ওই লোকটার ব্যাপারে লিখতে শুরু করেছে ছেলেটা, সেখানে চলে এলাম।

“ভুল বুঝেছি বলছো কেন?”

“আমাদের বোকা বানিয়েছি ইউসুকে। অবশ্য ও নিশ্চয়ই আশা করেনি যে ডায়রিটা অন্য কেউ পড়বে, সুতরাং বোকা বানিয়েছে কথাটাও ভুল।” ডায়রিটা বন্ধ করে সায়াকার কাঁধে হাত রাখলাম। “চলো, দোতলায় যাই।”

ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরে এসে আরো একবার চিঠিগুলো পড়লাম ভালো মত।

"যেটা ভেবেছিলাম।"

"কী?"

"চিঠিগুলোতে কিন্তু কোথাও ইউসুকে'কে নিজের ছেলে বলে উল্লেখ করেননি কেইচিরো মিকুরিয়া। কারণ, তারা বাবা-ছেলে নয়। রক্তের গ্রুপ কেন মেলেনি, সেই ধাঁধার উত্তরও পেয়েছি।"

"তাহলে ইউসুকে কার ছেলে?"

"কেইচিরো মিকুরিয়ার ছেলের সন্তান ও," জবাবে বলি। "তাকে কিন্তু চিঠিতে ছেলে বলেই উল্লেখ করেছেন কেইচিরো মিকুরিয়া। সে-ই ইউসুকের বাবা।"

"এটা কীভাবে সম্ভব... কিন্তু," আঙুলে চুল পেচাচ্ছে আর খুলছে সায়াকা। "ডায়রিতে তো বড় ছেলেকে 'ওই লোকটা' বলে সম্বোধন করেছে ইউসুকে, তাই না?"

"হ্যাঁ, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই

"তাহলে সে ওর বাবা হয় কী করে?"

"তোমার এই কথা বলার কারণ হচ্ছে ইউসুকে ডায়রিতে অন্য একজনকে বাবা বলে ডেকেছে, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"এটা পরিষ্কার যে ডায়রিতে ইউসুকে যাকে বাবা বলে ডেকেছে সে হচ্ছে কেইচিরো মিকুরিয়া। কিন্তু উনি ওর আসল বাবা নন।"

"কী বলছো এসব?"

"কেইচিরো মিকুরিয়া হচ্ছে ইউসুকে মিকুরিয়ার দাদা। তেমনি, ও যাকে মা বলে ডাকে, সে আসলে ওর দাদি।"

বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করছে সায়াকা।

"এই কথা বলছো কেন?"

"ইউসুকে যাকে বাবা-মা বলে ডাকে, তাদের বয়সের পার্থক্য অনেক বেশি। আর এই চিঠিগুলোয় দেখো, ইউসুকে হওয়াতে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন কেইচিরো মিকুরিয়া। ছেলে হওয়াতে উচ্ছ্বাসের পরিমাণও বেশি ছিল। এখান থেকে তার ছেলে আর ইউসুকের বয়সের পার্থক্যের বিষয়টা পরিষ্কার হয়। তারা দুই ভাই না, বরং বাবা-ছেলে। তাদের মধ্যকার বয়সের পার্থক্য থাকাটা তাই স্বাভাবিক।"

"কিন্তু ও দাদাকে বাবা ডাকত কেন?"

"কারণ তিনিই হয়তো ওকে বড় করেছেন। চিঠিতে লেখা ছিল যে দুই বছরের মাথায় প্রথম স্ত্রী মারা যায় কেইচিরো মিকুরিয়ার ছেলের। ততদিনে ইউসুকের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই। একা একজন পুরুষের বাচ্চা দেখাশোনা করা কষ্ট বিধায় দাদা-দাদি নাতিকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল।"

“তা বুঝলাম, কিন্তু দাদাকে বাবা বলে ডাকা...” সায়াকা’কে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।

“পরিবারের দুরবস্থাই বোধহয় মূল কারণ। “

“...মানে?”

“এটা আমার আন্দাজ বলতে পারো, এখনও কোনো প্রমাণ নেই,” বলি। “চিঠিগুলো থেকে এটা নিশ্চিত যে কেইচিরো মিকুরিয়া ভীষণ কড়া একজন মানুষ। ছেলেকেও শাসন করতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জজ হতে না পারায়, ভীষণ হতাশ হন তিনি। ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান।”

“হ্যাঁ, চিঠিতে ছেলেকে নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে সে বেশ কয়েকবার।”

“শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেন কেইচিরো, কারণ ‘একটা গ্লাসে কেবলমাত্র এক গ্লাস পানিই আটবে।’ বিচারক হবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার পর শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতার পেশায় ঢোকে তার ছেলে। চিঠিগুলো থেকে এটাও স্পষ্ট যে কেইচিরো মিকুরিয়াই দেনদরবার করে ছেলেটার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। এরপর বিয়ে করে সে। স্ত্রী মা’র দিককার আত্মীয়। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি বিয়ের প্রস্তাবটা হয়তো ছেলের মা-ই পাঠিয়েছিল।” “ছেলেটাকে এখন চাবি দেয়া পুতুল মনে হচ্ছে।”

“একদম ঠিক বলেছ,” সায়াকার দিকে তাকিয়ে বলি। “এটাই বোঝাতে চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে। ছেলের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন মি. মিকুরিয়া। ইউসুকে’কে তার নাতি ধরে নিলে সবকিছু একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। ওকে কেমন কড়া শাসনে রাখত, টের পেয়েছ?”

“ছেলেকে দিয়ে যে স্বপ্ন পূরণ হয়নি, সেটা নাতিকে দিয়ে করাতে চেয়েছেন। উনিই কিন্তু নাম রেখেছিলেন।”

“ছেলের উপরে যেরকম ছড়ি ঘোরাতেন ভদ্রলোক, নাতির নাম যে তিনিই রাখবেন, এটাই স্বাভাবিক। পুত্রবধূও চুপচাপ স্বভাবের ছিল বিধায় কিছু বলতে পারেনি এই ব্যাপারে। নাতির পড়াশোনার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। এই পর্যায়ে পুত্রবধূ মারা যায়।”

“তখন ইউসুকে’কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।”

“ছেলে আপত্তি জানিয়েছিল কিনা, এটা জানি না। মি. মিকুরিয়া বাবার মতই ব্যবহার করতেন ইউসুকের সাথে। ‘বাবা’ বলে ডাকার জন্যে জোর করেননি হয়তো, ভুলটাও শুধরে দেননি। আসলে নাতির মুখে বাবা ডাক শুনতে ভালোই লাগত তার।”

কপালে ভাঁজ পড়ে সায়াকার।

“চিন্তা করেই কেমন যেন লাগছে।”

“মি. মিকুরিয়ার চোখে তার ছেলে একটা কুলাঙ্গার। তার অস্তিত্ব ভুলে যেতে পারলে খুশি হতেন। এজন্যেই চাইতেন যেন ইউসুকেও তার আসল বাবাকে ভুলে যাক। চিঠিগুলোয় যেখানে ছেলের জুয়ার আসক্তি আর চাকরি চলে যাওয়ার

কথা লিখেছেন, সেখানে কিন্তু এটাও বলেছেন যে ইউসুকের উপরে এই ঘটনাগুলোর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, সেটা নিয়ে উনি চিন্তিত।"

"হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে..." ইউসুকের ডায়রিটা খুললো সায়াকা। "বড়দিনের উপহার নিয়ে রাগারাগির কারণ এবারে বুঝতে পারছি। ইউসুকের প্রকৃত বাবা উপহারগুলো পাঠিয়েছিল। ইউসুকে এখানে লিখেছে, 'এই বছর আবার বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছে সে, একটা বড় গাড়ি। গত বছর ট্রেন সেট পাঠিয়েছিল। বাবা বলে এসব খেলনা না দিয়ে বইও দেওয়া উচিত। সেজন্য ফোনে রাগারাগিও করেছে।"

"ডায়রিটা যখন আমরা প্রথম পড়ি, তখন ভেবেছিলাম দাদা-দাদির কাছ থেকে উপহার পেয়েছে ইউসুকে, কিন্তু এখন দেখছি বিষয়টা আসলে পুরোপুরি বিপরীত," তিক্ত হেসে বলি। "যাইহোক, এখানে কোথাও নিশ্চয়ই ছেলের সাথে কেইচিরো মিকুরিয়ার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ আছে।"

"এই যে, এটা পড়ো- 'বাবা সবসময়ই বলে এসেছে যে লোকটা আস্ত একটা গর্দভ। আমাকে কোনো ভাবেই তার মতন হওয়া যাবে না।'

"নাতিকে ছেলের কাছ থেকে সবসময় দূরে রাখতে চেয়েছেন কেইচিরো মিকুরিয়া।"

"ছেলের পড়াশোনায় খেয়াল রাখতে পারেননি, তাই সাবধানি ছিলেন যেন নাতির ক্ষেত্রে আগের ভুলগুলো না হয়। ইউসুকের ডায়রি পড়েই বোঝা যায় যে কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্যে বড় হয়েছে। তবে ছেলেটা মেনে নিয়েছিল সেটা। যাকে বাবা বলে জানত, মন থেকেই সম্মান করতো তাকে। ইউসুকের সাফল্য নিজের সাফল্য বলে মনে করতেন মি. মিকুরিয়া।"

"মনে হচ্ছে যেন কোনো রোবট তৈরির কারখানা নিয়ে আলাপ করছো," গাল ফুলিয়ে বলে সায়াকা।

"আসলেও তো শিক্ষিত করে তোলার নামে রোবট তৈরি করছিলেন ভদ্রলোক। যদি অসুস্থ না হয়ে পড়তেন, তাহলে সফলও হতেন শিঘ্রই।"

"ব্রেইন টিউমর।"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলি। "ইউসুকের পড়াশোনার মাঝপথেই চলে যেতে হবে, এই বিষয়টা নিশ্চয়ই ভীষণ পীড়া দিত তাকে। হয়তো আসন্ন মৃত্যুর চেয়ে এটা নিয়েই বেশি আফসোস হতো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয় ইউসুকে।"

"কারণ ওর পথ দেখানোর মত কেউ থাকে না। "

"শুধুমাত্র সেটা হলে কোনো ঝামেলা ছিল না। কিন্তু যে লোকটাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে ওকে, সে ফিরে আসাতেই মূল সমস্যার শুরু।"

"হ্যাঁ..." সায়াকা নিজেও সেটাই ভাবছিল সম্ভবত। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্নতা ওর।

"এবারে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করি," বলি আমি। "বড় ছেলের দৃষ্টিকোণ থেকে। যে বাবা লম্বা একটা সময় নিয়ন্ত্রণ করে গেছে তাকে, সে মারা গেছে কিছুদিন আগে। বাড়ি ফিরতে কোনো বাঁধা নেই। নিজের ছেলেও আছে ওখানে। তাই বিজয়ীর বেশেই ফিরেছিল নিশ্চয়ই। ছেলের সাথে যত দ্রুত সম্ভব ভাব করে নিতে চেয়েছে।"

"হুম..." বলে আবারও ইউসুকের ডায়রিতে বুঁদ হয়ে গেল সায়কা। "এখানে লিখেছে, দেখ- 'বিকেলে আমি রুমে ছিলাম, তখন নক না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ে সে। আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি পড়াশোনার সময় আমাকে বিরক্ত না করতে। তখন চলে গেছে। এখন থেকে আমার ঘরে ঢুকলে এই কথাই বলবো'।"

"ছেলেকে কেবলই ফিরে পেয়েছে। কথা বলতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক 1 কিন্তু ইউসুকের ব্যবহার দেখলে? এরকম আরো অনেকবার 'ওই লোকটা'র সাথে রুক্ষ্ম আচরণ করেছে সে। আসলে ছোটবেলা থেকে অন্য একজনকে বাবা বলে চিনত ছেলেটা, যে ওকে শিখিয়েছিল 'ওই লোক' থেকে সাবধানে থাকতে হবে। ছেলের মাঝে নিশ্চয়ই কেইচিরো মিকুরিয়ার ছায়া খুঁজে পেত ইউসুকের বাবা।"

"তোমার কী মনে হয়? নিজের বাবাকে ঘৃণা করতো সে?"

"হ্যাঁ। এজন্যেই তো ইউসুকে যখন তার সাথে মিশতে চাইত না, খারাপ ব্যবহার করতো, সে-ও পাল্টা ঘৃণা করতে শুরু করে ওকে।"

"এরপরই....."

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলি। "এরপরই শুরু হয় নির্যাতন।"

চতুর্থ পর্ব

১

"এই লোকটার জন্যেও আসলে আমার একটু মায়া লাগছে," বলি আমি। "এতদিন পর বাসায় ফিরে ভেবেছিল কোথায় ছেলে হয়তো আপন করে নিবে, কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। দাদা এক প্রকার নাতির মগজধোলাই-ই করেছিল বলবো আমি। ইউসুকে নিজের বাবাকে দেখতেই পারত না। এক পর্যায়ে তাই তার মনেও দানা বাঁধে ঘৃণা।"

মৃদু হাসে সায়াকা। "আমার মতনই অবস্থা।"

"তোমার মতন মানে?"

"কোনো বাবা-মা'র পক্ষেই সন্তানের ঘেন্না সহ্য করা সম্ভব না," বিষাদমাখা স্বরে বলে সায়াকা।

জবাবে কিছু না বলে চুপচাপ গাল চুলকালাম কিছুক্ষণ। আগের দিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ও যখন এই বিষয়ে কথা বলে, তখন কোনো কিছু বলেই স্বান্তনা দেয়া সম্ভব না।

"তাই বলে বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলা যাবে না অবশ্যই..." দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে সায়াকা।

"তুমি আর ইউসুকের বাবা একরকম নও," অবশেষে বললাম। "আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যও নেই।"

যেমনটা ভেবেছিলাম, আমার মন্তব্য আরো তাতিয়ে তুললো ওকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসঙ্গ পাল্টাতে হবে। "যাইহোক, আমরা এখন পুরো পরিবারের একটা চিত্র দাঁড় করাতে পেরেছি। এখন জানতে হবে ইউসুকে কীভাবে মারা গেল এবং ওর বাবা আর দাদি এখন কোথায় আছে। সেজন্যে এখন সরকারি অফিসগুলোতে ঢু মারতে হতে পারে।"

"ইউসুকের বাবা আর দাদি..." সায়াকা বিড়বিড় করে বলে। "ওই ভদ্রমহিলা তো আসলেই মিসেস মিকুরিয়া, তাই না?"

"তোমার অ্যালবামে কিমোনো পরিহিত যাকে দেখেছি? হ্যাঁ, উনিই খুব সম্ভবত।"

"আমি যখন মাধ্যমিকের ছাত্রী, তখন মারা যান তিনি। সেটাও প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। এর আগে কি এখানে থাকতেন তিনি?"

"২৩ বছর ধরে একই অবস্থায় আছে ইউসুকের ঘরটা, আমার মন বলছে এখানে থাকতেন না তিনি।"

"অর্থাৎ, ইউসুকের মৃত্যুর পরেই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন?"

"সম্ভবত। আর সেটা ইয়োকোহামাতে হবার সম্ভাবনাই বেশি।" "ইয়োকোহামা? কেন?"

"তোমার বাবা-মা'ও তখন ইয়োকোহামাতেই ছিলেন, তাই না? তাই আমার ধারণা মিসেস মিকুরিয়াও সেখানেই যান। ইউসুকের বাবার ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলতে পারব না।"

"আর যেখানেই হোক, এখানে থাকেনি," চারপাশে নজর বুলিয়ে মন্তব্য করলো সায়াকা। "কেননা, এখানে কেউ বসবাস করলে কেইচিরো মিকুরিয়া আর ইউসুকের ঘরটা কখনোই আগের অবস্থায় থাকত না।"

"ঠিক বলেছ। সবকিছু বের করে দিতে হতো সেক্ষেত্রে।"

মাথার পেছনে হাত দিয়ে বসলাম। ইউসুকের ঘরে বিছানার উপরে আমি। কেমন যেন ধুলো ধুলো গন্ধ। জোরে হাই তুললাম।

সায়াকা আমার পাশে এসে বসলো। "ইউসুকের মৃত্যুর কারণ..."

"তোমার কোনো আন্দাজ আছে এই ব্যাপারে?"

"এটাকে আন্দাজ বলা যায় কিনা জানিনা। তবে আমার মাথায় কিছু বিষয় ঘুরছে।"

"বলে ফেলো ঝটপট।"

তবে তখনই কিছু বললো না ও। চেহারায় চিন্তার ছাপ। দ্বিধায় ভুগছে যে কথাটা বলা উচিত হবে কিনা। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা।

"আসলে আমি ভাবছিলাম..." পাক্কা দু'মিনিট পর অবশেষে বললো ও। "ইউসুকে'কে কি খুন করা হতে পারে?"

সোজা হয়ে বসলাম। "কে খুন করবে?"

"কে আর? ওই লোকটা, মানে ওর বাবা," বলে সায়াকা।

"এটা কীভাবে সম্ভব। সম্পর্ক যতই খারাপ হোক, তাই বলে তো আর মেরে ফেলবে না নিশ্চয়ই?"

"বলা যায় না। হয়তো মারার উদ্দেশ্যে আঘাত করেনি, কিন্তু..." বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে কিছুক্ষণ ভাবলাম। "তুমি একটু ঘুমিয়ে নিবে নাকি?" সায়াকার চেহারা দেখে বলি।

"মাঝে মাঝে খুব ভয় হয় জানো? যদি মিহারুর ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায়?" আমার প্রশ্ন উপেক্ষা করে বলে সায়াকা।

"আজকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমরা। কিন্তু এখন বড্ড বেশি ক্লান্ত দু'জনেই। একটু বিশ্রাম দরকার, নাহলে মাথা কাজ করবে না। কাল সকালে উঠে দেখি কী করা যায়।"

দুই চোখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে সামনে চলে আসা চুল পেছনে ঠেলে দিল সায়াকা।

"সরি। আসলে আমি এমন সব কথা বলে বসি..."

"ব্যাপার না।"

“তুমি এখানে ঘুমাবে?”

“হ্যাঁ। ধুলো অনেক, কিন্তু মেঝেতে ঘুমানোর চেয়ে ভালো অন্তত।”

“তাহলে আমি নিচের সোফাতে গিয়ে শুই।”

উঠে দাঁড়ালো ও।

একবার ভাবলাম ওকেও এখানেই থাকতে বলি। কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?

“গুড নাইট,” খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর বললাম।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সায়াকা। মুখ না ফিরিয়েই বললো, “গুড নাইট।”

“মোমগুলো নিভিয়ে দিও।”

“নিভাব।”

“আর...” আমার কণ্ঠে দ্বিধা।

“কী?”

“যদি বাথরুমে যেতে হয়, আমাকে বলো। সমস্যার কিছু নেই।”

“লাগবে না,” হেসে বললো সায়াকা।

“তাহলে তো ভালো।”

“ঘুমাও একটু।” দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল ও। মোমবাতির আলোটা কেঁপে উঠলো আলতো। উঠে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলাম।

২

তিন ঘণ্টার মত ঘুমালাম। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু সেটা বাজার আগেই চোখ খুলে গেল। বাইরে আলো ফুটেছে বেশ আগেই। টানা মানসিক আর শারীরিক ধকলের পর এই ঘুমের কারণে মাথাটা পরিষ্কার লাগছে।

জানালা খুলে বাইরে তাকালাম ॥ বৃষ্টি নেই। সামনের পাহাড়টার আড়াল থেকে উকিঝুকি দিচ্ছে সূর্য। চারদিকে গাঢ় সবুজের সমারোহ। আজ সারাদিন রোদই থাকবে মনে হচ্ছে।

তবে রুমের ভেতরটা বাইরের তুলনায় বেশ অন্ধকার। আগে ভেবেছিলাম বাড়িটা দক্ষিণমুখী বা পূবমুখী। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দক্ষিণপশ্চিম মুখী।

“দক্ষিণ-পশ্চিম...” বাইরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে, ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আমার বারবার মনে হচ্ছিল জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই সরাসরি সূর্যোদয় দেখতে পাব বুঝি। বাড়িটা পূবমুখী ধরে নেয়ার কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই। এমনি এমনি তো এরকম একটা ভাবনা মাথায় আসার কথা না।

বিছানার উপরে রাখা ইউসুকের ডায়রিটা তুলে নিলাম। এখানে কি বাড়িটা কোনো দিকে মুখ করা, সেই বিষয়ে কিছু লেখা আছে? কয়েক পাতা উল্টেই নিশ্চিত হলাম, এখানে সেরকম কিছু ছিল না।

কিছু একটা চোখে পড়েছে। কী সেটা?

চারপাশে নজর বুলালাম একবার। অস্থিরতা বাড়ছে ক্রমশ। ঠিক এমন সময় টেলিস্কোপটা চোখে পড়লো।

সেদিকে এগিয়ে পাশে রাখা বাক্সটা খুলে ভেতর থেকে রেকর্ড পেপার বের করলাম। জুলাইয়ের ২৫ তারিখ সকালে বুধ গ্রহ দেখতে পাওয়ার কথা লেখা আছে এখানে।

পেয়েছি! এটাই! এই লেখাটা দেখেই ধরে নিয়েছিলাম বাড়িটা পূবমুখী। জানালার কাছে গিয়ে আবারও বাইরে তাকালাম। নিশ্চিত হতে চাইছি যে ভুল হয়েছে কিনা। কোনো সন্দেহ নেই এবারে। বাড়িটা আসলেও ঈষৎ পশ্চিমমুখী। এদিক দিয়ে কোনোভাবেই সূর্যোদয় দেখা সম্ভব না।

এই অসঙ্গতির ব্যাখা কী?

আবারো গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মস্তিষ্কের চাকাগুলো ঘুরছে বনবন করে। দীর্ঘক্ষণ ভাবনার পর একটা দৃশ্যপট দাঁড় করালাম। পুরোটাই আন্দাজ অবশ্য।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে সিঁড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় দিলাম বেইজমেন্টে নেমে এসে যে পথে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছি, সেই পথেই বেরিয়ে এলাম বাইরে।

বৃষ্টির কারণে চারপাশে কাদা কাদা হয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে চক্কর লাগালাম একবার। আমার আন্দাজ মিলে গেছে একদম।

"আমি আস্ত একটা গর্দভ!" লম্বা শ্বাস ফেলে বলি।

ভেতরে ফিরে দেখলাম সায়াকা উঠে পড়েছে। লিভিংরুমের পর্দাগুলোও সরিয়ে দিয়েছে কোনো এক ফাঁকে।

"গুড মর্নিং," আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বললো ও। "বেশ আগেই উঠে পড়েছ দেখছি।"

"বাড়িটা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী।"

কথাটা শুনে বিভ্রান্তি ভর করলো ওর চোখেমুখে। "কী?" কপাল কুঁচকে বললো।

জানালার দিকে ইশারা করলাম হাত দিয়ে। "দেখো, এই সকালবেলা ও ভেতরে রোদ ঢুকছে না। অর্থাৎ, বাড়িটা পশ্চিমমুখী।"

এবারে ও বুঝতে পারল কী নিয়ে কথা বলছি আমি। জানালার দিকে তাকিয়ে বললো, "হ্যাঁ, তো কী হয়েছে?"

"এটা দেখো," বলে টেলিস্কোপের রেকর্ড পেপারটা বাড়িয়ে ধরলাম ওর দিকে।

দেখলো ও, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারলো বলে মনে হয় না। চেহারায় বিস্ময় ফুটলো আবারও। আসলে এই বিষয়টা সব প্রাথমিক স্কুলেই শেখানো হয়। কিন্তু প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহার না থাকায় ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

"সৌরজগতের গ্রহ বিন্যাসের মনে আছে? বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল আর বৃহস্পতি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হচ্ছে বুধ। কেউ যদি পৃথিবী থেকে বুধ গ্রহ

দেখতে চায়, তাহলে কী করবে বলো তো?"

"কী করবে?"

"সূর্যের দিকে তাকাতে হবে। বুধ সবসময় সূর্যের কাছাকাছিই থাকে। "ওহ..."

"তবে দিনের বেলা দেখতে হলে বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার। সাধারণ টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে সূর্যের আলোয় কিছু দেখা যায় না। তাই বুধ গ্রহ দর্শনের সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। কারণ তখন রোদের তেজ সবচেয়ে কম থাকে।"

"তার মানে এখানে ভোরবেলা বুধ গ্রহ দেখার কথা বোঝানো হয়েছে।"

"হ্যাঁ। কেইচিরো মিকুরিয়া সূর্যোদয়ের সময় বুধ গ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন। পূর্ব দিকে তাকিয়ে।"

"উপর তলার জানালা দিয়ে কি সূর্যোদয় দেখা যায় না?"

"না" মাথা ঝাঁকিয়ে বলি।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল সায়াকার। "এসবের মানে কী?"

"অনেকক্ষণ ভেবে একটা উত্তর বের করেছি। কিন্তু তুমি শুনলে হয়তো হাসবে। আমার নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকছে।"

"না, বলো।"

"বিষয়টা আসলে অতও জটিল না। আগে বাড়িটা পূবমুখী ছিল।"

"আগে, মানে...

"এই বাড়িটা আবার নতুন করে বানানো হয়েছে।"

জমে গেল সায়াকা। আর যা-ই হোক, এরকম কিছু শুনবে ভাবেনি নিশ্চয়ই। ঠায় ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চারদিকে ঘুরে আমার উপরে এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

"কিন্তু ইউসুকের ডায়রিতে তো ওরকম কিছু লেখা নেই।"

"অর্থাৎ, ওর মৃত্যুর পর করা হয়েছে কাজটা।"

"তাহলে এই বাড়িটা আমরা যতটা পুরোনো ধরে নিয়েছি, অত পুরোনো নয়? কিন্তু কেউ থাকে না, এরকম একটা বাড়ি আবারও নতুন করে বানানো হবে কেন?"

"আমার কাছেও অদ্ভুত লেগেছে বিষয়টা। কিন্তু, বাড়িটা নতুন করে বানানো হয়েছে মেনে নিলে একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।"

"কী?"

"তুমি যে রহস্যময় ঘরটার কথা বলছিলে..." রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলি। "কালো ফুলদানি, সবুজ পর্দা এই বাড়িটার কোথাও নেই কেন? তোমার স্মৃতিতে তো ঠিকই রয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে ওটা ভিন্ন একটা বাড়িতে দেখেছ তুমি।"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো ও। "অসম্ভব! এই বাড়িটার কথাই মনে আছে আমার, একদম নিশ্চিত আমি।"

"তাহলে কালো ফুলদানি আর সবুজ পর্দার বিষয়টা কেবলই ভ্রম? এটাই বলতে চাইছ?"

"ওটা..." মুখ নামিয়ে নিল সায়াকা।

ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

"আসলে, এই বাড়িটায় পা রাখার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল কেউ কোনোদিন থাকেনি এখানে।"

আমার দিকে তাকালো সায়াকা। বলেই চললাম, "এই যেমন কার্পেটটার কথাই ধরো না। প্রচুর ধুলো, এটা ঠিক। কিন্তু ব্যবহারের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কার্পেটই নয়, ডায়নিং টেবিলের আশপাশের মেঝের দিকে তাকালে কোনো দাগ চোখে পড়বে না তোমার। সাধারণত চেয়ার টেনে সরালে কিন্তু এমনিই দাগ পড়ে যায়। বাকি সব কিছুর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। জিনিসগুলো নতুন, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।"

"কোথায়... লোকে থাকতো, এই চিহ্ন আছে তো।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। ইউসুকের ঘর, মিকুরিয়া দম্পতির ঘর। রান্নাঘরের ফ্রিজ।" "তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। এই বাড়িটায় কোনো বাতি নেই কেন?"

"বাতি? মানে ফ্লুরোসেন্ট বাতির কথা বলছো? বিদ্যুৎই তো নেই।"

"না, বিদ্যুৎ নেই কথাটা ভুল। এখানে কখনো বিদ্যুৎ ছিলই না।"

কথাটা শোনামাত্র অভিব্যক্তিহীন হয়ে গেল সায়াকার চেহারা। কিছুক্ষণ পর বিস্ময় ভর করলো সেখানে।

"ভুল হচ্ছে তোমার..."

"না, ঠিকই বলছি। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। তুমি নিজের চোখে দেখতে চাও?"

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সায়াকা।

"বিদ্যুৎ ছাড়া কীভাবে থাকা সম্ভব?"

"সম্ভব না," বলি আমি। "অন্তত এরকম একটা বাড়িতে। আর সত্যটা হচ্ছে, এখানে কখনো বৈদ্যুতিক সংযোগই দেয়া হয়নি। এর একটাই অর্থকেউ কোনোদিন থাকেনি এখানে।"

"কেন থাকেনি?"

"জানি না আমি। যে বাড়িতে কেউ থাকবে না, এরকম বাড়ি বানানো অর্থহীন।"

সোফায় ধপ করে বসে পড়লো সায়াকা। দুই হাতে মাথা চেপে ধরেছে। রক্তিম চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

"এটা কী করে সম্ভব?" আবারও বললো ও। "ওগুলো কী তাহলে? ডায়রি, ইউসুকের টেবিলের বইগুলো, রকিং চেয়ার, উল বোনার সরঞ্জাম এসবের ব্যাখা কী?"

“কেউ নিশ্চয়ই প্রতিলিপি বানানোর চেষ্টা করেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে রেপ্লিকা।”

“রেপ্লিকা?”

“হ্যাঁ, এই রুমটার কথাই ধরো না,” লিভিং রুমের চারপাশে নজর বুলিয়ে বলি। “তোমার স্মৃতির সাথে তো মিলে গেছে, তাই না?”

মাথা নেড়ে সায় দিল সায়াকা।

“এই পুরো বাড়িটাই আসলে একটা রেপ্লিকা। অতীতের নির্দিষ্ট একটা সময়ের অনুকরণ করে বানানো হয়েছে। কিন্তু কেন, সেটা বলতে পারব না।”

“আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,” সায়াকার পুরো শরীর কাঁপছে এখন।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। “এই রহস্য সমাধানের চাবি হচ্ছে তোমার স্মৃতির কালো ফুলদানি আর সবুজ পর্দার ওই ঘরটা। এই বাড়িটা যদি রেপ্লিকাই হয়ে থাকে, তাহলে ওই ঘরটা নেই কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেলেই বাকিটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সায়াকা।

“অর্থাৎ, আমার স্মৃতি ফিরে না এলে রহস্যটার কোনো সমাধান হবে না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারছি না। কেউ যেন দেয়াল তুলে দিয়েছে মনে। সামনে এগোনো অসম্ভব।”

“কিন্তু দেয়ালটার মাঝে কোনো ফাঁকফোকর আছে নিশ্চয়ই। সেখান দিয়েই ঢোকার চেষ্টা করতে হবে তোমাকে,” বলে উঠে দাঁড়ালাম।

“যাচ্ছ কোথায়?”

“ঘরটা কোথায় উধাও হলো, সেটা দেখতে।”

৩

সায়াকা যে দেয়ালটার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা থাকার কথা বলছিল, সেখানে চলে এলাম। বোঝার চেষ্টা করছি কী ঘটেছিল।

যদি কেউ একটা পুরোনো বাড়ির প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা তৈরি করে একটা রুম বাদ দিতে চায়, তাহলে কী করবে? যদি রুমটা এক কোনায় হয়ে থাকে, তাহলে পুনঃনির্মাণের সময় না বানালেই চলবে। কিন্তু সেটা যদি একটা দেয়ালের একদম মাঝে হয়, তবে সমস্যা। এক্ষেত্রে একপাশে লিভিং রুম এবং আরেকপাশে তাতামি রুম।

পুরো বাড়িটার নকশার ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে তাতামি রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিনিসপত্র রাখার জন্যে তাকের মত করা আছে পাশের দেয়ালে। সেটার ঠিক উল্টোদিকে লিভিং রুমের পাশের দেয়ালে একটা ছোট কাবার্ড। খুব একটা চওড়া না। স্লাইডিং দরজাটা একপাশে সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। খালি। কোনো তাকও নেই।

এক পা পিছিয়ে এসে পুরোটা ভালো মত খেয়াল করলাম। একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সাথে সাথে একটা প্রশ্ন উদয় হলো আমার মনে। পুরো দেয়ালটার দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মিটারের মতন। অর্থাৎ, কাবার্ডটার পাশে প্রায় দুই মিটারের মতন জায়গা খালি। পেছনে লিভিং রুমটা, তবুও অনেকখানি জায়গা ফাঁকাই পড়ে আছে।

দেয়ালটায় জোরে গুঁতো দিলাম হাত দিয়ে। ফাঁপা শোনালো শব্দটা।

তীব্র অস্বস্তি গ্রাস করলো আমাকে। দেয়ালটা আরো ভালো মতো দেখলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নজরে এলো না। তাই আবারও কাবার্ডটার দিকে মনোযোগ দিলাম। ভেতরে একপাশে প্লাইউডের উপরে কোমর সমান উচ্চতায় দু'টুকরো বড় কাঠ পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে। চাইলে হাতল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওগুলো। একটা কাঠ ধরে সজোরে টান দিলাম। খুব সহজেই দেয়াল থেকে খুলে এলো প্লাইউড।

ভেতরে বেশ অনেকখানি জায়গা। যাবতীয় পুরোনো জিনিসপত্রের আখড়া। নিজেকে প্রত্নতাত্ত্বিক মনে হচ্ছে রীতিমত।

"টর্চটা নিয়ে এসো!" জোরে বললাম যেন সায়াকা শুনতে পায়।

একটু পরেই টর্চ হাতে ছুটে এলো ও। আমাকে কাবার্ডের ভেতরের গোপন কুঠুরিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

"এটা কী?"

"সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি," বলে ওর হাত থেকে টর্চটা নিলাম।

ভেতরে পট, রান্নাঘরের সরঞ্জামাদি আর ধাতব জিনিসপত্রে ভর্তি। সবকিছু ধুলোমাখা।

"নতুন করে বানানোর আগে এটুকুও বাড়ির অংশ ছিল নিশ্চয়ই," বলি আমি।

"আমি একটু দেখি," এগিয়ে এলো সায়াকা।

সরে জায়গা করে দিলাম ওকে। সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সায়াকা। একটা লম্বা, সরু কালো ফুলদানি বের করে আনলো একটু পর। এটার কথাই বলছিল বারবার।

ফুলদানিটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার দিকে ঘুরলো ও।

"রুমটা আসলেও ছিল।"

"তুমি নিশ্চিত যে এটাই সেই ফুলদানি?"

আবারও ফুলদানিটার দিকে তাকালো ও। হাত দিয়ে ধুলো মোছার পর সাদা ফুলের নকশা ফুটে উঠলো গায়ে। "হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত," মাথা নেড়ে বলে সায়াকা। "এটাকেই আগে দেখেছি।"

"দেখি, একটু ভেতরে যাই।"

কাবার্ডের ভেতরে ঢুকে সবকিছু নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম আবার। শক্ত একটা ডুরালুমিনের বক্স চোখে পড়লো। ঢাকনা খুলে উঁকি দিলাম। একটা রাবার প্যাড ভেতরে। টেলিস্কোপের যাবতীয় সরঞ্জামাদি রাখার জন্যে ব্যবহৃত হতো নিশ্চয়ই। উপরতলায় যে রেকর্ড পেপারটা পেয়েছি, সেটার মতন আরো কয়েকটা রেকর্ড পেপার আছে এখানে।

"দেখে মনে হচ্ছে না যে পুড়ে গেছে?" এক পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বললো সায়াকা। কাঠের একটা কাপ-পিরিচ সেট ওর হাতে। দেখতে কালো লাগছে, কিন্তু জিনিসটার আসল রঙ কালো নয়। পুড়ে যাওয়ার কারণে ওরকম দেখাচ্ছে।

"তাই তো।"

এবারে অন্য জিনিসগুলোতে পুড়ে যাওয়ার কোনো ছাপ আছে কিনা তা দেখতে লাগলাম। একটু পরেই প্লাস্টিকের একটা পুতুল খুঁজে পেলাম যেটার ডান হাত পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এসব একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে।

"আগুন লেগেছিল?" মাথা নেড়ে বলি। "আরেকটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল তাহলে।"

"কোন প্রশ্ন?"

"পুরোনো বাড়িটার কী হয়েছে। এখন আমরা জানি যে পুড়ে গেছিল সেটা। কিন্তু কেউ একজন ভুলতে পারেনি বাড়িটা, সেজন্যেই হুবহু একটা প্রতিরূপ বানিয়েছে।"

"কিন্তু প্রতিরূপ বানানোর সময়ে যে ঘরে ফুলদানিটা ছিল, সেটা আবার বানানো হয়নি কেন?"

"হয়তো ওই ঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত, সেজন্যে। গোপন একটা কুঠুরি বানিয়ে দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে। আসলে কুঠুরিটা হয়তো আগে থেকেই ছিল সেখানে। ঢেকে দেয়া হয়েছে আর কি। ভেতরের জিনিসগুলো আগের মতনই আছে।"

"আগুন লেগেছিল..."

ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে রইলো সায়াকা, যেন দূর অতীতের কোনো স্মৃতি রোমন্থনের চেষ্টা করছে। হয়তো আগুন শব্দটা শোনার পর কিছু একটা মনে পড়েছে ওর।

"তোমার বাবা-মা কি আগুনের ব্যাপারে কখনো কিছু বলেছিল?" "বলেছিল হয়তো," দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে সায়াকা। "কিন্তু আমি ভুলে গেছি।"

"বুঝতে পেরেছি," বললাম। পুরোনো বাড়ির আর কী কী পাওয়া যায়, সেটা দেখছি এখন। গোল একটা ছোট অ্যালার্ম ঘড়ি পেলাম। ধাতব শরীরে জং ধরে গেছে ওটার, কাঁচ ঘোলাটে, কিন্তু ডায়াল আর কাটাগুলো ঠিকই আছে।

ঘড়িটায় সময় দেখাচ্ছে এগারোটা দশ।

সায়াকাকে দেখালাম।

" 'এগারোটা দশ'-এর মাহাত্ম্য এবারে বুঝতে পারছি। ওই সময়েই আগুন লেগেছিল নিশ্চয়ই।"

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে শ্বাস ছাড়ল সায়াকা।

"তা বুঝলাম... কিন্তু এই বাড়ির সবগুলো ঘড়িতে কেন একই সময় করে রাখা হয়েছে?"

"হয়তো এটা নির্দেশ করছে বাড়ির ভেতরে সময় নির্দিষ্ট একটা মুহূর্তে থমকে আছে। সেই মুহূর্তেই সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল। শুধু ভেতরের এই জিনিসগুলো বাদে," টর্চ দিয়ে ভেতরের কুঠুরিটা দেখিয়ে বললাম। এই সময় কিছু একটা চকচক করে উঠলো। দেয়াল ঘেঁষে রাখা জিনিসটা, প্রায় আমার উচ্চতার।

এবারে ভালো করে আলো এলে দেখলাম। একটা ক্রুশ। তবে বেইজমেন্টের ক্রুশটার মতন যেনতেনভাবে বানানো হয়নি। বরং, সুন্দর ধাতব নকশা গায়ে।

ক্রুশের ঠিক পাশে কিছু কথা লেখা হয়েছে দেয়ালে খোদাই করে। আঙ্গুল দিয়ে ধুলো মুছে পড়তে শুরু করলাম। এই কাজটা আনাড়ি কেউ করেছে খুব সম্ভবত।

সায়াকাকে ডাক দিলাম।

"এটা দেখো," ক্রুশটার আশপাশে আলো ফেলে বললাম।

লেখাটা দেখেই একদম জমে গেল ও।

শান্তিতে ঘুমাও ইউসুকে, ফেব্রুয়ারি ১১।

৪

"আরেকটা প্রশ্নের উত্তর পেলাম আমরা," টর্চ নিভিয়ে বললাম। "আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইউসুকে। ওকে খুন করা হয়নি। আত্মহত্যাও করেনি।"

"ও কি ওই ঘরেই মারা গেছিল?" ফুলদানিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে সায়াকা। "যেখানে রাখা ছিল এই ফুলদানিটা?"

"খুব সম্ভবত।" চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লাম। "রুমটা নতুন করে কেন বানানো হয়নি, বুঝতে পারছ তো? যাতে করে এই দুঃসহ স্মৃতিটা বারবার মনে পড়ে না যায়।"

"ক্রুশটা ওখানে বানানো হয়েছে কারণ..." সায়াকা ঘুরে বলে, "ইউসুকে এখানে সমাহিত?"

"শান্তিতে ঘুমাও ইউসুকে...."

কথাটা বলার সাথে সাথে মাথার ভেতরে যেন একশো ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলে উঠলো। এই বাড়িটা কেন বানানো হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছি খুব সম্ভবত।

"এজন্যেই কি তাহলে পুনঃনির্মিত হয়েছে বাড়িটা?"

"কী জন্য?"

জবাবে কিছু না বলে ছয় তাতামি ম্যাট দৈর্ঘ্যের ঘরটায় এমাথা-ওমাথা পায়চারি করতে লাগলাম। চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি মাথার ভেতরে। কিন্তু কাজটা কঠিন। এ বাড়িতে পা রাখার পর থেকে এতক্ষণ অবধি ছোটখাটো যতগুলো বিষয়ে খটকা লাগছিল, সবগুলো এসে জড়ো হয়েছে একসাথে। যৌক্তিক সমাধান দরকার সবগুলোর।

"ডায়রিটা কোথায়?" থেমে জিজ্ঞেস করলাম। "ডায়রিটা কোথায়?"

"কাল রাতে তুমিই তো দেখেছিলে। ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরে আছে নিশ্চয়ই।"

ছুটে বেরিয়ে এলাম তাতামি ঘরটা থেকে। সায়াকা আমাকে অনুসরণ করছে।

কিন্তু সিঁড়ি অবধি পৌঁছানোর আগেই দরজার কাছে থেমে গেলাম। জুতো রাখার কেবিনেটের ওপরে একটা পেইন্টিং ঝুলছে। খুব সম্ভবত একটা বন্দর আঁকা হয়েছে সেখানে।

"কোনো সমস্যা? কী হলো?" সায়াকা আমার আস্তিন টেনে বললো। "প্রথমবার এই ছবিটা দেখেই বোঝা উচিত ছিল," পেইন্টিংটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম।

"কী বোঝা উচিত ছিল?"

"সব বলবো তোমাকে। আগে ডায়রিটা নিয়ে আসি।"

সিঁড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

মিকুরিয়া দম্পতির ঘরে এসে ইউসুকের ডায়রিটা তুলে নিলাম। আমি যা খুঁজছি, সেটা প্রথম দিকের পাতাগুলোতেই আছে, যেখানে ইউসুকে লিখেছিল ও চাইনিজ বর্ণমালা খুব একটা ভালো পারে না।

"ঠিক যেমনটা আমি ভেবেছিলাম," লেখাটুকু পড়ে বলি। সবকিছু এখন একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। "ঠিক আছে, এবারে চলো নিচে যাই," সায়াকার কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে বলি।

দরজার কাছে এসে দেয়ালে ঝোলানো বন্দরের ছবিটা দেখাই আবারো। "তোমার কাছে ছবিটা একটু অদ্ভুত লাগছে না?"

আমার প্রশ্ন শুনে লম্বা সময় সেদিকে তাকিয়ে রইলো সায়াকা। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিল কিছুক্ষণ পর। "না তো। আমার কাছে তো ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।"

"পেইন্টিংটার আলাদাভাবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এরকম একটা পেইন্টিং যে এই বাড়ির প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সেটাই অদ্ভুত আসলে। পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত একটা বাড়িতে কি বন্দরের ছবি থাকার কথা?"

মাথা একদিকে কাত করে আবারও ছবিটার দিকে তাকালো সায়াকা।

"না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে ঝোলাতেও পারে, তার ইচ্ছা।"

"তবুও একটু অস্বাভাবিকই বটে। আরেকটা ব্যাপার আছে, এখানে দেখো," ডায়রিটা খুলে ইউসুকের একটা এন্ট্রি ওকে দেখাই। এন্ট্রিটায় লেখা-

> '১২ মে, প্রথমে মেঘ, পরে রোদ।
> আজ খুব গরম। সবাই বারবার সৈকতে যাওয়ার কথা বলছিল। আমারও সাঁতার কাটতে খুব ভালো লাগে। বাসায় এসে ঠাণ্ডা পানির নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। মা-ও হাতাকাটা জামা পড়ে ছিল দুপুরে।'

সায়াকা ডায়রিটা থেকে মুখ তুললে বললাম, "অদ্ভুত, তাই না? প্রথমবার পড়ার সময় মনে হয়েছিল কোনো একটা হিসেব মিলছে না, কিন্তু তখন গুরুত্ব দেইনি।"

ওর চোখেমুখে এখনও বিভ্রান্তি। তাই ডায়রিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "এই যে এখানে সৈকতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, দেখো। হ্যাঁ, বাচ্চারা গরমের সময় সৈকতে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাগানোতে, পাহাড়ের উপরে একটা এলাকায় সমুদ্র কোথায় পাবে তারা? বড়জোড় মাতসুবারা হ্রদে যেতে পারে।"

বিস্ময়ে হা হয়ে গেল ওর মুখ। "ওহ...."

"এবারে বুঝতে পারছ তো আমি কী বলছি?" ডায়রি বন্ধ করে বললাম। "এই বাড়িটা আসলে পুরোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপরে বানানো হয়নি, বরং সম্পূর্ণ নতুন একটা জায়গায় রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে।"

"মূল বাড়িটা তাহলে..."

"আমার নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না তোমাকে। ওখানেই আগে থাকতো তোমার পরিবার, ইয়োকোহামায়। আর এই ছবিটা ইয়োকোহামা বন্দরের।"

"তুমি বলতে চাইছ ইয়োকোহামার বাড়িটার প্রতিরূপ এটা?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এমনটা কেন করবে কেউ? তাও এরকম নির্জন একটা জায়গায়।"

বিষয়টা কীভাবে ব্যাখা করবো ভাবতে ভাবতে আনমনে হাত দিয়ে গাল স্পর্শ করলাম একবার। দাড়ি বেশ বড় হয়েছে, কিন্তু এই বাড়িতে শেভ করা সম্ভব না।

"নসসোস প্রাসাদের ব্যাপারে জানো?" একটু পর বললাম

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো সায়াকা। কপালে ভাঁজ পড়েছে বেশ কয়েকটা। এত কিছু থাকতে এই বিষয়ে কেন আলাপ শুরু করলাম, সেটাই ভাবছে নিশ্চয়ই।

"এই প্রাসাদ হচ্ছে *মিনোয়ান সভ্যতার*[6] একটি অন্যতম পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এর ভেতরে এমন একটা ঘর আছে, যেটা প্রত্নতাত্ত্বিকদের ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছিল। প্রথম দেখায় মনে হবে ঘরটা বুঝি রাজার শয়নকক্ষ, কিন্তু পরে বোঝা যায় যে অনেক হিসেবই মিলছে না। এই যেমন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। হ্যাঁ, দরকারি সবকিছু লাগানো আছে ঠিকই, কিন্তু ওগুলো মাঝপথে এসে থেমে যায়। এছাড়াও, নির্মাণ সামগ্রী নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যেমন সিড়িগুলো এমন পাথরে তৈরি, যেগুলোকে সহজেই দরকারি রূপ দেয়া যায়। আবার ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই পাথরগুলো ক্ষয়েও যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু সিঁড়িটা ব্যবহারের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। লোকে ওঠা-নামা করলে কিছুটা ক্ষয় হওয়া তো স্বাভাবিক। কেউ যদি না-ই যায়, তাহলে ঘরটা বানানোর উদ্দেশ্য কী?"

"এমন একটা ঘর বানালো কেন?" আমার প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলো সায়াকা।

"অনেক চিন্তা-ভাবনার পর গবেষকেরা সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। ওটা আসলে একটা সমাধি। রাজার মৃত্যু পরবর্তী জীবনে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে ঘরটা।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সায়াকার চেহারা। বুকের কাছে হাত নিয়ে বিস্ফারিত নয়নে চারপাশে নজর বুলালো কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে বিস্ময় রূপ নিল সন্তাপে।

"তাহলে এই বাড়িটাও... একটা সমাধি?"

"সব আলামত সেই দিকেই নির্দেশ করছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই, পানি নেই, জীবনের কোনো চিহ্নও নেই। এই বাড়িটা আসলে একটা রেপ্লিকা। কারো বসবাসের জন্যে বানানো হয়নি।"

"কিন্তু... এত এত আসবাব।"

"হ্যাঁ, তবে জরুরি অনেক কিছুই নেই। ইউসুকে আর কেইচিরো মিকুরিয়ার ঘরটা এমনভাবে সাজানো যেন তারা এখনও বেঁচে আছে, এটা তোমার কাছ

অদ্ভুত লাগছে না? কেউ যদি আসলেই এখানে থাকতো, তাহলে ওগুলো অনেক আগেই পরিষ্কার করে ফেলত। বাড়িটা বানানোই হয়েছে মৃতদের জন্যে। পিলারে কত উঁচুতে দাগ কাটা, নিজের চোখেই তো দেখেছ। বেঁচে থাকলে ইউসুকে নিশ্চয়ই ওরকমই লম্বা হতো। সেটাই বোঝানো হয়েছে।" কথাগুলো বলে নিজের গায়েই কাটা দিল আমার।

"যদি সমাধিই হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত..."

"নাহ, আমার মনে হয় না অতিরিক্ত কিছু করা হয়েছে। এখানে জায়গার দাম খুব একটা বেশি না। পানি বা বিদ্যুতের সংযোগ নেই। শুধু নির্মাণ খরচ। এজন্যেই এরকম নির্জন একটা জায়গা বাছাই করা হয়েছে। অযাচিত কৌতূহল দেখাবে না কেউ। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে ইউসুকের ঘরের বই আর পত্রিকাগুলো। বেছে বেছে সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে কেনা হয়েছে অতীতের কথা মাথায় রেখে। আসল বইগুলো নিশ্চয়ই আগুনে পুড়ে গেছে।"

"এজন্যেই বইগুলো এত পুরোনো," আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বলে সায়াকা। "এই ডায়রিটা তো পোড়েনি।"

"এটা?" ডায়রিটা উপরে তুললাম। "হয়তো বুকশেলফে বা, অন্য কোথাও যত্ন করে রেখে দেয়া হয়েছিল, এজন্য পোড়েনি।"

"চিন্তা করো, এরকম একটা জিনিসই বেঁচে গেল।"

"হ্যাঁ।" আরো কিছু সরঞ্জাম নিশ্চয়ই আগুনে পোড়েনি। ওগুলো ওই গুপ্ত কুঠুরিতে রেখে দেয়া হয়েছে কাবার্ডের ভেতরে। ডুরালুমিনের বাক্সের ভেতরে থাকায় টেলিস্কোপটাও বেঁচে গেছে।

"এমনটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এই বাড়িটা কে বানালো?"

"দু'জন মানুষের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব। ইউসুকের বাবা আর ওর দাদি। তবে যে লোক তার নিজের ছেলেকে ওভাবে অত্যাচার করে, সে এরকম একটা বাড়ি বানাবে, তা বিশ্বাস করা কষ্টের। কিন্তু এমনটাও হতে পারে যে ছেলেকে হারিয়ে হয়তো পিতৃত্ব জেগে উঠেছিল।"

"তাহলে এসবের সাথে আমার বাবার কী সম্পর্ক?" গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে সায়াকা। "সে প্রায় প্রায়ই এখানে আসত কেন?"

"এটা যদি আসলেও সমাধি হয়ে থাকে, তাহলে তো আসার একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাই না? শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে।"

"ইউসুকের সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"ফ্রিজে কিন্তু জ্যুসের ক্যান, কর্নড বিফ রাখা দেখেছি আমরা। বাবার একদমই অপছন্দ এগুলো।"

"নিশ্চয়ই ইউসুকের প্রিয় খাবার ছিল গুগুলো," শান্ত স্বরে বললাম। "মৃত কোনো আত্মীয়ের সমাধিতে যাওয়ার সময় কিন্তু আমরা এমন সব জিনিস সাথে নিই, যেগুলো একসময় খুব পছন্দের ছিল তার। "

মাথা নামিয়ে নিল সায়াকা। খানিক বাদে অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এলো। সায়াকা যে কাঁদছে, তা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো।

"সামনের দরজাটা তো ভেতর থেকে আটকে রাখা হয়েছে," আমার দিকে তাকিয়ে বললো ও।

"যাতে কেউ চুরি করে ঢুকতে না পারে," জবাবে বলি।

"আচ্ছা..." দেয়ালে হেলান দিল সায়াকা। "তাহলে গতকাল থেকে একটা সমাধির ভেতরে আছি আমরা?"

"ভয় লাগছে?"

"একটু। কিন্তু..." সিলিংয়ের দিকে তাকালো ও। "যে-ই এই বাড়িটা বানিয়ে থাকুক না কেন, তার মনের অবস্থার কথা ভেবে দেখ। বিষাদে জর্জরিত নিশ্চয়ই।"

"কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছি সেটা।"

আবারও লিভিং রুমে ফিরে এলাম আমরা। এই বাড়িটা যে একটা সমাধি, তা উপলব্ধি করার পর থেকে ধুলোমাখা সাধারণ দর্শন টেবিল আর সোফাগুলোকেও এখন অন্যরকম লাগছে।

"ইন্ডিয়ানা জোনস মনে হচ্ছে নিজেকে।"

"আসলেই," মাথা নেড়ে বলি। এই সিনেমাটা একসাথে দেখেছিলাম আমরা।

"ভালো কথা, এটা যেহেতু একটা সমাধি, মৃতদেহ-ও কি সমাহিত আছে কোথাও?"

"মনে হয় না। সেক্ষেত্রে অনেক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো," ঘাড় কাত করে বলি। "তবে পুরোপুরি উড়িয়েও দেয়া যায় না সম্ভাবনাটা।"

"সেটাই," সায়াকা বলে। "এই সমাধিটা কোনো একটা উদ্দেশ্যে তো বানানো হয়েছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ।"

"ইউসুকে'কে যদি এখানে সমাহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে কি সেটা ওই গুপ্ত কুঠুরিটার নিচে?"

"হ্যাঁ, হতে পারে। ক্রুশটা তো ওখানেই।" একটা কথা মনে হলো এসময়। "বেইজমেন্টেও কিন্তু একটা ক্রুশ আছে, সেটা..."

"প্রবেশপথ নির্দেশ করা জন্যে?"

"হয়তো।"

কিন্তু বিষয়টা খোঁচাতে লাগল আমাকে। তাই টর্চ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে নিচে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সায়াকা এলো না এবারে।

বেইজমেন্টে এসে ক্রুশটা দেখলাম আবারও। কাঠের তৈরি। এবড়োখেবড়ো। এটাকে আরেকটু যত্ন নিয়ে বানালে কী হতো?

ওটার চারপাশে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো সিলিংয়ের কাছে ছুরির ফলা বা ওরকম ছুঁচালো কিছু দিয়ে সিমেন্ট খুঁড়ে কিছু

একটা লিখেছে কেউ।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ধুলো পরিষ্কার করলাম। আমার আন্দাজ ঠিক প্রমাণিত হলো আবারও। আসলেও কিছু কথা লেখা হয়েছে এখানে।

৫

সিঁড়িতে সায়াকার পদশব্দ শোনামাত্র সরে গেলাম দেয়ালের সামনে থেকে।

"কিছু পেয়েছ?" জিজ্ঞেস করলো ও। "এতক্ষণেও ফিরছ না দেখে চিন্তা হচ্ছিল, তাই এলাম।"

"পেয়েছি, কিন্তু..." বলে টর্চটা বগলের নিচে রেখে দুই হাত থেকে ধুলো ঝারলাম। "ওরকম কিছু না।"

"ক্রুশটা দেখছিলে, তাই না? নতুন কিছু চোখে পড়লো?"

"হ্যাঁ, এখানেও কিছু একটা লেখা আছে," জায়গাটায় আলো ফেললাম। "শান্তিতে ঘুমাও...। ফেব্রুয়ারি, ১১" দেয়ালে সিমেন্ট খুদে এটাই লেখা।

"উপরতলার ওই ক্রুশটার পাশেও একই কথা লেখা।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু দেখো, শান্তিতে ঘুমাও- এরপর কিছু একটা লেখা ছিল মনে হচ্ছে। ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে।"

"হ্যাঁ," বললাম। "হয়তো ভুলে কিছু লেখা হয়েছিল।"

"হয়তো, কিন্তু..." সায়াকা এখনও লেখাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

"এরকম একটা কথা লিখতে গিয়ে কি ভুল করার কথা? শুধু 'শান্তিতে ঘুমাও' লিখলেও তো হতো।"

কিছু না বলে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা উচিত হবে না।

সায়াকার কাঁধ ঝুলে পড়লো একটু পর। শুকনো হেসে আমার দিকে তাকালো। "বুঝতে পারছি না। তুমি যেটা বললে, সেটাই ঠিক বোধহয়। ভুলে কিছু লেখা হয়েছিল হয়তো। পরে মোছা হয়েছে।"

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সায়াকা।

"আমরা তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে পড়ি টোকিওর উদ্দেশ্যে, কী বলো? আর তো কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না," লিভিং রুমে ফিরে বললাম। "বাড়িটা কেন বানানো হয়েছে, সেটা জানি আমরা আংকেল মাঝে মাঝে এখানে কেন আসতেন, সেটাও জানতে পেরেছি। তোমার শৈশবে দেখা কিছু দৃশ্যের অর্থ এখন মোটামুটি পরিষ্কার। আমাদের এখানে আসাটা মোটামুটি স্বার্থক বলা যায়।"

"কিন্তু আমি তো আমার স্মৃতি ফিরে পাইনি।"

"সেটা জানি। কিন্তু এখানে থাকলেই যে স্মৃতিগুলো ফিরে আসবে, তা নয়। বরং মিকুরিয়া পরিবারের ব্যাপারে এখানকার চাইতে ইয়োকোহামাতে বেশি তথ্য জানা যাবে।"

কিছু না বলে পিয়ানোর দিকে এগোলো সায়াকা। ঢাকনা তুলে একটা কি'তে চাপ দিল। ভোঁতা একটা শব্দ হলো। আমি পিয়ানোর ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানি না, তবুও এটা বুঝতে পারলাম যে সুর ঠিক নেই।

"এই ঘরটায় বসে এক সময় পিয়ানো বাজাতাম। এখন মনে হচ্ছে যেন ভিন্ন এক জন্মের কথা," সায়াকা বললো একটু পারলো।

"মানে আসল বাড়িটার লিভিং রুমের কথা বলছো।"

দুর্বল একটা হাসি ফুটলো ওর মুখে। "হ্যাঁ, পুরোনো বাড়িটায়।" "বাড়িটায় তো প্রায়ই যেতে তুমি, লিভিং রুমেও অনেকবার গিয়েছ। তাছাড়া ওই বয়সে সবকিছু নিয়েই কৌতূহল বেশি থাকে। তাই খেয়ালের বশে এরকম পিয়ানো-ও বাজিয়েছ নিশ্চয়ই।"

"খেয়ালের বশে..."

একটা চেয়ার নিয়ে এসে পিয়ানোর সামনে বসলো সায়াকা। দেখে মনে হচ্ছে এখনই বাজাতে শুরু করবে। ও যে পিয়ানো বাজাতে পারে, এরকমটা আমাকে আগে কখনো বলেনি।

তবে পিয়ানো না বাজিয়ে আমার দিকে ফিরলো।

"মনে হচ্ছে বাজাতে পারি," বলে সায়াকা। "তোমার হয়তো হাস্যকর শোনাচ্ছে, কিন্তু এমনটাই মনে হচ্ছে আমার। অথচ কোথায় কী চাপ দিতে হবে জানি না।"

"ছোটবেলায় কম-বেশি সবারই পিয়ানো শেখার ইচ্ছা থাকে।"

"না, সেটা না। আমি আসলে... বোঝাতে পারছি না তোমাকে। একটা জিনিস মনে পড়তে গিয়ে না মনে পড়লে যেরকম লাগে, সেরকম লাগছে এখন।"

রাগত ভঙ্গিতে হাঁটুর উপরে একবার চাপড় দিল ও। এভাবে হতাশা ঝেরে লাভ হবে না বুঝতে পেরেই বোধহয় পরক্ষণে বললো, "আমি ফিরব না। এখানে থাকবো আরও কিছুক্ষণ।" দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিড়ে।

"কিন্তু যা যা দেখার আছে, সব তো দেখেছি, তাই না?"

"ওই সিন্দুকটা কিন্তু খোলা যায়নি।"

"ওহ, হ্যাঁ," এবারে আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা। "কিন্তু কম্বিনেশনটা না জানলে খোলা অসম্ভব আমার পক্ষে।"

"কম্বিনেশনটা কেমন? কয় ডিজিট?"

"অনেকগুলো দুই ডিজিটের সংখ্যা। ডায়ালটা কেবল এক দিকেই ঘোরে। তাই আন্দাজে কিছু একটা চেপে খোলা যাবে বলে মনে হয় না।"

"কম্বিনেশন কোডটা নিশ্চয়ই কোথাও লেখা আছে। তোমার কি মনে হয়?"

"আমিও সেটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথাও কিছু পাইনি।"

"সংখ্যা..." পিয়ানোর দিকে ঘুরে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল সায়াকা।

"যাইহোক, আমি থাকব আরো বেশ কিছুক্ষণ," শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বললো ও।

"আচ্ছা। কিন্তু কিছু খেয়ে আসি নাহয়? ক্ষুধা পেয়েছে নিশ্চয়ই?"

"আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও নাহয়। আমি থাকি। বারবার মনে হচ্ছে এখান থেকে চলে গেলে স্মৃতিগুলো ফিরে আসতে গিয়েও আসবে না।"

"আচ্ছা, তাহলে কিছু কিনে আনি। স্যান্ডউইচ তো অনেক খেয়েছ। রাইসবল আর গ্রীন টি আনব?"

"কিছু একটা আনলেই হলো," অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে সায়াকা। ওর যাবতীয় মনোযোগ এখন হারানো স্মৃতি ফিরে পাওয়ার উপরে নিবদ্ধ।

শহরতলীতে একাই ফিরে চললাম। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছি ওর সাথে এখানে আসাটা উচিত হয়েছে কিনা। যতই বেশি ভাবলাম, ততই মনে হতে লাগলো যে ভুল করে ফেলেছি। হ্যাঁ, অনেক রহস্যের সমাধান হয়েছে, কিন্তু সায়াকার সেটায় কোনো উপকার হয়েছে কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেন যেন মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত মনটা ভেঙ্গে যাবে ওর। সায়াকা অবশ্য বিষয়টা বুঝতে পারেনি এখনো, কিন্তু সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

গত রাতে যে কনভেনিয়েন্স স্টোরটায় এসেছিলাম আমরা, সেটা খোলা আছে এখনও। কয়েক বক্স রাইস বল, সালাদ আর দুই ক্যান গ্রিন টি কিনলাম কেবল। বাড়িটায় খুব বেশিক্ষণ থাকা হবে না আর। বেশি কিছু নিলে নষ্ট হবে।

ফেরার পথে মাতসুবারা হ্রদের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এলাম। ছুটির দিন হওয়ায় দোকানপাটগুলোয় একটু প্রাণ ফিরেছে যেন। ট্যুরিস্টের অপেক্ষায় আছে সবাই।

বাড়িটায় ফিরে খাবারের ব্যাগ নিয়ে লিভিং রুমে চলে এলাম। কিন্তু সায়াকা নেই এখানে। তাতামি রুমটায় উঁকি দিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ইউসুকের বাবা-মা'র ঘরে পেলাম ওকে। রকিং চেয়ারটায় বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফিরলো আমার দিকে।

"তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

"অপেক্ষা করছিলে, কেন?"

"একসাথে দেখব ভেতরে কী আছে।"

"কিসের ভেতরে?"

"সিন্দুকটা," নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে ও।

"সিন্দুক?" আলমারিটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সিন্দুকটার পেছনে এত ঘাম ঝরিয়েছি, সেটা খোলা। "কীভাবে খুললে?"

"কম্বিনেশন দিয়ে," ডায়াল ঘোরানোর ভঙ্গি করলো ও।

"কোডটা জানতে?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে সায়াকা। "এই বাড়িতে কিন্তু আমরা ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট কয়েকটা সংখ্যাই দেখেছি বারবার। ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ, ১১:১০। অর্থাৎ ০২, ১১, ১১, ১০।"

"তাই খুলে গেল?"

"হ্যাঁ," সায়াকার কণ্ঠে গর্ব বা বিজয়ের কোনো ছাপ নেই।

"ধুর। আমি কিনা এত কষ্ট করলাম গাধার মতন।"

"ব্যাপার না। এসো এখন," উঠে দাঁড়ালো সায়াকা। "ভেতরে কী আছে দেখি।"

“তুমি দেখোনি?”

“না,” জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে সায়াকা। “একটু ভয় লাগছিল আসলে।”

আমারও ভয় লাগছে, মনে মনে বললাম। এরপর হাত বাড়িয়ে দিলাম সিন্দুকটার দিকে।

ভেতরে একটা ধূসর রঙের এ-ফোর সাইজের খাম। আকৃতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ভেতরে কাগজ বাদেও অন্য কিছু আছে। প্রাপকের ঠিকানায় লেখা- মিসেস ফুজিকো মিকুরিয়া। কেইচিরো মিকুরিয়ার স্ত্রী এবং ইউসুকের দাদি। খামটার পেছন দিকে লেখা- সোহাচি ওগুরা, কানাগাওয়া পুলিশ প্রিফেকচার।

“পুলিশের লোক পাঠিয়েছে...”

“কী আছে ভেতরে? খোলো।” তাড়া দিল সায়াকা।

আর দেরি না করে সাবধানে খুললাম খামটা। ভেতরে দু’টো কাগজ আর নীল রঙের একজোড়া গ্লোভস। দেখে মনে হচ্ছে কোনো বাচ্চার।

“নববর্ষের সময় একটা এন্ট্রিতে ডায়রিতে এই গ্লোভসটার কথাই লিখেছিল ইউসুকে। ‘বাইরে যাওয়ার সময় মা’র বোনা নীল গ্লোভসটা হাতে দিয়ে গিয়েছিলাম।’

একটা গ্লোভস আমার হাতের উপরে রাখলাম। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর অংশটুকু নেই। পুড়ে গেছে।

৬

কাগজের জাতের লেখা আর পানের ওপরের রাতের লেখা একই। পড়তে শুরু করলাম।

'দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কাছে থাকা একটা জিনিস ফিরিয়ে দিচ্ছি আজ। আপনার মৃত নাতির সেই নীল গ্লোওস। আপনিই বানিয়ে দিয়েছিলেন বোধহয়। মাফ করবেন, কিন্তু তদন্তের খাতিরে নিয়ে আসতে হয়েছিল। গতকাল থানায় চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছি আমরা। প্রথমেই বলে দিচ্ছি রিপোর্টে আমরা লিখেছি এই অগ্নিকাণ্ড একটি দুর্ঘটনা। আগুনের সূত্রপাত হয় নিচতলায় মি. মাসাকাযু'র অফিস পরে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ইদানিংকার শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে অনেক জায়গাতেই এরকম দুর্ঘটনা হচ্ছে।

তবে ব্যাক্তিগতভাবে আমি এই রিপোর্টের সাথে একমত নই। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব এখনও পাইনি, বিশেষ করে যে ঘর থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সেই ঘরে কেরোসিনের ক্যান পাওয়ার ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এই প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন যে হিটিং স্টোভ চালানোর জনো মি. নাসাকার বারবার বেজমেন্টে যেতে ভালো লাগতো না, তাই নিজের পরেই সবসময় কেরোসিন রাখতেন তিনি।

আপনাদের প্রাক্তন গৃহপরিচারিকা তামিকো কুরাহাপিত একইরকম স্বাক্ষ্য দিয়েছে।

তবুও, ব্যাখাটা মানতে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমরা তদন্ত করে যা বুঝেছি মি, মাসাকাসুর অফিস পরটা দামি সব আসবাব আর শোপিসে সজ্জিত ছিল। এত সুন্দর একটা ঘরে কেরোসিন ক্যানের মত কিছু রাখা মানে সৌন্দর্য নষ্ট করা।

আমি এখনও আমার প্রাথমিক অনুমানের পক্ষেই সাফাই গাইব, যেটা শুনে আপনি রেগে গিয়েছিলেন। আগুনটা ইচ্ছেকৃতভাবে লাগানো হয়েছিল কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে। এরপর কোনো এক অজানা কারণে বাবাছেলে দু'জনেরই মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলে খুঁজে পাওয়া ইউসুকের গ্লোভস সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ওটা নিয়ে যাই আমি। বেশ কয়েক জায়গায় বাদামি দাগ ছিল গ্লোভসটার। ওটা যে

জংয়ের দাগ, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের গ্লোভসে ওরকম দাগ কীভাবে লাগল? নিশ্চয়ই কেরোসিন ক্যান থেকে, এটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উত্তর। এই ধরনের ক্যানের হাতলগুলো হয় একদমই পাতলা। গ্লোভস পরিহিত হাতে তুললে দাগ লেগে যায়।

সেজন্যেই গ্লোভসটা নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ল্যাবরেটরিতে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি যে ওটা কেরোসিন ক্যান পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আলামত হিসেবে গুরুত্ব হারায় জিনিসটা।

আরো কিছু সন্দেহজনক কারণে আমার মনে হয়েছিল যে আগুনটা অসাবধানতাবশত লাগেনি। কিন্তু সেই দাবির সপক্ষে কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি এখনও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই তদন্ত এখানেই থামাতে হচ্ছে। নতুন আরেকটা কেসে মনোযোগ দিতে হবে।

আপনার সাথে অদূর ভবিষ্যতে দেখা হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভালো থাকবেন।

বিঃদ্রঃ কিছুদিন আগে এক সাক্ষীর কাছ থেকে অদ্ভুত একটা রিপোর্ট পাই আমরা। ঘটনার দিন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে কেউ একজন আপনাকে চিড়িয়াখানায় দেখেছিল। সেই মুহূর্তে সাথে কেউ ছিল আপনার। সময় বিবেচনায়, এটা তো অসম্ভব। কারণ আপনি বলেছিলেন সেই সময় একাই বাজার করতে গিয়েছিলেন। সাক্ষীকে কথাটা বলি আমি, কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না। হয়তো অন্য কারো সাথে আপনাকে গুলিয়ে ফেলেছে।’

পুরোটা পড়ার পর সায়াকার হাতে তুলে দিলাম কাগজটা। আমার মতই মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলো ও। সেই সুযোগে খামে থাকা গ্লোভসটা দেখতে লাগলাম উল্টেপাল্টে। ডিটেকটিভ ওগুরা চিঠিতে যেমনটা বলেছে, আঙুলের জায়গাগুলোতে আসলেও বাদামি দাগ লেগে আছে।

“কীভাবে সম্ভব!” জোরেই বললাম কথাটা। ইউসুকের মৃত্যুর সাথে মানব চরিত্রের কুৎসিত দিকের সম্পর্ক আছে।

“দু’জনেই মারা গেছে,” ফিসফিসিয়ে বলে সায়াকা। “তাহলে আগুনটা দুর্ঘটনাবশত লাগেনি?”

“এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাবে না। পুরোটাই ডিটেকটিভ লোকটার অনুমান।”

"সে কিন্তু আরো কিছু সন্দেহের ব্যাপারে বলেছে, এই গ্লোভসটার মতনই," বলে সায়াকা।

"যে ঘরে আগুনের সূত্রপাত, সেখানে কেরোসিনের ক্যান খুঁজে পাওয়াটা আসলেই সন্দেহজনক," বলি আমি। "পুলিশের উচিত ছিল আরেকটু খতিয়ে দেখা।"

আমার কথা শুনে একটু অবাক হলো সায়াকা। "উচিত ছিল মানে?"

"মি. মিকুরিয়া তো একজন আইনজীবি ছিলেন। পুলিশ ফোর্সেও নিশ্চয়ই পরিচিত লোক ছিল তার। তাই, এটা আন্দাজ করলে বোধহয় ভুল হবে না যে পুলিশ ইচ্ছে করেই ঘটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। মিসেস মিকুরিয়া বোধহয় অনুরোধ করেছিলেন যেন ডিটেকটিভ ওগুরা'কে খুব বেশি তদন্ত করতে দেয়া না হয়।"

"অর্থাৎ, ফুজিকো মিকুরিয়া জানতেন যে এটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়? সত্যটা জেনেও গোপন করতে চাইছিলেন তিনি?"

"হয়তো," বলি আমি। "আবার এভাবেও চিন্তা করা যায় যে পুলিশ যেহেতু খুব বেশি তদন্ত করেনি, এটা আসলেও একটা দুর্ঘটনাই ছিল।"

চিঠিটা আরো একবার পুরোটা পড়ে মুখ তুললো সায়াকা। "আগুনটা যদি ইচ্ছে করেই লাগানো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কার কাজ ছিল? কেইচিরো মিকুরিয়ার ছেলে মাসাকা? নাকি...

"ডিটেকটিভ ওগুরা ইউসুকে'কে সন্দেহ করছে। গ্লোভসের দাগগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করে।"

সায়াকা'ও এরকম কিছুই আশা করছিল। অবাক হলো না। বরং শঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় হতাশা ফুটলো ওর চোখেমুখে।

"আগুনের সূত্রপাত হয় সকাল এগারোটায়। ফেব্রুয়ারির এগারো তারিখ, সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় মাসাকায়ু মিকুরিয়া হয়তো তখনও বিছানাতেই ছিল। নিয়মিত মদ গিলত সে, খুব একটা সকালে ওঠার কথা না। ইউসুকে বোধহয় সেই সুযোগটাই নেয়ার চেষ্টা করেছে।"

"কীভাবে আগুন ধরালো ও?" ভয়ার্ত চোখে জিজ্ঞেস করে সায়াকা।

"যেভাবে সবাই ধরায়। ঘুমন্ত অবস্থায় শিকারের গায়ে কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। একটা বাচ্চার পক্ষেও কাজটা করা সম্ভব, ওরকম কঠিন কিছু না।"

"এরপর নিজেও আত্মহত্যা করেছে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে?"

"সেটাই তো মনে হচ্ছে।"

কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো সায়াকা। "তুমি নিশ্চিত?" খানিক বাদে জিজ্ঞেস করলো।

"কেন, তোমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে?"

“এরকমটা কি করা আদৌ সম্ভব? শুনেই তো কেমন লাগছে,” চিন্তিত স্বরে বলে সায়াকা।

“ইউসুকে’র উপরে ওর বাবা শারীরিক নির্যাতন চালাতো, ডায়রির লেখা থেকে এটা স্পষ্ট। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ অনেক সময় অবিশ্বাস্য সব কাজ করে বসে।”

“সেটা জানি আমি,” থুতনিতে হাত রেখে মুখটা হালকা ঘুরিয়ে ভাবতে লাগলো সায়াকা। ভুলতে পারছে না বিষয়টা।

গ্লোভস জোড়া খামে ঢুকিয়ে রাখলাম।

“যাইহোক, এর বেশি আর কিছু জানা সম্ভব না আমাদের পক্ষে। ইউসুকে যে ওর বাবাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে, এটা পুরোপুরি ওই ডিটেকটিভের আন্দাজ মাত্র।”

“হ্যাঁ,” ক্ষীণস্বরে বললো সায়াকা। এখনও চিঠিটার দিকেই নজর ওর। বিঃদ্রঃ দিয়ে যে কথাগুলো লেখা আছে, সেটা খেয়াল করলো এবারে। “এটা আবার কেন লিখেছে?”

“জানি না। হয়তো একই রকম চেহারার কাউকে দেখেছে।”

“যদি সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়ে থাকে, তাহলে লিখল কেন?” “ভদ্রলোকের কাছে বোধহয় একটু অদ্ভুত লেগেছিল বিষয়টা।”

“মনে হয় না,” মাথা ঝাঁকায় সায়াকা। “তাছাড়া, এরকম একটা রিপোর্ট অদ্ভুত ঠেকেনি তোমার কাছে?”

“অদ্ভুত লাগবে? কেন?”

“কারণ...” ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ও। কিছু চিন্তা করার সময় এমনটা করা মুদ্রাদোষ ওর। মনের মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললো, “বুঝলাম মিসেস মিকুরিয়াকে ঘটনার দিন চিড়িয়াখানায় দেখেছিল সেই সাক্ষী। কিন্তু সেটা পুলিশকে জানানোর কী দরকার ছিল? এমন তো আর নয় যে পুলিশের সন্দেহ ছিল মিসেস মিকুরিয়াই আগুন লাগিয়েছে। সেক্ষেত্রে তথ্যটা অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহৃত হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু অমন কিছু ঘটেনি।”

ওর কথা শুনে নিচের লেখাগুলো আবারও পড়লাম। যুক্তি আছে সায়াকার কথায়।

“তোমার কাছেও অদ্ভুত লাগছে, তাই না?” জিজ্ঞেস করলো ও।

“বলা মুশকিল আসলে,” সাবধানে কথাটা বললাম। “তদন্ত চলাকালীন সময় লোকে তো অনেক উল্টোপাল্টা বিষয় জানায় পুলিশকে। যেগুলোর সাথে কেসের আপাত কোনো সম্পর্কই থাকে না। হয়তো এক্ষেত্রেও সেরকম কিছুই ঘটেছে। চিঠির শেষে বিষয়টা মনে পড়ায় ডিটেকটিভ ওগুরা উল্লেখ করে দিয়েছে আর কি।”

“তাই?”

“এছাড়া আর কী হতে পারে?” জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ো আঙুলের নখ কামড়াতে কামড়াতে জানালার দিকে ঘুরলো সায়াকা। ওভাবেই থাকলো প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড।

"চিড়িয়াখানা..." ফিসফিসিয়ে বললো একটু পর।

"কী বললে?"

আমার দিকে তাকালো ও।

"এই চিড়িয়াখানার বিষয়টা খোঁচাচ্ছে আমাকে। যেদিন আগুন লাগলো, সেদিনই চিড়িয়াখানায় যাওয়া। আগুন আর চিড়িয়াখানা..." অসংলগ্ন শোনাচ্ছে এখন সায়াকার কথা। দুই হাত দিয়ে চেপে রেখেছে মুখ। "কেন যেন মনে হচ্ছে দু'টোর মধ্যে কোনো সংযোগ আছে।"

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। "তুমি আসলে একটু বেশিই ক্লান্ত। ছোটখাটো বিষয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ সেজন্য।"

"আরে নাহ। কী যেন একটা মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না।" বেশ কয়েকবার 'চিড়িয়াখানা' শব্দটার পুনরাবৃত্তি করলো সায়াকা। যেন এই মন্ত্র জপলে হারানো স্মৃতি ফিরে পাবে।

"চলো খেয়ে নিই। একটু চাপ কমবে মাথা থেকে।"

"চুপ করবে তুমি?" হঠাৎই রুক্ষ স্বরে বললো ও।

চমকে গেলাম। খামটা পড়ে গেল হাত থেকে। সেই শব্দে হুঁশ ফিরে পেল ও। লজ্জার হাসি ফুটলো মুখে। আমার সাথে ওভাবে কথা বলায় আফসোস হচ্ছে বোধহয়।

"সরি।"

"ব্যাপার না। আসলে সবকিছু নিয়েই এখন সন্দেহ হচ্ছে আমাদের।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বললো সায়াকা। "ঠিক বলেছ। আসলেও কিছু খাওয়া দরকার। মাথা কাজ করছে না। কী এনেছ?"

"বেশি কিছু না," প্লাস্টিকের ব্যাগটা তুলে নিলাম।

"চলো তাহলে নিচে গিয়ে খাই।"

"তুমি যাও, আমি সবকিছু একটু গুছিয়ে আসছি।"

"হ্যাঁ।"

রুম থেকে বেরিয়ে গেল সায়াকা। ও নিচে চলে গেছে, এটা নিশ্চিত হবার পর আলমারিটার সামনে গিয়ে নিচের ড্রয়ার থেকে বাইবেলটা বের করলাম।

সায়াকা বারবার চিড়িয়াখানা শব্দটা বলায় একটা কথা মনে পড়ে গেছে। গতকাল বাইবেলটার ভেতরে দু'টো টিকেট রাখা দেখেছিলাম। তখন অতটা মনোযোগ দেইনি বিধায় তারিখটা খেয়াল নেই।

বাইবেলের মাঝ বরাবর রাখা টিকেট দু'টো। একপাশে একটু ছেড়া, অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়েছিল এটা নিশ্চিত। একটা টিকেট প্রাপ্ত বয়স্কদের আর অন্যটা বাচ্চাদের।

আর তারিখ...

লেখা ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবে ‘ফেব্রুয়ারি ১১’ পড়া যাচ্ছে। বছরও মিলে গেছে।

এটা কাকতালীয় হতেই পারে না। ডিটেকটিভ ওগুরাকে কেউ একজন সত্যিটাই জানিয়েছিল তাহলে। ফুজিকো মিকুরিয়া সেদিন আসলেই গিয়েছিলেন চিড়িয়াখানায়।

আর সেখানে একা যাননি তিনি।

চিঠিটার নিচে ডিটেকটিভ ওগুরাও দু’জনের কথাই বলেছে। ‘প্রাপ্ত বয়স্ক’ লেখা টিকেটটা মিসেস মিকুরিয়ার। তাহলে বাচ্চাদের টিকেটটা কার? ইউসুকের না, এটা নিশ্চিত।

হঠাৎ মনে হলো কেউ বুঝি বরফ ঢেলে দিয়েছে আমার পিঠের মাঝ বরাবর। আরেকটু হলেই টিকেট দু’টা পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে।

ওগুলো আগের জায়গায় ঢুকিয়ে বাইবেলটা রেখে দিলাম ড্রয়ারে। এই সামান্য কাজ করতেও সময় লাগলো অনেকক্ষণ, কারণ হাত কাঁপছে আমার।

এসময় হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো পেছন থেকে। শ্বাস আটকে পেছনে ফিরে দেখি সায়াকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে সন্দিহান চোখে।

“কী করছো তুমি?” জিজ্ঞেস করে ও।

“কিছু না,” উঠে দাঁড়িয়ে বলি। “ড্রয়ারের ভেতরে আবার একটু দেখছিলাম। পুরোনো একটা বাইবেল ছাড়া আর কিছু নেই।”

কথা বলার সময় আমার মাথায় ঘুরতে লাগল ও যদি এখন বাইবেলটা দেখতে চায় তাহলে কী বলবো। ঘাম জমলো কপালে।

“ওনারা তো বোধহয় খ্রিস্টান ছিল। বাইবেল থাকাটাই স্বাভাবিক, সায়াকা বললো একটু পর।

“তা ঠিক।”

“নিচে আসো এখন?”

“হ্যাঁ, চলো।”

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম গোপনে। ওকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলাম ঘরটা থেকে।

৭

“সায়াকা, তুমি বিষয়টাকে যতটা অস্বাভাবিক ভাবছ, আসলে ততটা নয়,” কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে কিনে আনা রাইস বল চিবুতে চিবুতে বলি। “অনেকেরই কিন্তু শৈশবের কোনো স্মৃতিই মনে থাকে না।”

“তো?” আমার দিকে তাকালো সায়াকা।

গ্রীন টি দিয়ে মুখের রাইস বলটা গিলে নিলাম। “এই অভিযানের এখানেই নাহয় ইতি টানি আমরা? তাছাড়া মিকুরিয়া পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়ে আর নাক গলানো কি উচিত হবে? বিশেষ করে সবকিছু ধামাচাপা দেয়ার জন্যে যখন এত কিছু করেছে তারা।”

আমার কথাটা অল্প হলেও প্রভাব ফেলল সায়াকার মনে। অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে এখন ওকে। “এই সমাধির কথা বলছো?”

“হ্যাঁ। এটা এক অর্থে সমাধিই।”

বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে সোফায় হেলান দিল ও। “তুমি কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছো,” হঠাৎই বলে বসলো পরমুহূর্তে। চোখে সন্দেহ।

“অদ্ভুত? মানে?”

“কীভাবে বুঝাই... হুট করেই নেতিবাচক সব কথা বলতে শুরু করেছ। অথচ একটু আগেও তোমার মধ্যে উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না। কী হয়েছে, বলো তো?”

“কিছু না। রহস্যের যেহেতু সমাধান হয়েছে, তাই ফিরে যেতে চাইছি। আর যেমনটা কেবলই বললাম, একটা সমাধির ভেতরে এভাবে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে বাধছে এখন।”

“ব্যস, এটুকুই?”

“হ্যাঁ, এটুকুই। আর কী কারণ থাকতে পারে?” ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর মুখ ফিরিয়ে নিল ও। “আমার মতে রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি।”

“কিন্তু মিকুরিয়া পরিবারের ট্রাজেডির বিষয়ে যা যা জানার আছে, সব তো জানি আমরা। কেইচিরো মিকুরিয়া তার ছেলে মাসাকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন পুরোপুরি। নাতি ইউসুকে'কে সন্তানের মত বড় করেন। কিন্তু কেইচিরোর মৃত্যুর পর ছেলের উপরে অত্যাচার শুরু করে মাসাকায়ু। সেই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে গায়ে আগুন দিয়ে বাবাকে হত্যা করে ইউসুকে, পরে নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এসবই তো আমরা জানি, তাই না? আর কিছু কি জানা বাকি আছে?”

“আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।”

“অতিরিক্ত ভেবে ফেলছ তুমি।”

"না," সোফা থেকে উঠে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক পা সামনে এগোলো সায়াকা। পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। "তুমি এতক্ষণ যা যা বললে, সেখানে আমি নেই কোথাও।"

"না থাকাই স্বাভাবিক," শান্ত থাকার চেষ্টা করে বললাম। "তুমি তো আর এই পরিবারের কেউ না। ইউসুকের অত্যাচারের শিকার হওয়া বা এই বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। কেন, তোমার কিছু বলার আছে?"

পিয়ানোর সামনে রাখা টুলটায় বসে লম্বা শ্বাস নিল সায়াকা। "আমি মনে হয় দেখেছি দৃশ্যটা।"

"কী দেখেছ?"

"বাড়িটা... পুড়ে যেতে," ক্ষণিকের দ্বিধার পর বললো ও।

ঢোক গিললাম একবার।

"পুড়ে যেতে দেখেছ? মিকুরিয়াদের বাড়িটা?"

"জানি না। কিন্তু ওটাই তো হবার কথা। ধোঁয়া, লোকজনের ছোটাছুটি... আর পোড়া গন্ধ," প্রায় চোখ বন্ধ করে বললো সায়াকা । "কেউ ছিল আমার সাথে।"

"তোমার মা-ই হবেন নিশ্চয়ই, ইউসুকের ওটাই আন্টি। আগুনের খবর শুনে এসেছিলে বোধহয় ..."

চোখ খুলে আরেকবার লম্বা শ্বাস নিল সায়াকা। আশপাশে নজর বুলাতে বুলাতে থেমে গেল হঠাৎ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। কফি টেবিলটা দেখছে তন্ময় হয়ে।

"কী দেখছ?" একবার ওর দিকে, আরেকবার কফি টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললাম।

সামনে এগিয়ে একটা সি-উইড রাইস বল তুলে নিল ও। যেন ভীষণ দামি কিছু, এমন ভঙ্গিতে হাতের তালুতে রেখে দেখতে লাগলো।

"হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ?" বলি আমি। কিন্তু ওর মধ্যে কোনো ভাবগতিক নেই।

হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করে একমনে কী যেন বলে চলেছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। "খাওয়ানোর দরকার নেই, বকবে কিন্তু। খাওয়াবে না-"

ওর কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকি দিলাম একবার। "কী হলো তোমার? সায়াকা?"

ক্রোধান্বিত চোখে আমার দিকে তাকালো ও। "ছাড়ো তো আমাকে! চলে যাও এখান থেকে," রাগ সামলে বললো।

"তোমাকে এভাবে একা রেখে যাওয়া সম্ভব না। কী চলছে তোমার মনে, বলো তো।"

"আমাকে দশটা মিনিট একা থাকতে দাও, প্লিজ। নাহলে পাঁচ মিনিট দাও অন্তত। তাই যথেষ্ট।"

মনের মধ্যে কুডাক দিল আমার। কিন্তু এই অবস্থায় ওকে মানা করা সম্ভব না।

“আচ্ছা, পাশের ঘরে আছি আমি। যদি দরকার পড়ে, তাহলে ডাক দিও। ঠিক আছে?”

নীরবে মাথা নাড়ল ও।

তাতামি ঘরটায় গিয়ে নিচে পা ভাঁজ করে বসলাম। আমার নিজেরও অস্থির লাগছে এখন।

‘খাওয়ানোর দরকার নেই।’

এটা পরিষ্কার যে স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে সায়াকার। ওকে একা ফেলে আসা উচিত হলো কিনা বুঝতে পারছি না। এই বাড়িটা থেকে যত দ্রুত বেরুনো যায়, তত ভালো। কিন্তু সেটায় কি ওর প্রতি সুবিচার করা হবে?

হুট করে নেতিবাচক সব কথা বলতে শুরু করেছ'- এমনটাই বলেছিল সায়াকা। ওর মতন বুদ্ধিমান একটা মেয়ের সামনে অবশ্য অভিনয় করে পার পাওয়া যাবে না। আমার নেতিবাচক আচরণের কারণ আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

হাতঘড়িতে দেখলাম তাতামি ঘরটায় আসার পর থেকে আট মিনিট পার হয়ে গেছে। পা টিপে টিপে লিভিং রুমটায় গেলাম। ও নেই এখানে।

“সায়াকা!” জোরে ডেকে উঠে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে দিলাম। কেইচিরো মিকুরিয়া আর তার স্ত্রী'র ঘরটার সামনে গিয়ে দেখি আলমারির নিচের ড্রয়ারটার সামনে উবু হয়ে বসে আছে ও।

স্লো-মোশন ভিডিওর কোনো চরিত্রের মতন আমার দিকে ফিরলো ও। ওর হাতে বাইবেলের ভেতরে থাকা চিড়িয়াখানার টিকেট দু'টো।

“সায়কা...” আবারও ডাকলাম একই স্বরে।

“কেন? যেদিন বাড়িটায় আগুন লাগল সেদিন মিসেস মিকুরিয়া চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন?”

“কী কেন?”

“তার সাথে আমি চিড়িয়াখানায় গেলাম কেন?”

“তুমি? সেটা কী করে সম্ভব।” হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম বিষয়টা, কিন্তু পারলাম না। মিথ্যেটা নিশ্চয়ই প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে আমার চেহায়ার।

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সায়াকা। “হ্যাঁ, ওখানে গিয়েছিলাম আমি। এটুকু মনে পড়েছে। অনেক দিন আগের কথা সেটা। তখন একদম ছোট ছিলাম। একজন মহিলা ছিল আমার সাথে, কিন্তু তার চেহারা মনে করতে পারছি না। একটা কিমোনো পরেছিল সে। তবে সেটা যে মা ছিল না, তা নিশ্চিত।”

“তোমার কোনো ভুল হচ্ছে, সায়াকা।”

“তাহলে এটা কী? এখানে ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখের কথা লেখা আছে, দেখো। ওই দিনই তো আগুন লেগেছিল, তাই না? পূর্ণবয়স্ক দর্শনার্থীর একটা টিকেট, আরেকটা বাচ্চাদের। আর চিঠিতেও কিন্তু লেখা ছিল যে মিসেস মিকুরিয়াকে চিড়িয়াখানায় কেউ দেখেছে।”

কিছু বললাম না। ভালো একটা ব্যাখা খুঁজে বের করতে হবে এখন। কিন্তু এরকম চাপের মুখে সেটা এক প্রকার অসম্ভব।

"মিসেস মিকুরিয়া চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কার সাথে? বাচ্চাটা যদি আমি না হই, তাহলে কে ছিল সেটা?"

মাথা নামিয়ে নিলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের ঝাপটায় শব্দ করে বন্ধ হলো জানালা। পুরো ঘর কেঁপে উঠলো।

"তুমি জানতে এটা, তাই না? আমি আর মিসেস মিকুরিয়া একসাথে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। কিন্তু জেনেও আমার কাছ থেকে লুকোনোর চেষ্টা করছিলে। কেন?"

"তুমি কী নিয়ে কথা বলছো বুঝতে পারছি না।"

"মিথ্যে বলবে না!" তীক্ষ্ণ স্বরে বললো সায়াকা। "একটু আগে তুমি এই ড্রয়ার খুলেছিলে। তখন আমাকে টিকেটগুলো দেখাওনি। বুঝতে পেরেছিলাম যে কিছু একটা লুকাচ্ছ, কিন্তু তোমাকে টের পেতে দেইনি।"

"শান্ত হও। তুমি মনে হয় একটু বিভ্রান্ত।"

"একটু না, পুরোপুরি বিভ্রান্ত। কিন্তু..." হাতের টিকেটগুলোর দিকে তাকালো ও। "আমি বোধহয় স্মৃতি ফিরে পাচ্ছি। অল্প অল্প করে হলেও।"

"কীরকম?" জিজ্ঞেস করি।

ধীরে ধীরে মাথা তুললো সায়াকা। "অনেকটা সিনেমার ট্রেইলার দেখার মতন, কিছু কিছু দৃশ্য মনে পড়েছে। কিন্তু সেগুলো আসলেও ঘটেছিল কিনা, সেই বিষয়ে নিশ্চিত নই আমি। আসলে, আমি চাই না ঘটনাগুলো সত্য হোক। কারণ-" হঠাৎ থেমে কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করলো সায়াকা। "ঘটনাগুলো বড্ড ভয়ঙ্কর।"

"সায়াকা..." সামনে এগিয়ে নিচু হয়ে বসে ওর হাতটা আমার হাতে নিলাম। "হ্যালুসিনেশনের মত হচ্ছে তোমার। শারীরিক আর মানসিক ক্লান্তির কারণে। আজকের মত এসব বাদ দিয়ে টোকিও ফিরে-"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই," আমার কথার মাঝেই বললো ও।

"কী?"

"ঠিকঠাক জবাব দিবে। মিথ্যে বলবে না, প্লিজ।"

"আচ্ছা," দ্বিধান্বিত স্বরে বললাম একটু পর।

আমার চোখে চোখ রাখলো ও।

"বেইজমেন্টের ক্রুশটা..."

"হ্যাঁ?"

"'শান্তিতে ঘুমাও' লেখা আছে ওখানে। কিন্তু একটা শব্দ মুছে ফেলা হয়েছে।"

ঢোক গিলতে গিয়েও পারলাম না। গলা শুকিয়ে এসেছে আমার। "তুমি মুছেছ শব্দটা, তাই না?"

"না।"

“তোমার কাছে সত্যটা জানতে চেয়েছি আমি,” লাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে সায়াকা। “টর্চের এক পাশে সিমেন্ট লেগে ছিল। ওটা দিয়েই মুছেছ, তাই না?”

জবাব দিলাম না।

“আচ্ছা, কেন মুছলে সেটা বলতে হবে না। কী লেখা ছিল সেটা বলো।”

এবারেও চুপ রইলাম।

“আচ্ছা, অন্য ভাবে করি প্রশ্নটা। ওখানে কি কারো নাম খোদাই করা ছিল?”

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দেয়া উচিত আমার। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। সায়াকার কাছ থেকে সত্যটা লুকানো মনে হয় না সম্ভব হবে।

“নামটা ছিল...” শান্ত স্বরে বললো ও। “সায়াকা... তাই না? ঠিক বলেছি?”

মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে হৃদয়টা ধরে চাপ দিয়েছে কেউ। ধীরে ধীরে সয়ে এলো অনুভূতিটা। ক্লান্তি ভর করলো চিত্তে। কথা বলার জন্যে মুখ খুললাম ঠিকই, কিন্তু কোনো শব্দ বেরুলো না। আমার এই প্রতিক্রিয়া দেখেই যা বোঝার বুঝে গেল সায়াকা।

“এটাই তাহলে।” চোখ দিয়ে পানি ঝরছে ওর। মোছার চেষ্টাও করছে না। “অদ্ভুত, তাই না? শান্তিতে ঘুমাও, সায়াকা। তাহলে সায়াকা কুরাহাশি নামের ছোট্ট মেয়েটা মারা গেছে? তাহলে আমি কে? নিজেকে তো এই নামেই চিনে এসেছি সারা জীবন। হাইস্কুলে তো আমাকে এই নামেই ডাকতে, নাকি?”

জানালার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। বাইরে প্রচুর আলো, কিন্তু রুমের ভেতরটা অন্ধকার। ছায়াবয়বের মত দেখাচ্ছে ওকে আলোর বিপরীতে।

“চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাতিদের রাইস বল খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলাম আমি। কিন্তু আমার সাথে যে গিয়েছিল, সে মানা করছিল বারবার। “খাওয়ানোর দরকার নেই। বকবে কিন্তু। খাওয়ানোর দরকার নেই, হিসামি।”

“হিসামি...”

“নামটা কীভাবে লিখতে হয়, সেটা আগে জানতাম। এখন ভুলে গেছি। তাছাড়া একমাত্র সে-ই আমাকে ওই নামে ডাকত। বাকিরা ডাকত আমার ডাকনাম ধরে। চামি। এটাই আমার ডাকনাম।”

ইউসুকে ওর ডায়রিতে ওই লোকটা বলে যাকে সম্বোধন করেছে, মানে মাসাকা মিকুরিয়া যে ওর বাবা, এটা জানার পর প্রথম খটকা লাগে আমার। হিসেব মিলছিল না। আবার মাসাতসুগু নাকানো'কে কেইচিরো মিকুরিয়া যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন, সেগুলোর একটায় লেখা ছিল-

আপনি যে দ্বিতীয় সন্তানের ব্যাপারে এত দ্রুত জানতে পেরেছেন, এটা শুনে অবাক হয়েছি। আসলে আমরা কাউকেই বলিনি তখন। মাফ করবেন সেজন্যে। যেহেতু এর আগে ছেলে হয়েছে, তাই এবারে ছেলে হোক বা মেয়ে, আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

প্রথম যখন চিঠিটা পড়ি, তখন আমাদের ধারণা ছিল মাসাকা মিকুরিয়া হচ্ছে ইউসুকের বড় ভাই। তাই 'দ্বিতীয় সন্তান' বলতে এখানে ইউসুকে'কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মাসাকায়ু মিকুরিয়া যেহেতু ইউসুকের বাবা, তাই চিঠির কথাগুলোর অর্থ আমূল বদলে যায়। সেক্ষেত্রে ইউসুকে হচ্ছে প্রথম সন্তান, দ্বিতীয় সন্তান আর কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীর মুখ দেখবে।

ইউসুকের মা ওকে জন্মদানের কিছুদিন পরেই মারা যায়। তাহলে, দ্বিতীয় এই সন্তান খুব সম্ভব মাসাকায় মিকুরিয়ার দ্বিতীয় বিবাহের ফসল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দ্বিতীয় সন্তানের কী হলো? ইউসুকে সেই ব্যাপারে ডায়রিতে কিছু উল্লেখ করেনি।

আর এখানেই আমার খটকা লাগে।

কিন্তু এটারও ব্যাখা দাঁড় করানো যায়। কেইচিরো মিকুরিয়ার পাঠানো অন্য আরেকটা চিঠির তথ্যানুযায়ী মাসাকায়ু মিকুরিয়ার সাথে তার দ্বিতীয় স্ত্রী'র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আর সেটার কারণ বোঝাও কষ্টকর কিছু নয়। জুয়ার নেশার কথা স্কুলে জানাজানি হবার পর চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় মাসাকা মিকুরিয়া। অনেকেই টাকা-পয়সা পেত তার কাছে। ডিভোর্সের পর হয়তো সন্তানকে নিজের সাথেই নিয়ে গিয়েছিল মাসাকায়ুর দ্বিতীয় স্ত্রী।

তবুও হিসেব মিলাতে পারি না। ইউসুকে'কে যেরকম যত্নে বড় করেছেন কেইচিরো মিকুরিয়া, দ্বিতীয় নাতিকেও সেভাবেই মানুষ করার কথা ছিল তার। অথচ ছেলের দ্বিতীয় স্ত্রী যখন নাতিকে নিয়ে চলে গেল, তখন কিনা কিছুই বললেন না ভদ্রলোক?

কিন্তু সায়াকা'কে আমার এসব সন্দেহের ব্যাপারে কিছু বলিনি। আমার মনের মধ্যে একটা কন্ঠস্বর বারবার বলছিল, এই বিষয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিপদ হতে পারে।

বেইজমেন্টে ক্রুশটার পাশে লেখাগুলো পড়ে আরো নিশ্চিত হই এই বিষয়ে। যেমনটা সায়াকা বললো একটু আগে, ওখানে লেখা ছিল-

'শান্তিতে ঘুমাও, সায়াকা। ফেব্রুয়ারি, ১১।'

এমনটা বলা যায় এখানে হয়তো একই নামের অন্য কারো কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। এই সায়াকা হচ্ছে, ইউসুকের ডায়রিতে উল্লিখিত *সায়াকা*।

নামটা দেখে ঘাবড়ে যাই আমি, অস্বীকার করবো না।

শুধু ইউসুকে আর মাসাকায়ু মিকুরিয়াই সেদিন আগুনে পুড়ে মারা যায়নি। ওটাই আন্টির মেয়ে সায়াকাও মারা গিয়েছিল। হয়তো বেইজমেন্টে খেলাধুলা করছিল সে। বাড়িটায় যে আগুন ধরেছে, তা বুঝতে পারেনি।

মোদ্দা কথা, এই বাড়িটা যে শুধু ইউসুকের সমাধি, তা নয়। সায়াকারও সমাধি।

সেক্ষেত্রে আমি যার সাথে এখানে এসেছি, সে কে? স্বাভাবিক যুক্তিতে, মিকুরিয়া পরিবারের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এটা বলা যাবে না। কারণ তাদের নিয়ে আবছা আবছা স্মৃতি আছে ওর।

সেই সময় থেকে মাসাকা মিকুরিয়ার দ্বিতীয় সন্তানকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি আমি। আমি যে সায়াকাকে চিনি, সে কি তাহলে ইউসুকের সৎ বোন?

ডায়রির লেখাগুলো মনে করার চেষ্টা করি। কোথাও কি দ্বিতীয় সন্তানের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে?

তখন চামির নামটা মনে হয় আমার। বেশ কয়েক জায়গায় ইউসুকে লিখেছে-

‘লোকটা একটা বড় ট্রাকে করে তার মালপত্র নিয়ে এসেছে এখানে। নিচতলার বেডরুমটায় থাকার ইচ্ছা তার। ওখানেই রেখেছে সবকিছু। সে কেন আমাদের সাথে থাকবে, এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম মা’কে। তখন মা বলে যে আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি লোকটা এসেছে। আমি আসলে বুঝতে পারছি না সেই ‘ভালো’টা কী হতে পারে। এরকম একটা লোককে বাসায় চাই না আমি। কিন্তু চামি অনেক কিউট, ওকে পেয়ে ভালো লাগছে। শুধু চামিকে আমাদের কাছে দিয়ে গেলে ভালো হতো।’

‘আজকে কাগজের বল বানিয়ে চামির সাথে খেললাম। প্রথমে বল ধরতে পারছিল না ঠিক মত, এখন একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে।’

‘সন্ধ্যায় ওটাই আন্টি এসেছিল তার মেয়েকে নিয়ে। চামির সাথে নাকি দেখা করতে চায় সে, তাই ঘরে গিয়ে চামিকে নিয়ে আসি। মিস ওটাইয়ের মেয়ে এত মিষ্টি করে ‘হ্যালো, আমার নাম সায়াকা’ বললো!’

ইউসুকে আসলে এমনটা কোথাও বলেনি যে চামি একটা বিড়াল। কিন্তু আমরা সেটাই ধরে নিয়েছিলাম।

এই কথা মাথায় আসার পর টর্চ দিয়ে দেয়াল থেকে নামটা মুছে দেই আমি। ততক্ষণে মনের মধ্যে একটা ধারণা জেঁকে বসতে শুরু করেছে। কিন্তু সমস্যাটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না বলে সিদ্ধান্ত নিই। সায়াকা’কে এই বাড়িটা থেকে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যাওয়া যায়, তত ভালো।

কিন্তু সায়াকার যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সিন্দুকের ভেতরে থেকে ওই চিঠিটা ওকে আরও বেশি সন্দিহান করে। কফিনের শেষ পেরেকটা ঠুকে দেয় বাইবেলের

ভেতরে থাকা টিকেট দু'টো।

ডিটেকটিভ ওগুরা'র চিঠি আর চিড়িয়াখানার টিকেট দু'টো দেখে মিকুরিয়াদের বাড়িতে সেদিন কী ঘটেছিল এবং সায়াকার সাথে পুরো ঘটনার সংযোগ কী হতে পারে, তা বুঝে গিয়েছিলাম আমি। টিকেটগুলো প্রমাণ করে যে মিসেস মিকুরিয়া সেদিন আসলেও চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ডিটেকটিভ ওগুরা চিঠির শেষে এটাও লিখেছিল যে, ভদ্রমহিলার সেই সময় চিড়িয়াখানায় থাকাটা অসম্ভব। মিসেস মিকুরিয়া বলেছিলেন, তিনি বাজারে গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র এই কারণেই কি ওগুরা অসম্ভব বলেছেন? নাহ, এই কথা শোনার পর বরং তার সন্দেহ হবার কথা। অন্য কোনো ব্যাখা আছে নিশ্চিত।

হয়তো সমস্যাটা মিসেস মিকুরিয়াকে নিয়ে নয়, বরং তার সাথে থাকা বাচ্চাটাকে নিয়ে। সে-ও সেদিন চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল, এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে মাসাকায়ু মিকুরিয়ার দ্বিতীয় সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিসেস মিকুরিয়া। অর্থাৎ নাতনির সাথে ঘুরতে বের হয়েছিলেন।

তখন মনে পড়ে যে বেইজমেন্টে আরেকটা মেয়ে মারা যায় সেদিন আর সেটা হচ্ছে ওটাই আন্টির মেয়ে সায়াকা।

কিন্তু পুলিশ ধরে নেয় বেইজমেন্টে যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে মাসাকায়ু মিকুরিয়ার দ্বিতীয় সন্তান। সেজন্যেই ডিটেকটিভ ওগুরা মিসেস মিকুরিয়ার চিড়িয়াখানায় যাওয়ার ব্যাপারটাকে অসম্ভব আখ্যায়িত করে।

কিন্তু মৃতদেহ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয় না পুলিশের। ওটা যে সায়াকা'র লাশ, সেটা ধরে নেয়ার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে অবশ্যই।

তাছাড়া, নাতনির মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্যে নিশ্চয়ই মিসেস মিকুরিয়াকেই ডেকেছিল তারা। তিনি তখন নিশ্চিত করেছেন যে আগুনে পুড়ে তার নাতনিই মারা গেছে।

যে কারণে চামি মিকুরিয়াকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সায়াকার ব্যাপারে কেউ কিছু জানেনি।

এরপর চামি'র দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয় কুরাহাশি পরিবারকে। তারা ওখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় যাতে প্রকৃত সত্যটা কেউ বুঝতে না পারে। কুরাহাশি দম্পতি চামিকে সায়াকা নামেই বড় করে। মেয়েটা স্মৃতি হারিয়ে ফেলায় তাদের আর বাড়তি ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

কিন্তু এই অদলবদলের কারণটা কী? এই প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দেয়া এখন মুশকিল। আমার মতে, মিসেস মিকুরিয়া এটাতেই চামির মঙ্গল হবে ভেবেছিলেন। যদি মেয়েটা জানতে পারে যে পারিবারিক সহিংসতার জেরে তার ভাই আর বাবা মারা গেছে, তাহলে মানসিক আঘাত পাবে। তাছাড়া মাসাকায়ু মিকুরিয়াকে এমনিতেও কেউ খুব একটা কেউ পছন্দ করতো না।

আর কুরাহাশি দম্পতি তখন সদ্য নিজেদের একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে শোকে মোহ্যমান। সেই অবস্থায় তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মিকুরিয়া পরিবারের ছোট্ট মেয়েটাকে দত্তক নিতে আপত্তি জানানোর কোনো কারণ ছিল না।

কিন্তু, তাদের কি এমনটা কখনো মনে হয়নি যে সেই মিকুরিয়া পরিবারই সায়াকার মৃত্যুর জন্যে দায়ী?

৯

“বলেছিলাম না এখানে খেলতে আসার কথা মনে আছে আমার? আর সেটা আমার বয়সি আরেকটা মেয়ের সাথে। ওই হচ্ছে সায়াকা, আসল সায়াকা।” আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার আসল পুরো নাম হিসামি মিকুরিয়া। ডাক নাম চামি। সে-ই বললো কথাটা।

“আমি চাইনি তুমি কষ্ট পাও। সেজন্যেই কথাটা বলিনি।”

“জানি আমি।”

“তাছাড়া, প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুই শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা সম্ভব না। পুরোটাই আমাদের কল্পনা।”

“হ্যাঁ, আমাদের নিশ্চিত হতে হবে,” রকিং চেয়ারটার হাতলে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললো ও। অনেকক্ষণ ধরে পেন্ডুলামের মত দোল খেলো চেয়ারটা। “আমি-”

“কী?”

“আমি ভাবছিলাম মা কি আদৌ আমাকে ভালোবাসতো কিনা।”

“কী?”

“আমাকে ভালোবাসতে পারেনি সে। চেষ্টা করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত।”

“এমনটা মনে হবার কারণ?”

“তুমি নিজেই বলো, প্রতিবার আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই আগুনে হারানো মেয়ের কথা মনে পড়ে যেত তার। আসল সায়াকার কথা।”

কিছু না বলে ওর দিকে তাকালাম। দু’চোখে এখন কেবল বিষাদ। অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা অনুভূতিগুলো হৃদয় ফুড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে নিশ্চয়ই।

“তাছাড়া, আমি আসলে ভালোবাসার উপযোগীও ছিলাম না।”

“এটা তোমার ভুল ধারণা...” নামটা বলতে গিয়েও বললাম না। সায়াকা বলবো নাকি চামি? কিছুক্ষন ভাবনার পর সারাজীবন যে নামে ডেকে এসেছি, সেই নামেই ডাকব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

“না,” মাথা ঝাঁকায় সায়াকা। “তুমি তো অ্যালবামটা দেখেছ। কোনো ছবিতে কি আমার মুখে হাসি ছিল?”

“নতুন একটা পরিবারে এসেছ তখন কেবল তুমি। নামও বদলে গেছে। একটু চুপচাপ থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

“শুধু সেটাই না। কোনো একটা বিষয় নিয়ে সবসময় ভীত থাকতাম আমি। এটা বলছি না যে কেউ ভালোবাসতো না আমাকে। বরং আমিই কাউকে ভালোবাসার সুযোগটা দিতাম না। মা আসলে বুঝত না কীভাবে আমার মন জয় করবে।” দুই হাতে মুখ ঢাকল ও। চোখ ইতোমধ্যে লাল।

কী বলে স্বান্তনা দেয়া যায় ভাবছি। কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না। অসহায় ভঙ্গিতে রুমের অন্ধকার কোণের দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে যেন

পুরোনো স্মৃতিগুলো ধূলিকণার মতন আশ্রয় নিচ্ছে ওখানে।

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। "সরি, আর বকবক করবো না।"

"আসলে এসব প্রশ্নের উত্তর এখন আর পাওয়া যাবে না।"

"হয়তো," মাথা কাত করে বলে সায়াকা। "তবে আমি সবচেয়ে ভয় পাচ্ছি..."

"ফিরে যাই আমরা, চলো," ওর কাঁধে হাত রেখে কথার মাঝেই বলি আমি। "অনেক তো থাকলাম।'

হাত দিয়ে কয়েকবার চুল ঠিক করলো সায়াকা। "হ্যাঁ, চলো।"

জানালাগুলো বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। অন্ধকার হয়ে উঠলো ঘরটা। সাথে সাথে টর্চ জ্বাললো ও।

"এই বাড়িটার কী হবে?"

"জানি না... তোমার উপরে নির্ভর করছে।"

আমার কথা শুনে একবার মাথা নাড়ল ও। সবগুলো দরজা জানালা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে বেইজমেন্টে চলে এলাম আমরা। বেরিয়ে যাব, এসময় থমকে গেল সায়াকা।

"সায়াকা এরকম একটা জায়গায় মারা গিয়েছিল," বিষাদমাখা স্বরে ফিসফিস করে বললো ও।

"এটা মূল বাড়িটার একটা রেপ্লিকা," বোঝানোর চেষ্টা করি ওকে। "সায়াকা হয়তো

এখানেই লুকাত।"

"একথা মনে হলো হঠাৎ?"

"তোমাকে তো বলেছি গল্পটা। বাবা-মা'র কাছ থেকে সেটা শুনেছিলাম। ছোটবেলায় একবার হঠাৎ একদিনের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম আমি মা-বাবা তো চিন্তায় শেষ। সব জায়গায় খুঁজে অবশেষে বাড়ির স্টোরেজ রুমে খুঁজে পায় আমাকে।"

"ওহ..."

"স্টোরেজ রুমটা নিশ্চয়ই বেইজমেন্টেই ছিল। তবে গল্পটা বোধহয় আমাকে নিয়ে না, আসল সায়াকাকে নিয়ে।"

"তুমিও সায়াকা," না বলে পারলাম না।

চোখ সরু করে টর্চের আলোয় আমার দিকে তাকালো ও। "তোমার আসলেই এটা মনে হয়?"

"হ্যাঁ। আমার কাছে তুমি সায়াকাই।"

"ধন্যবাদ।"

"আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না..."

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি। পরমুহূর্তেই আবার তাকালাম ওর দিকে। এখনও আমাকেই দেখছে একমনে।

কোমরে হাত দিয়ে চট করে কাছে টেনে নিলাম ওকে। কোনো প্রকার বাঁধা দিল না সায়াকা। ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেলাম। সেই পরিচিত স্পর্শ। নিমেষে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়লো পুরো শরীরে। কতদিন এভাবে জড়িয়ে ধরিনি একে অপরকে!

দু'জনের ঠোঁট পৃথক হবার পর ওর বন্ধ চোখ জোড়ার দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে তাকালো, যেন আমার চাহনি অনুভব করতে পারছে। অন্ধকারে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম লম্বা সময়।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ ভীষণ রকম চমকে উঠলো সায়াকা। যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। কী হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে।

দুই হাতে মুখ চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো ভয়ার্ত চোখে। টের পেলাম যে ও কাঁপছে।

"কোনো সমস্যা?" জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু সায়াকা জবাবে কিছু বললো না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। মাঝপথে পা থেকে জুতো খুলে পড়লো, কিন্তু ওগুলো তোলারও প্রয়োজন মনে করলো না। আমি জুতোটা তুলে ওর পিছু নিলাম।

উপরতলায় উঠে দেখি ইউসুকের ঘরের দরজা খোলা। কান্নার শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। করিডোরে দাঁড়িয়ে দেখলাম মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে। মুখটা চেপে ধরে রেখেছে ইউসুকের বিছানায়।

দরজার নবে হাত রেখেছি কেবল, ঠিক সেই মুহূর্তে মুখ তুলে বললো, "ভেতরে ঢুকবে না!"

হাত সরিয়ে নিলাম সাথে সাথে। লম্বা একটা সময় ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবশেষে মুখ তুললো সায়াকা। তবে আমার দিকে না, বরং দেয়ালের রেল ইঞ্জিনের পোস্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওই ঘরটায়..." ফিসফিসিয়ে বললো। "আমার..."

"কী?" ভ্রু কুঁচকে বলি। "কোন ঘরে?"

"যে ঘরে কালো ফুলদানিটা ছিল। ওখানে লোকটা আমাকে ধরে..." এটুকু বলে বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সায়াকা। "টর্চটা নেভাও, প্লিজ।"

ওর কথামত কাজ করলাম। ঝপ করে নেমে এলো অন্ধকার।

"আমার," বললো ও। "কাপড় খুলতো।"

মনে হলো কেউ বুঝি সপাটে চড় কষিয়েছে আমাকে। অন্ধকারেই কয়েক কদম সামনে এগোলাম।

"আমি যেন পালিয়ে যেতে না পারি, সেজন্যে শক্ত করে চেপে ধরতো বিছানাতে। গা থেকে মদের গন্ধ বেরুতো লোকটার সবসময়..." গলা ধরে এলো ওর। "আমি বারবার বলতাম ছেড়ে দিতে, কিন্তু ছাড়ত না। এমনকি বলতো

'একমাত্র তুই-ই আছিস আমার পক্ষে। তুই কখনো আমাকে ঘৃণা করতে পারবি না। অন্যদের মতন আমাকে নিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলবি না।' এরপর আমার..."

কিছুক্ষণের অসহ্যকর নীরবতা। এরপর আবার মুখ খুললো সায়াকা। "সারা শরীরে চুমু খেত।"

আরেক পা সামনে এগোতে গিয়েও থেমে গেলাম। মনে হচ্ছে যেন সায়াকার কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে পুরো ঘরময়। ভীষণ অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি।

"প্রতি রাতে ঘটতো এমনটা। রাত হলেই ভয় লাগত আমার।"

"কাউকে কিছু বলোনি এই ব্যাপারে?" জিজ্ঞেস করি।

"বলতে পারিনি," বলে সায়াকা। "কেন পারিনি, সেটা জানি হয়তো ভয় লাগতো; যদি এর চেয়েও খারাপ কিছু করে বসে।"

সেটা অসম্ভব কিছু না, মনে মনে বললাম। বেশিরভাগ শিশুই নির্যাতনের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারে না।

সায়াকা, মানে হিসামি হচ্ছে মিকুরিয়া পরিবারের একমাত্র সদস্য যাকে মাসাকার ব্যাপারে কিছু বলতে পারেননি কেইচিরো মিকুরিয়া। হয়তো নিজের ছেলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভীষণ অপমানিত বোধ করতো মাসাকায়ু। নিজেকে বড্ড একা মনে হতো তার। সেই কারণে মেয়ের প্রতি ওরকম অস্বাভাবিক রকমের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।

'কাল যা দেখেছি, আজ সারাদিন কিছু করতে পারিনি সেজন্যে। খুব বেশি অস্বস্তিকর একটা দৃশ্য। আজ রাতেও কি একই ঘটনা ঘটবে? প্রতিদিনই ঘটে? গতকাল রাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠে শব্দটা শুনতে পাই হঠাৎ। সাধারণত এই সময়ে উঠি না আমি, এজন্যেই হয়তো আগে খেয়াল করিনি। যদি এরকম জঘন্য একটা ব্যাপার আসলেও প্রতিদিন ঘটে থাকে! ভাবলেই বমি আসছে আমার। আজ স্কুল থেকে ফিরে দেখি বাগানে দাঁড়িয়ে আছে ও। দ্রুত চলে এসেছি ঘরে। কালকে কী করে ওর মুখোমুখি হবো কে জানে!'

ডায়রিতে ইউসুকে এমনটাই লিখেছিল। ছেলেটা কি প্রত্যক্ষ করেছিল সেই রাতে, এবারে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। পরদিন স্কুল থেকে ফিরে নিশ্চয়ই চামি, অর্থাৎ সায়াকা'কে দেখে অপরাধবোধ হয় ওর।

"থাক, এই ব্যাপারে আর কিছু ভেবো না। অনেক আগের কথা।" কথাটা বলামাত্র আফসোস হলো আমার। এরকম একটা সময়ে এমন কিছু বলা উচিত হয়নি একদমই।

অন্ধকারে যেন হালকা নড়ে উঠলো সায়াকা।

"সেদিন কী ঘটেছিল মনে পড়েছে।"

"সেদিন বলতে?"

"যেদিন আগুন লেগেছিল বাসায়। ইউ ভাইয়া..." থেমে লম্বা শ্বাস নিল ও। "হ্যাঁ, এই নামেই ওকে ডাকতাম আমি। আর ও আমাকে ডাকত চামি বলে। আগের দিন রাতে ইউ ভাইয়া এসে বলে- চামি, তুই নিশ্চয়ই ঘৃণা করিস ওই

লোকটাকে? জবাবে হ্যাঁ বলি। তখন ভাইয়া বলে- তুই বললে ওকে মেরে ফেলব আমি।"

প্রায় গুঙিয়ে উঠলাম। অন্ধকারে অনেক বেশি জোরে শোনালো শব্দটা। "আমি বলি- মেরে ফেলবে মানে? তখন ভাইয়া বলে লোকটাকে চিরদিনের জন্যে উধাও করে দিবে। আরো বলে, ভাইয়া চাইলে নিজে পালিয়ে যেতে পারবে যে-কোনো মুহূর্তে। কিন্তু আমি সেটা পারব না। ওই লোকটা আমার সাথে যা করতো, সেটা প্রতিদিন সহ্য করতে পারব কিনা।"

"কী বলেছিলে তুমি?"

"বলেছিলাম, তাহলে মেরে ফেল।"

ওর গলার স্বর শুনে কেঁপে উঠলাম আমি। মনে হচ্ছে যেন কথা বলতে ভুলে গেছি।"

"ইউ ভাইয়া বলেছিল লোকটাকে কীভাবে মারতে হবে, সেটা জানা আছে তার। আমাকে পরামর্শ দেয় মা'র সাথে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসতে। ততক্ষণে আমি সব সামলে নিব।"

"তাহলে আত্মহত্যার ইচ্ছে ছিল না ওর?"

"মনে হয় না। আমার জন্যে লোকটাকে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু গোটা বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে... সেই আগুনে পুড়ে ইউ ভাইয়াও মারা যায়। অর্থাৎ, আমার কারণেই মারা গিয়েছে ভাইয়া।"

আগের চেয়েও জোরে কাঁদতে শুরু করলো সায়াকা।

মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা শক্তি জোরে চেপে ধরেছে আমাকে। একটা পেশিও নাড়াতে পারছি না।

এজন্যেই বোধহয় স্মৃতিগুলো লুকিয়ে ফেলেছিল ওর মস্তিষ্ক। প্রবল শোকে। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর নিশ্চয়ই পাগলের মত হয়ে যায় সায়াকা ওরফে চামি।

"সায়াকা..." অবশেষে এক পা এগোলাম কোনোমতে।

"আসবে না..." কান্নার ফাঁকে বললো ও। "আর আমি সায়াকা না..."

আবারও ভাষা হারিয়ে ফেললাম। অসহায় বাচ্চাদের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কান্না শুনছি কেবল।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। এখন একটু শান্ত হয়েছে ও। "সরি," সায়াকা বললো আমার উদ্দেশে। "তুমি চলে যাও।"

"কিন্তু..."

"আমাকে একা থাকতে দাও, প্লিজ।"

কিন্তু ওকে এভাবে একা রেখে যাওয়া সম্ভব না। নিজে নিজে বাড়ি ফিরতে পারবে, সেটা জানি। আসলে আমি ভিন্ন একটা কারণে চিন্তিত।

আমার মাথায় কী ঘুরছে, তা ধরতে পারল সায়াকা।

"চিন্তা কোরো না। আত্মহত্যা করবো না আমি।"

“না, সেটা না...”

“যাও এখন,” এই কথাটার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিল আমার এই বাড়িতে থাকার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

“ঠিক আছে তাহলে,” অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম। “যাচ্ছি আমি।”

“আর শোনো, জানি এখানে অন্ধকার... কিন্তু ঘরটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে টর্চ জ্বালিও না, প্লিজ।”

“আচ্ছা।”

ঘরটা থেকে বেরিয়ে অন্ধকারেই সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এলাম। বেইজমেন্টের দিকে পা বাড়াতে যাব এমন সময়ে একটা শব্দ কানে এলো লিভিং রুমের দিকটা থেকে।

করিডোর পেরিয়ে লিভিংরুমে চলে এলাম। টর্চ জ্বালাতে ভুলিনি। চারপাশ একদম নিস্তব্ধ। ভেতরের বাতাস বদ্ধ এখন।

পিয়ানোটা যেদিকে রাখা, সেদিকে আলো ফেললাম। সায়াকা যে মিউজিক শিটটা দেখেছিল গতকাল, সেটা নিচে পড়ে গেছে। সামনে এগিয়ে ওটা তুলে রেখে দিলাম আগের জায়গায়।

এই সময় পুতুলটা নজরে এলো আমার। টর্চের আলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে ওটার চোখে। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা বলতে চায় আমাকে। বাইরে পা রাখা মাত্র রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো। পুরো চোখ খুলতে সময় লাগল বেশ কিছুক্ষণ।

সায়াকার জিনিসগুলো গাড়ি থেকে বের করে বেইজমেন্টের প্রবেশ পথের সামনে রেখে দিলাম।

গাড়িতে উঠে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে তাকালাম বাড়িটার দিকে। গতকাল যেরকম দেখেছিলাম, একদম সেরকমই দেখাচ্ছে এখন। ইঞ্জিন চালু করলাম।

গাড়িটা ঘোরাচ্ছি, এমন সময় মনে হলো যেন পিয়ানোর শব্দ ভেসে এলো ভেতর থেকে। ব্রেক চেপে কান পাতলাম। কিন্তু শব্দটা আর শুনতে পেলাম না।

অ্যাকসেলেটর চেপে চলে এলাম ওখান থেকে।

শেষকথা

টোকিওতে ফিরে মিকুরিয়া পরিবার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলাম। অগ্নিকাণ্ডটা তেইশ বছর আগের ঘটনা, এটুকু জানতাম। তাছাড়া মিকুরিয়া নামটা খুব একটা প্রচলিত না হওয়ায় সেই সময়কার সংবাদপত্রে খবরটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। এক কলামের ছোট্ট একটা প্রতিবেদন।

'ইয়োকোহামায় বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত; একই পরিবারের নিহত ৩।'

মাসাকা মিকুরিয়া, ইউসুকে আর হিসামির কথা বলা হয়েছে ভেতরে।

সেখান থেকে ঠিকানা টুকে নিয়ে কিছুদিন পর গেলাম আমি। মিকুরিয়াদের পুরোনো বাড়িটার জায়গায় এখন ছোট্ট একটা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের বাড়িগুলো নিশ্চয়ই তুলনামূলক নতুন। দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকায় থাকে, এমন একজনকে খুঁজতে লাগলাম তথ্যের আশায়। অবশেষে বয়স্ক এক লোককে পেলাম যার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে।

"বাড়ির কর্তা মারা গিয়েছিল আগেই। ছেলেটা ছিল অকর্মার ধাড়ি। বাবার মৃত্যুর পর সুযোগ পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ওর কারণেই আগুন লেগেছিল নিশ্চয়ই। শুধু যদি কুলাঙ্গারটা মারা যেত, তাও আফসোস হতো না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টোও মারা গেল। ভদ্রমহিলার অবস্থা হয়েছিল, ভেবে দেখ একবার?" কী

ভ্রু কুঁচকে কথাগুলো বললো লোকটা। ইউসুকের চেহারা আবছা মনে আছে তার, কিন্তু মেয়েটার চেহারা মনে নেই। যা বুঝলাম, এলাকার লোকেরা চামিকে খুব একটা দেখেনি। এজন্যে অদল-বদল সম্ভব হয়েছিল।

মাতসুবারা হ্রদের ধারের বাড়িটার (বাড়ি না বলে সমাধি বলেই শ্রেয়) বর্তমান মালিক মিকুরিয়াদের এক আত্মীয়। লোকটার নাম ইসোগাই। স্বস্তা বিদেশি মালামাল বিক্রি করে কিছুদিনের মধ্যেই প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন ভদ্রলোক। এখন পুরো দেশজুড়ে অনেকগুলো চেইন শপ তার মালিকানাধীন। টোকিওতে ওনার অফিসে গিয়ে দশ মিনিটের মত কথা বলার সুযোগ হলো আমার।

আলাপের ফাঁকে মিস্টার ইসোগাই জানান মাতসুবারা হ্রদের ধারের বাড়িটা সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন, কিন্তু কখনো নিজের চোখে দেখেননি।

"ছুটি কাটানোর জন্যে ওখানে একটা বাগানবাড়ি করার ইচ্ছে ছিল মিকুরিয়াদের, সেজন্যেই জমিটা কিনেছিল। এরপর তো আগুনে পুড়ে মারা গেল পরিবারের তিনজন। বাগানবাড়ি আর করা হয়নি তাই। লম্বা একটা সময় খালিই পড়ে থাকে জায়গাটা। এক সময় মিসেস মিকুরিয়া হঠাৎ জানান, যে বাড়িটা পুড়ে গেছে, হুবহু সেরকমই একটা বাড়ি বানাবেন ওখানে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িটা পাই আমি। কিন্তু ওখানে পানি বা বিদ্যুতের কোনো

সংযোগ ছিল না। আমাকে একজনের নাম দিয়ে বলা হয় বাড়িটা বিক্রি করতে চাইলে তার সাথে যোগাযোগ করতে।

সেই লোকটা কে ছিল, জানতে চাই। জবাবে সায়াকার বাবার নাম বলেন মিস্টার ইসোগাই। তিনি জানতেন না যে ভদ্রলোক মারা গেছেন।

কিন্তু অদ্ভুত ওই বাড়িটা কেন বানিয়েছিলেন মিসেস মিকুরিয়া? মিস্টার ইসোগাই যদি বাড়িটা আসলেও বিক্রি করে দিতেন, তাহলে এমনটা খুবই সম্ভব ছিল যে সায়াকা ওটার ব্যাপারে জানতে পারত। এই সম্ভাবনার কথা ভাবেননি তিনি?

ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা মিসেস মিকুরিয়ার সব খুলে বলার ইচ্ছে ছিল সায়াকা'কে। সেজন্যেই বাড়িটায় সবকিছু একদম যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি ইউসুকের ডায়রিটাও।

আর ওই বাড়িটার কারণেই সায়াকা সত্যটা জানতে পেরেছে এতদিন পর। এখন ও নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে জানে। অবশ্য সেটা ওর জন্যে ভালো হয়েছে না মন্দ, তা বলা মুশকিল।

এই বাড়িটার কি আদৌ কোনো মূল্য আছে ওর কাছে?

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে বলবো দীর্ঘদিন আগেই ওখানে মারা গেছে ও। তবে ওর মৃত্যুটা 'সায়াকা' নামের ওই আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া মেয়েটার থেকে ভিন্ন। দুই দিনের ওই অভিযাত্রায় নিজের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল ও। তেইশ বছর আগের সত্ত্বার মৃতদেহ। সেই অর্থে বাড়িটা আসলেও ওর জন্যে সমাধির মতই।

ওই ঘটনার পর থেকে প্রায়শই আমাদের পুরোনো বাড়িটার কথা মনে হতো আমার। আমাকে যারা লালন-পালন করে বড় করেছে, তাদের সাথে থাকতাম যে বাড়িটায়। যেখানে নিজের জন্মদাত্রী মা আর পালক বাবা-মা'র মধ্যে এক পক্ষকে চয়ন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যেখানে প্রতিনিয়ত মাবাবা'র বাধ্য সন্তানের ভূমিকায় অভিনয় করতাম আমি। যেখানে বুঝেছিলাম মানুষ আসলে একা।

বাড়িটায় তো আমারও মৃত্যু হয়েছিল, তাই না? আমার শৈশবের সত্ত্বার মৃত্যু ঘটে ওখানে। এতদিন ধরে আমার সেই মৃত আমি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। আসলে, সবার জীবনেই এমন একটা বাড়ি আছে, যেখানে তাদের মৃত্যু হয়েছে অতীতে। কিন্তু কেউ সেই মৃতদেহের মুখোমুখি হতে চায় না।

সেই বছরের শেষ দিকে সায়াকার কাছ থেকে একটা পোস্টকার্ড পেলাম। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার পর সেটাই ছিল আমার সাথে ওর প্রথম যোগাযোগ।

কার্ডে খুব অল্প কথায় নিজের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে সায়াকা। স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়ে দাদা-দাদির বাড়িতে থাকে। শেষে ও লিখেছে-

‘সবকিছুর জন্যে তোমার ধন্যবাদ প্রাপ্য। আমি আসলে এখনও আগের মানুষটাই আছি। এই কথাটা মাথায় রেখেই বাঁচব সামনের দিনগুলোতে।’

প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা সায়াকা কুরাহাশি।

এরপর আর কখনো দেখা হয়নি ওর সাথে।

Notes

[←1]

প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী ও পুরুষের অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর জন্য সমগ্র জাপানে অসংখ্য হোটেল আছে যেগুলো লাভ হোটেল নামে পরিচিত। হোটেলগুলো সাধারনত ঘণ্টা হিসাবে বিল নিয়ে থাকে। ৩ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাড়া নেয়া যায়।

[←2]

আমরা যেরকম এক হাত, দুই হাত মতন জায়গা বলি, তেমনি জাপানে তাতামি ম্যাট অনেক সময় মুখে মুখে পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

[←3]

দেজা ভ্যু হল একটি নিশ্চিত অনুভবের অভিজ্ঞতা যা একজন ইতঃপূর্বে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অথবা স্বচক্ষে দেখেছে (একজন ব্যক্তি অনুভব করে যে ঘটনাটি ইতঃপূর্বে অথবা সাম্প্রতিক ঘটেছে), যদিও পূর্ববর্তী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সঠিক ঘটনাটির সম্পর্কে অনিশ্চিয়তা রয়েছে।

[←4]

নাবালক থেকে সাবালক হওয়া উদযাপনের দিন

[←5]

যেখানে বইয়ের মূল্য, প্রকাশকাল লেখা থাকে।

[←6]

মিনোয়ান সভ্যতা হলো ব্রোঞ্জ যুগে এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি সভ্যতা, যেটি ক্রিট দ্বীপ এবং অন্যান্য এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গড়ে ওঠে। এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দ হতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থেকে অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে এসে পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। এটি ইউরোপের প্রথম উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে যেটিতে ছিলো বিশাল ভবন, সরঞ্জাম, অত্যাশ্চর্য শিল্পকর্ম, লিখন পদ্ধতি এবং ব্যাবসায়ের বিশাল বিস্তৃত ব্যবস্থা।